ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৩ সম্পাদক : অরুণ রায় সহযোগী সম্পাদক : নির্মাল্য রায় আষাঢ়, ১৪০৩

সূচী

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

অরুণ রায়

'তথ্য সমাজ' কি ও কেন

প্রদোষ বাগচী

গ্রন্থাগার, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্যাট চুক্তি

ডঃ কবিতা মুখোপাধ্যায়

"বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ" ও কিছু ভাবনা

Dr. Ratna DasBanerjee

English Abstracts

756.3
গ্র 8/15

গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৩, সম্পাদক : অরুণ রায়। সহযোগী সম্পাদক : নির্মাল্য রায়। আষাঢ়, ১৪০৩

সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিক কালে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থাগার নেটওয়ার্কিং-এর সংস্থা Inflibnet-এর পক্ষ থেকে তথ্য পরিষেবার খাতে অর্থবরাদ্দ। ইতিপূর্বে DSIR-এর পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা গ্রন্থাগারের মধ্যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য সঞ্চালন করার জন্য Calibnet প্রকল্পের অধীনে কিছু কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় UGC থেকে এই খাতে পায় ৫০ লক্ষ টাকা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ১৫ লক্ষ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ৬'৫ লক্ষের মত অর্থ পেয়েছেন। সংভাবতই আশা করা যেতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সাফল্যের সঙ্গে তথ্য পরিষেবা দেওয়ার বিষয়টি অতি জটিল। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং আধুনিকীকরণের পথ পেরিয়ে যদি এগোনো যায় তবেই এ কাজ সম্ভব হতে পারে নচেৎ সমগ্র পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এই আধুনিকীকরণের কাজে সঠিক লক্ষ্য স্থির করা, কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক আগ্রহ ও কর্মীবাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা কতটা সম্ভব হবে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় আছে।

Nissat আয়োজিত কলকাতার Calibnet প্রকল্পটি বর্তমানে মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে একটা 'তথাকেন্দ্র ধারণার দিকে ধাবমান। এই প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি Network স্থাপন করা যার দ্বারা প্রত্যেক গ্রন্থাগার অপর গ্রন্থাগারের ডেটাবেসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে এবং তথ্য সঞ্চালন করতে পারবে। গোড়া থেকেই Calibnet প্রকল্পে ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি ছিল এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ে ত্রুটিগুলি যখন ধরা পড়লো তখন সেগুলি সংশোধন করার পরিবর্তে সেখান থেকে সরে যাওয়া হলো। কেন এইভাবে মূল উদ্দেশ্য বিসর্জন দেওয়া হলো তার পর্যালোচনা পরবর্তীকালে করা যেতে পারে।

Inflibnet-প্রকল্পটির প্রয়োগ যাদবপুরে প্রথম পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ পায়। যেটুকু জানা গেছে তা হলো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কাজ চলছে, কলকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কম্প্যুটার কেনার পথে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় VSAT টেলি যোগাযোগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজাবাজার ও বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নেটওয়ার্কিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই নেটওয়ার্কগুলি গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক কিনা তার সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ লাইব্রেরী নেটওয়ার্কের মর্মবস্তু হলো ডেটাবেস তৈরী করা, গ্রাহক প্রোফাইল তৈরী

করা বিভিন্ন ডেটাবেস কেনা ও সবগুলি নিয়ে তথা পরিষেবা দেওয়া গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে। এই প্রকল্পের সাফল্য জড়িয়ে আছে গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণের বিষয় ডেটাবেস তৈরী বা অন্যান্য সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবা একটি অবহেলিত সংস্থা। রাধাকৃষ্ণণ ও কোঠারি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য যে সুপারিশই করে থাকুন না কেন খুব কম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই সে বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এর প্রমাণ হলো বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির গ্রন্থাগার বাজেট। যা দেখলে প্রতিভাত হয় যে মাত্র ২—৩% শতাংশ ব্যয় হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শক্তি শিক্ষক সম্প্রদায়ের কর্মধারা সকলেরই জানা, সে সম্পর্কে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ছাত্র সম্প্রদায়ও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম যথা নোট-পরীক্ষা-প্রশ্নের আবর্তে ঘূর্ণায়মান। এক শ্রেণীর শিক্ষকের প্রধান কর্মকাণ্ড হলো কত অর্থ নিজের কোলে আনার প্রচেষ্টা তাই নিয়ে—ছাত্রদের মূল চাহিদা বিগত ৩।৪ বছরের নোট ও প্রশ্নপত্র সংগ্রহ ও জেরক্স করা। এই ছাত্রসমাজের কর্মসূচী হলো ভোটের আগে গ্রন্থাগার পরিষেবার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর স্লোগানে ভরিয়ে দেওয়া এবং নির্বাচনোত্তর কালে সমস্ত বিষয়টির দ্রুত বিস্মৃত হওয়া। অফিসার ও কর্মচারী আন্দোলনের মর্মবস্তু আর্থিক দাবী দাওয়া। গবেষকদের ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার জন্য গুরু বিষ্ণু, "গুরু ব্রহ্ম ও গুরুদেবো মহেশ্বরো" মন্ত্রজপ। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক কাঠামো যেমন ক্রমশ জরুর হচ্ছে আর সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার প্রশাসনও ভেঙ্গে পড়ার মুখে।

কলাচ হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত দুই একজন উপাচার্যের আবির্ভাবে—যাঁরা গ্রন্থাগার পরিষেবাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি আবশ্যক পরিষেবা বলে বিবেচনা করেন—তখন যে দুই একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয় তাই ভাঙ্গিয়ে চলে বহুদিন। অন্যসময় চলে 'দিন যাপনের প্রাণধারণের পালা।'

এরকম অবস্থার মধ্যেও গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত গজিয়ে উঠেছে প্রশাসক ও এক্সপার্টদের কম্পিউটার বিজ্ঞানীর ফুৎ যাঁরা মনে করেন যে কম্পিউটার আর নেটওয়ার্কই আজকের দিনে ব্রহ্ম বাকী সব মায়া। সুতরাং করে দাও নেটওয়ার্ক—নিয়ে এসো Internet তা হলেই মুক্তি। সুইচ টিপলেই ইনফরমেশন গলিত সোনার মত স্ক্রিনে ছাপা হবে। ডেটাবেস, স্ট্যান্ডর্ডাইজেশন AACR, CCF-MARC বিতর্ক ইত্যাদি গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা, সেগুলি ওঁরা বুঝবেন। গ্রন্থাগার তো পুরানো চিন্তা—ওখানে কিছু পাওয়া যায় না। "পত্র-পত্রিকা আসে না", "অপসার্থ গ্রন্থাগারিক" ইত্যাদি—বাসিয়ে দাও একজন প্রফেসর-ইন-চার্জ তাহলেই সব ঠিক। এই আত্মপ্রবঞ্চনা কতকাল চলবে?

গ্রন্থাগারিক বেচারীর অবস্থা সব চাইতে করুন—কারণ ওপরতলাও কথা শোনে না নিচের তলাও কথা শোনে না। গ্রন্থাগার প্রশাসনে অর্থ বরাদ্দ থেকে শুরু করে কর্মী ও পুস্তক নির্বাচন কোনটাতেই এদের ভূমিকা নেই। অথচ দায় সবটাই এদের। এদের মধ্যে আছেন দুই একজন বিবেকবান ব্যক্তি যাঁরা এ রকম অবস্থাতেও চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আজকের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার রাজ্যর একটা চৌমাথায় দাঁড়িয়ে। প্রশাসক যদি লক্ষ স্থির করতে না পারেন; কর্মীরা যদি নিরলস পরিশ্রম করে গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নতি না করতে পারেন তা হলে গ্রন্থাগার দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না। সেজন্য আজকের দিনে গ্রন্থাগারিক—গ্রন্থাগার কর্মীর যৌথ উদ্যোগ বিশেষ প্রয়োজন তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি প্রসূত সদিচ্ছা।

'তথ্য সমাজ' কি ও কেন ?

অরুণ ঘোষ

[সমাজকে নানা বৈশিষ্ট্যে দেখার রীতি বহুদিনের। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ কখনও 'প্রাচীন কখনও বা 'আধুনিক'। অন্য বৈশিষ্ট্যে আবার কোন সমাজ 'সামন্ততান্ত্রিক' অথবা 'বুর্জোয়া'। সম্প্রতি কয়েকটি উন্নত দেশের সমাজকে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে "তথ্যসমাজ" (Information Society)। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে—(১) কোন কোন বৈশিষ্ট্যে ঐ সব সমাজকে তথ্যসমাজ বলা হচ্ছে, (২) সমাজবিজ্ঞানীরা তথ্য সমাজের সংজ্ঞাকে কিভাবে দেখছেন, (৩) তথ্য সমাজে তথ্যস্রষ্টা, তথ্য প্রযুক্তিবিদ, তথ্যকর্মী, তথ্য ব্যবহারকারী প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা কি, (৪) গুণগত ও পরিমাণগতভাবে তথ্যসমাজের অবস্থান কোথায় এবং (৫) প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তথ্যকর্মীদের ঐ সমাজে ভূমিকাই বা কি ?]

সম্প্রতি কোন কোন মহল থেকে বলা হচ্ছে তথ্যই (Information) আধুনিক পৃথিবীর সংজ্ঞা নির্ধারণের মাপকাঠি। আরও বলা হচ্ছে বর্তমানে সমাজ জীবনকে **তথ্যভিত্তিক (Informatization)** করার প্রচেষ্টা খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে ; আমরা তথ্যযুগে (Information Age) প্রবেশ করেছি এবং আধুনিক তথ্য পদ্ধতির (New mode of Information) ফলে বিশ্ব তথ্য অর্থনীতির (Global Information Economy) আবির্ভাব ঘটেছে। যেসব দেশের সমাজকে ইতিমধ্যেই তথ্য সমাজ হিসেব চিহ্নিত করা হচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছে—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, জার্মানি ও এই ধরনের আরও কয়েকটি উন্নত দেশ।

॥ তথ্য সমাজের সংজ্ঞা ॥

তথ্য সমাজের প্রবক্তারা ঐ সমাজের সংজ্ঞা নির্ধারনে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি হলো—(ক) প্রযুক্তিগত, (২) অর্থনৈতিক (৩) বৃত্তিগত (৪) ভৌগলিক বা স্থানিক ও (৫) সাংস্কৃতিক।

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য : যে বৈশিষ্ট্যের উপর সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয়ে থাকে তা হলো তথ্য প্রযুক্তির (Information Technology) অভূতপূর্ব অগ্রগতি। সমাজ ও জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রই আজ তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তথ্য ব্যবস্থাপনায়, সংরক্ষণে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমানে কম্পিউটার যে ভূমিকা পালন করছে তা এক কথায় আশ্চর্যজনক। কম্পিউটার এখন আর শুধু বড় বড় ব্যাঙ্ক, অফিস আর কারখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এমন কি টি. ভি. টাইপরাইটার মোটরগাড়ী, রান্নার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত ব্যবহারের ডাইরিতে হাতঘড়িতে, ক্রেডিট কার্ডে, ছোট ছোট শিশুদের খেলনাতে পর্যন্ত এসে গেছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশেও এই সব ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার ছাড়াও চলন্ত গাড়ীতে টেলিফোন ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে অনেক দূরে বসে চিকিৎসকের পক্ষে রোগীর রোগ নির্ণয়ও কম্পিউটারের মধ্য দিয়ে সম্ভব হচ্ছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কম্পিউটার ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার যুগ্ম প্রয়োগে যে তথ্যের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা (Information Network System) গড়ে উঠেছে তা সমস্ত পৃথিবীকে একেবারে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। শুধু যে দূরত্ব কমিয়ে ফেলা হয়েছে তা নয়, যোগাযোগের ক্ষেত্রে সময়কেও সংকুচিত করা যাচ্ছে অবিশ্বাস্যভাবে। একজন মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তির অধ্যাপকের মতে (Williams, 1988) :..."it

[Information Society] is a society where the economy reflecets growth owing to technological advance." এক কথায় তথ্যসমাজের প্রবক্তাদের মতে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সময় mechanisation-এর যে ভূমিকা ছিল আজকের তথ্য সমাজে কম্পিউটার প্রযুক্তি (Computer Technology) সেই ভূমিকাই পালন করছে।

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য : বর্তমানে উন্নত সমাজগুলিতে শুধুমাত্র কৃষি আর শিল্প থেকেই পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে তা নয়। তথ্য ক্ষেত্র (Information Sector) থেকেও 'পণ্য' উৎপাদিত হচ্ছে। তথ্যও ঐ সব সমাজে পণ্য (commoditiy) হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এই তথ্য পণ্যের বাজার ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে 'জ্ঞান শিল্প' থেকে পাঁচের দশকের শেষে আমেরিকার মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) শতকরা ২৯ ভাগ এসেছে এবং সত্তের দশকের শেষে ঐ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৬ ভাগ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা উন্নত সমাজগুলিকে তথ্য সমাজ বলছেন তাঁরা শুধু মোট জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের দিকে তাকিয়েই বলছেন না। উৎপাদনের মূল উপাদানগুলির মধ্যে জমি। শ্রম ও পুঁজি ছাড়াও তথ্য একটি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করছে বলেই তাঁরা বর্তমান উন্নত সমাজগুলিকে তথ্য সমাজ আখ্যা দিতে চান।

বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য : তথ্যসমাজের প্রবক্তাদের কাছে বৃত্তিগত পরিবর্তনের (occupational chance) দিকটা খুব বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে। তাঁরা দেখাতে চাইছেন যে কর্মে নিয়োজিত অধিকাংশ মানুষই অগ্রসর সমাজে এমন কাজ করেন যা তথ্যনির্ভর। কলকারখানা, খনির, ইস্পাতশিল্প, নির্মাণ শিল্প প্রভৃতিতে যত লোক কাজ করে তার থেকে অনেক বেশি লোক তাদের জীবিকা অর্জন করে শিক্ষকতা, কেরাণীগিরি, আইন ব্যবস্থা, বিনোদন শিল্প গবেষণা সংস্থা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে। সাতের দশকের শেষের একটি হিসেবে দেখা গেছে যে ঐ সময়ে আমেরিকার কর্মশক্তির (work force) শতকরা ৬০ ভাগ নিয়োজিত ছিল তথ্য সংক্রান্ত কাজের জন্য আর মাত্র ১৩ ভাগ নিয়োজিত পণ্য উৎপাদনের কাজে। একজন অর্থনীতিবিদের মতে (Jonscher, 1983) উৎপাদন ব্যবস্থাকে সরাসরি দুভাগে ভাগ করা চলে—যার একদিকে তথ্য আর এক দিকে প্রচলিত অর্থে পণ্য (commodity)।

ভৌগলিক বা স্থানিক বৈশিষ্ট্য : স্থানিক বা ভৌগলিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে যে বর্তমানে নেটওয়ার্ক (Network) ব্যবস্থা দূরত্ব ও সময়ের বাধাকে সংকীর্ণ সীমায় এনে ফেলেছে। বিশ্বায়নের (Globalisation) ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজ আর আঞ্চলিকতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। প্রায় সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই আজ অঞ্চল নিরপেক্ষ। তারই ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সময় ও দূরত্বের বাধাকে সরিয়ে ফেলতে হচ্ছে। উপগ্রহের (Satellite) সাহায্যে যে আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার প্রচলন সম্ভব হয়েছে তারই ফলে FAX on line Database, Satellite Telecasting থেকে আরম্ভ করে চলমান টেলিফোন ব্যবস্থার প্রচলন সম্ভব হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য : তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম জনপ্রিয় অবদান টেলিভিশন। টেলিভিশন সমাজের চেহারাটাকে অতি দ্রুত আমূল পালটে দেবার অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে। এতদিন ধরে সংবাদপত্র, রেডিও, সিনেমা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম সাধারণ মানুষের রুচি, চাহিদা ও জীবনযাত্রা পরিবর্তন করতে যতটা না সক্ষম হয়েছে তার অনেকগুণ বেশি সফলতা এসেছে এই 'বোকা বাক্সটার' (Idiot Box) কাছ থেকে। খাবার-দাবার, পোষাক-আসাক থেকে শুরু করে ঘর সাজান, বাড়ীঘরের ভেতর ও বাইরের ডিজাইন, এমন কি ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতলটা ধরার কায়দা এবং কথাবার্তার ধরণ

পর্যন্ত টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনদাতারা অথবা অনুষ্ঠান পরিচালকরা ঠিক করে দিচ্ছে। একথায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন আজ আর স্বাধীন নয় বরং প্রচার নির্ভর আর এক অর্থে-তথ্য নির্ভর।

॥ তথ্য সমাজ সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের ভাবনা ॥

আধুনিক অগ্রসর সমাজকে 'তথ্য সমাজ' আখ্যা দেওয়ার বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা সমালোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য সমাজের যে ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে সেই প্রসঙ্গে অনেকে মনে করেন যে সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অভূতপূর্ব-ভাবে ঘটেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান সমাজ অনেকটাই প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। সে জন্যে এই সমাজকে উচ্চপ্রযুক্তি সমাজ (Hi-Tech Society) না বলে কেন 'তথ্যসমাজ' বলা হচ্ছে তা বোধগম্য হচ্ছে না। তথ্য ও তার ব্যবহার সমাজে আগেও ছিল এখনও আছে। পরিবর্তন যদি কিছু ঘটে থাকে তা প্রধানত পরিমাণগত বৃদ্ধি। উচ্চপ্রযুক্তি বর্তমানে তথ্যের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে ও দ্রুত ব্যবহারে সাহায্য করছে। তথ্য বর্তমান সমাজকে যতখানি না প্রভাবিত করছে তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে উচ্চপ্রযুক্তি প্রভাব ফেলছে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও যাঁরা তথ্য সমাজকে ব্যাখ্যা করে থাকেন তাঁদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে শুধু উৎপাদনের পরিমাণগত বৃদ্ধির দিকে তাকিয়েই (যার মধ্যে তথ্যকেও 'পণ্য' হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে) কি সমাজকে 'তথ্য সমাজ' আখ্যা দেওয়া হবে? তাহলে ত পণ্য উৎপাদনের ওঠা নামার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সমাজকে একটা সাময়িক সংজ্ঞার সীমার মধ্যে মেনে নিতে হয়।

বৃত্তিগত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যুক্তি হল—বৃত্তির বিচারে সমাজের নামকরণই যদি প্রয়োজন তবে 'তথ্য সমাজ' না বলে তাকে 'সাদা কলারের (White collar) সমাজ' বলাই ভাল। কারণ তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের ফলে 'নীল কলারের' (Blue collar) শ্রমজীবির সংখ্যা কমে তার জায়গায় 'সাদা কলারের' শ্রমজীবির সংখ্যাই যখন বেড়ে চলেছে। কেউ কেউ আবার ঠাট্টার ছলেই বলছেন যে বৃত্তিগতভাবে 'তথ্য সমাজ' (Golden Collar Society) বললেই বা ক্ষতি কি! কেননা উচ্চপ্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের তো ঐ আখ্যাই দেওয়া হচ্ছে।

ভৌগলিক বা স্থানিক ব্যাখ্যার সমালোচনায় অনেকে বলে থাকেন যে স্থানিক সীমাবদ্ধতা ও সময়ের সংক্ষিপ্তকরণ জন্য যে ব্যবস্থা মূলত দায়ী তাকে বলা হয়ে থাকে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা (Network System)। অতএব 'তথ্য সমাজ' না বলে ঐ সমাজকে নেটওয়ার্ক সমাজই বা বলা হবে না কেন?

সাংস্কৃতিক দিক থেকেও বিচার করে মনে করা হচ্ছে যে 'তথ্য সমাজকে' 'প্রচার কেন্দ্রিক সমাজ' (Media-Centred Society) বলাই ভাল। এ ব্যাপারে তো প্রশ্ন কোন দ্বিমত নেই যে বর্তমান সমাজে মানুষের সামগ্রিক জীবনাচরণে যার প্রভাব সব থেকে বেশি তা তথ্য নয় বরং প্রচার নির্মিজত পরিবেশ (Media-Saturated Environment)।

॥ তথ্য সমাজের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীগুলি ॥

তথ্য সমাজ বা তথ্য ব্যবস্থার সঙ্গে প্রধানত যে গোষ্ঠী-গুলি যুক্ত সেগুলি হলো—তথ্য স্রষ্টা (Information Generator), তথ্যকর্মী বা ব্যবস্থাপক (Information worker / Manager), তথ্য প্রযুক্তিবিদ (Information Technologist), তথ্য ব্যবসায়ী (Information Vendor) এবং তথ্য ব্যবহারকারী (Information) User)।

॥ তথ্য স্রষ্টা ॥

তথ্য সৃষ্টিতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দুইই যুক্ত। শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ

যেমন একদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তথ্যসৃষ্টিতে ব্যাপৃত তেমনি অপরদিকে নানা সরকারী বেসরকারী ব্যবসায়ীও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা-কেন্দ্র, বিনোদন শিল্প, প্রচার শিল্প প্রভৃতি প্রতিনিয়ত তথ্য সৃষ্টি করে চলেছে। এই সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যে তথ্য উৎপাদন করছে তার পরিমাণ প্রতিমুহূর্তে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। তথ্য সম্পদের হার পশ্চিমী দেশগুলিতে কিভাবে বেড়ে চলেছে তার একটা মোটামোটি হিসাব পাওয়া গেছে। ১৮৫০ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে (অর্থাৎ ৭৫ বছরে) ঐ দেশগুলিতে তথ্যের পরিমাণ আগের থেকে দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯২৫ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে (অর্থাৎ পরবর্তী ২৫ বছরে) তথ্যের পরিমাণ আবার আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের সময় সীমায় (অর্থাৎ পরবর্তী ২০ বছরে পরিমাণ বেড়েছে তার আগের মোট তথ্যের দ্বিগুণ। পরবর্তী ২০ বছরের (অর্থাৎ ১৯৯০ সাল পর্যন্ত) কোন হিসাব পাওয়া না গেলেও চোখ বুজেই বলা যায় যে ঐ সময়ের মধ্যে তথ্য বৃদ্ধির হারও নিশ্চয়ই দ্বিগুণের কম হবে না।

॥ তথ্য প্রযুক্তিবিদ ॥

যে হারে তথ্য বেড়ে চলেছে তাকে আজ প্রথাগত পদ্ধতিতে মানুষের পক্ষে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া সংগ্রহ-সংরক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না। তাই জন্য তথ্য প্রযুক্তির নানা উপকরণের আবির্ভাব ঘটছে এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে পুরনো স্থানিক পদ্ধতিকে বাতিল করে দিয়ে আরও উন্নত ধরনের প্রযুক্তির প্রচলন হচ্ছে। এই পরিবর্তন আনতে যাঁরা সরাসরি সাহায্য করছেন তাঁরাই তথ্য প্রযুক্তিবিদ। কমপিউটার ও আনুসঙ্গিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে, পরিবর্তনে ও প্রচলনে প্রধান ভূমিকা পালন করছেন এইসব তথ্য প্রযুক্তিবিদরা। বর্তমানে এই ধরনের অসাধ্যসাধনকারী বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা ও কদর বেড়েই চলেছে।

॥ তথ্য কর্মী / ব্যবস্থাপক ॥

এই গোষ্ঠীতে যাঁদের ধরা যেতে পারে তাঁরা হলেন তথ্য প্রযুক্তির কারিগর, প্রচারক, প্রশিক্ষণদাতা বিভিন্ন তথ্য খণ্ডের অপারেটর, সারাইকর্মী থেকে আরম্ভ করে গ্রন্থাগারকর্মী পর্যন্ত। বর্তমানে অফিসের কোনো, টাইপিস্ট, সেক্রেটারি প্রভৃতির কাজও কিন্তু কমপিউটারের যুগে তথ্যকর্মীর কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে তথ্য কর্মীরা অন্য ধরনের কর্মীদের (অর্থাৎ সাধারণ শ্রমিক কৃষককে) সংখ্যালঘুতে পরিণত করে দিচ্ছে। বর্তমানে 'জ্ঞান শিল্প' (Knowlege Industry) বলে একটি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। তথ্য সৃষ্টি, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য ব্যবসা, তথ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত সব ধরনের কর্মীদের 'জ্ঞানকর্মী' (Knowlege Worker) আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।

॥ তথ্য ব্যবসায়ী ॥

কমপিউটার ও তার আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং উপকরণের উৎপাদন ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরই এই গোষ্ঠীতে ধরা হয়ে থাকে।

॥ তথ্য ব্যবহারকারী ॥

এই গোষ্ঠীতে সমাজের সমস্ত মানুষকেই ধরতে হবে। তথ্য কম বেশি নানা ভাবেই সব শ্রেণীর মানুষ প্রতিদিন ব্যবহার করে আসছে সভ্য পৃথিবীর আবির্ভাবের সময় থেকেই। কিন্তু তথ্যব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় দু'দিক থেকে—পরিমাণগত ও গুণগত। সমাজের খুবই ক্ষুদ্র অংশের পক্ষেই পরিমাণে বেশি ও উচ্চমানের তথ্য ব্যবহারের সুযোগ আছে। উন্নত সমাজ-গুলিতেও শিক্ষাগত বাধা খুব একটা না থাকলেও বেশির ভাগ মানুষের কাছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও রুচিগত বাধা ক্ষেত্রে চোখে পরে।

॥ তথ্য সমাজের গুণগত ও পরিমাণগত অবস্থান ॥

এক শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলেছেন—উচ্চদরের

তথাভিজ্ঞ নাগরিক হওয়ার জন্য কি শুধুই বেশি বেশি পরিমাণে তথ্যের প্রয়োজন আছে? বিচার করার কি প্রয়োজন নেই যে কি ধরনের তথ্য প্রতিদিন উৎপাদন ও মজুত করা হচ্ছে? আর তাও কি দেখার প্রয়োজন নেই যে ঐ সব তথ্যের সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কি মূল্য আছে? এটাও কি দেখা উচিৎ নয়—যে সমস্ত তথ্য-ভিত্তিক বৃত্তি প্রতিদিন 'উন্নত সমাজগুলিতে' বেড়ে চলেছে তার উদ্দেশ্যই বা কি আর ঐ সব বৃত্তিগুলি সমাজকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে? এক কথায় পাইকারি হারে উৎপাদিত তথ্যের মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে কি না? আর যদি থেকে থাকে তবে কিসের মাপকাঠিতে তার মূল্যায়ন হবে? প্রশ্ন গুলো খুবই সহজ কিন্তু উত্তর মনে হয় বেশ কঠিন। কেননা প্রশ্ন উঠবে—(১) তথ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব কিনা; (২) সম্ভব হলেও নিয়ন্ত্রণ উচিৎ হবে কি না; (৩) ঐ দায়িত্ব কে বা কারা পালন করবে; (৪) যিনি বা যাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন তাঁদের নির্বাচনের পদ্ধতি কি হবে; (৫) ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতা ও মূল্যবোধের মাপকাঠিই বা কি হবে ইত্যাদি। এই কঠিন বিতর্কিত বিষয়ে সমাধান খুব সহজসাধ্য নয়। কোন সর্বকালীন ও সর্বজনীন নীতি নির্ধারন করা সম্ভব কিনা এসব প্রশ্নও উঠবে। বিতর্ক চলবে। স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ কোন একটি মাত্র পদ্ধতি হয়ত বাছাই করা সম্ভব হবে না। তবু মনে হয় সামগ্রিক সমাজপ্রগতির স্বার্থে কতগুলি মৌলিক মূল্যবোধের উপর আমাদের নির্ভর করতেই হবে। আশা করা যায় সমাজবিজ্ঞানীরা যখন 'তথ্য সমাজের' সংজ্ঞা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলছেন তখন সমাধান সূত্রও হয়ত একদিন খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে দেখে শুনে মনে হচ্ছে বর্তমানে অবস্থাটা খুব স্বচ্ছ নয়।

॥ প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তথ্য কর্মীর 'তথ্য সমাজে' ভূমিকা ॥

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তথ্য কর্মীদের কাজের ধরণ ও পদ্ধতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে বদলাচ্ছে। তথ্যের পরিমাণ গুণগত পরিবর্তন, তথ্যব্যবহারকারীর চাহিদার বৈচিত্র্য, নতুন নতুন তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রভৃতি এই বদলের কারণ। এই পরিবর্তন সত্ত্বেও গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত তথ্যকর্মীর কাজের মৌলিক দিকগুলি একই থাকছে—যেমন তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, বিন্যাস, সংরক্ষণ ও পরিষেবা। প্রশ্ন উঠতে পারে—'তথ্য সমাজে' কি গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐ মৌলিক কাজগুলির কোন পরিবর্তন, সংশোধন বা সংযোজন ঘটেছে? যদি ঘটে থাকে তবে সেগুলি কি ধরণের এবং 'তথ্য সমাজের' নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সঙ্গতি কোথায়? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের হয়ত আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু যে প্রশ্নগুলির উত্তর 'তথ্যসমাজের' কাছ থেকে এখনই আশা করা যায় তা হলো—ঐ সমাজ কি তথ্যের সত্য-মিথ্যা এবং নৈতিকতা-অনৈতিকতা যাচাইয়ের কোন সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পেরেছে? প্রশ্নটা উঠছে কারণ 'তথ্য সমাজে' তথ্যের সঙ্গে উচ্চ প্রযুক্তির যতখানি যোগাযোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তথ্য শিল্পে যত বেশি লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে সেই হারে কিন্তু তথ্যের মান (বিশেষভাবে সমাজ-নৈতিকতার দিক থেকে) উন্নয়নে অথবা সকলের জন্য প্রয়োজনীয় থেকে সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। কথাটা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত যে কোন তথ্য কর্মীর কাছে বার বার ফিরে আসছে কারণ সে তথ্যের ব্যবসা করতে আসেনি তার একটা বিশেষ সামাজিক দায় আছে। ঠিক সেজন্যেই প্রায় ষাট বছর আগে ইংরেজ কবি T. S. Eliot-এর লেখা কবিতার কটা লাইন তাকে নতুন করে ভাবাবেই :

Where is the Life we have lost in living ?

Where is the wisdom we have lost in Knowledge ?

Where Is the knowledge we have lost in

information ?

(T. S. Eliot : Collceted poems 1909-1935 London Faber & Faber, 1985)

তথ্যসূত্র :

১। Jonscher, C, : 'Information resources and Economic Productivity" Information Economies and Policy, Vot. I (1983)

২। Roszak, Theodore : The Cult of Information : the Folklove of Computers and the True Art of Thinking. Cambridge, Lutter worth press, 1986

৩। Webster, Frank : what information Society ? The Information Society, Vot 10 (Jan-March, 1994)

৪। William, Fred (ed) : Meaning of Information Society. London, Sage, 1988.

ভ্রম সংশোধন

"গ্রন্থাগার" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "পুস্তক পরিচয়" বিভাগে সাময়িকপত্রে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন পুস্তকটির লেখকের নাম অসিতাভ দাশের পরিবর্তে মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ অসিতাভ দাশ মুদ্রিত হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। সম্পাদক

গ্রন্থাগার, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্যাট চুক্তি

প্রদোষ বাগচী

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের উপর গ্যাট চুক্তি কতটা প্রভাব ফেলতে পারে পারে তা আলোচনা করার পূর্বে 'গ্যাট' সম্পর্কে আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

২য় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। সেই সাথে উন্নত দেশগুলির ও আভ্যন্তরীন সংকট ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। চরম অরাজকতা বিরাজ করে। এই পরিস্থিতি দ্রুত কাটিয়ে উঠে, ভবিষ্যতে যাতে বাজার সম্প্রসারনের ক্ষেত্র আরো বৃদ্ধি করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সাল নাগাদ ইংল্যান্ড ও আমেরিকা একটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে 'গ্যাট' নামক সংস্থা গঠিত হয়। যার পুরো নাম হল 'জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড টেরিফস্' সংক্ষেপে গ্যাট। এই সংস্থা তার বিভিন্ন রাউন্ডে বাণিজ্য সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা চালিয়ে নীতি নির্ধারণ করে থাকে। লক্ষণীয় যে ১৯৩৪ সালে আমেরিকা 'রেসিপ্রোকাল ট্রেড এগ্রিমেন্ট' নামে যে বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন করেছিল তারই সাথে সঙ্গতি রেখে গ্যাটের ৫ম রাউন্ড পর্যন্ত বাণিজ্য নীতি পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৬২-৬৭ সালে পর্যন্ত ৬ষ্ঠ রাউন্ডের আলোচনা চলে। এই সময় অর্থাৎ ১৯৬২ সালেই আমেরিকা আবার নতুন বাণিজ্য নীতি 'ট্রেড এক্সপানশান অ্যাক্ট্' চালু করে। ১৯৭০ সালের টোকিওতে শুরু হয় ৭ম রাউন্ডের আলোচনা। এই সময় আমেরিকা আবার তার পুরোনো বাণিজ্য নীতি পরিবর্তন করে ১৯৭৪ সালে 'ট্রেড অ্যাক্ট্'—১৯৭৪' প্রয়োগ করে। ৮ম রাউন্ডের আলোচনা শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। এ সময়েও আমেরিকা পূর্বের গৃহীত 'ট্রেড অ্যাক্ট্'—১৯৭৪'-র ক্ষেত্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়, যা 'সুপার-৩০১ এবং স্পেশাল ৩০১' ধারা নামে পরিচিত। ৮ম রাউন্ডের আলোচনাকে ঘিরে বিশাল মত পার্থক্য তৈরী হয়। অবশেষে ১৯৯১ সালে 'ব্রাসেলসে' এর মূল খসড়া গৃহীত হয়। আর্থার ডাংকেলের প্রভাব অনুযায়ী এই গ্যাট চুক্তিতে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার ফলে এই চুক্তি একটি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মেধাজাত সম্পত্তি সংরক্ষণের অধিকার, বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সহ পরিষেবা মূলক ক্ষেত্র বাণিজ্য ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়াতেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। টোকিও রাউন্ডে আলোচনা চলাকালীন সময়েও ঐ বিষয়গুলিকে গ্যাটের আওতায় আনা হয়নি। ঐ বিষয়গুলির জন্য পৃথক পৃথক আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। যেমন মেধাজাত সম্পত্তি সংরক্ষণের অধিকারের বিষয়টি 'ওয়ার্ল্ড ইনডাসট্রিয়াল প্রপারটি অরগানাইজেশনে' আলোচনার বিষয়। এ ছাড়া অন্যান্য কিছু বিষয় 'ইউনাইটেড নেশনস্ কনফারেনস অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বা 'আঙ্কটাডে' আলোচিত হতে পারত। কিন্তু তা না করে এদের গ্যাটের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এসব কারণেই গ্যাট চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে চলছে বিতর্ক। ডব্লু, আই, পি, ও বা 'ওয়ার্ল্ড ইনডাসট্রিয়াল প্রপার্টি' অরগানাইজেশনের বিষয়বস্তু যখন 'গ্যাটে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাই গ্রন্থাগার ও তথ্য সংক্রান্ত বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এখানে প্রশ্ন আসা অস্বাভাবিক নয় যে উক্ত বক্তব্যের সাথে গ্রন্থাগার জগৎ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্পর্ক কোথায়। সুতরাং এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে

বিবেচনা করা দরকার।

'ডাঙ্কেল প্রস্তাব'-র মধ্য দিয়ে যদি গোটা বিশ্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়, তবে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের উপর তা কোন প্রভাব ফেলবে কিনা বা গ্রন্থাগার আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কোন এক অনাকাঙ্খিত জায়গায় এনে দাঁড় করাবে কিনা, তা নিয়ে গভীর সংশয় রয়েছে। মূলতঃ গ্রন্থাগারকে যাঁরা এখনো শুধুমাত্র বইয়ের সংগ্রহশালা হিসাবে ভাবেন এবং গ্রন্থাগার জগৎকে যাঁরা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে স্থান দিতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন তাদের সাথে গ্রন্থাগার মনস্ক ব্যক্তির ভাবনার পার্থক্য রয়েছে। গ্রন্থাগারই হল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার দ্বারা সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবীয় কার্যকলাপ সৃষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়। একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সামাজিক সমস্ত কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করাই এর কাজ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সহায়তা প্রদানের জন্য, সমস্ত কর্মকাণ্ডকে মানুষের মঙ্গলার্থে পরিচালনা করবার জন্য গ্রন্থাগার দায়বদ্ধ। কিন্তু গ্যাট চুক্তির মধ্যে 'গ্লোবালাইজেশনের যে কথা বলা হয়েছে তাতে ট্রেড অ্যান্ড টেরিফের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দেবে। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে প্রচলিত গ্যাট চুক্তিতে [যদি সুনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য অব্যাহত থাকে] ২০০২ সালে বিশ্বে ২৭,৪২০ কোটি ডলারের অতিরিক্ত বাণিজ্য সৃষ্টি হবে। তার মধ্যে উন্নত ১১টি দেশ অতিরিক্ত বাণিজ্যের ১৮,৭৪০ কোটি ডলার ভোগ করবে, আর চুক্তিবদ্ধ বাকী সদস্য দেশগুলি সবাই মিলে মাত্র ৮,৬৪০ কোটি ডলারের অতিরিক্ত বাণিজ্য-র সুযোগ ভোগ করবে। শুধু তাই নয় অনুন্নত দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ অব্যাহত থাকবে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরও আমেরিকা ভারত থেকে তার বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারা প্রত্যাহার করেনি। রপ্তানী বাণিজ্যে যেখানে গত বছর বৃদ্ধির হার ছিল ২১% এবছর গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর তা কমতে কমতে ৯% এসে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ খতিয়ে দেখতে সুরক্ষাগাম স্বামীকে চেয়ারম্যান করে একটি গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি রেয়ন বস্ত্রের ক্ষেত্রে ভারতের রপ্তানীতে অংশগ্রহণ বাতিল করা নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়েছে। আবার এরই সাথে 'স্পেশাল ইমপোর্ট লাইসেন্স'-র নামে আমাদের আমদানির তালিকায় আর কিছু পণ্য ঢোকাতে বাধ্য করা হচ্ছে। গ্যাট চুক্তি কার্যকরী হওয়ার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই যদি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এত বৈষম্য সৃষ্টি করে তবে অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড যে ব্যাহত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফল স্বরূপ আগামী দিনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহজ রূপ বিঘ্নিত হতে পারে এবং গ্রন্থাগার সম্পর্কে 'ইউনেসকো' যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হতে পারে। এই আশংকা রয়েছে।

একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগার সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করে। কিন্তু 'ট্রিপস'-র আওতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেটেন্ট' ও কপিরাইট অ্যাক্টের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর ফলে গবেষণার ক্ষেত্রে আনা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ। এই আইনের বলে যদি গ্রন্থাগারের কাজের ক্ষেত্র সংকুচিত হয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখন ট্রিপসের মধ্য দিয়ে পেটেন্ট ও কপিরাইটের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা আলোচনা করা দরকার। তার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান কিভাবে প্রভাবিত হতে পারে সে সম্পর্কে হয়ত কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

এই প্রবন্ধে মূলতঃ 'পেটেন্ট আইন' ও মৌলিক গবেষণা নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হবে।

পেটেন্ট আইনের দ্বারা কোন আবিষ্কারক তার উৎপাদিত পণ্য বা দ্রব্য আবিষ্কারের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির জন্য এমন এক অধিকার ভোগ করে যার বলে একমাত্র ঐ আবিষ্কারক ব্যতিত অন্য কেউ বিনাশর্তে সেই আবিষ্কৃত

দ্রব্যকে অনুকরণের দ্বারা তৈরী করে ভোগ করতে পারে না। অনেকটা একচেটিয়া অধিকারের মত সুবিধা এই আইনের দ্বারা ভোগ করা যায়। এর জন্য অবশ্য একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

প্রথমদিকে বিশেষজ্ঞরা পেটেণ্ট আইনের বিরোধিতা করেছিল। নেদারল্যাণ্ডের ১৮০১ সালের পেটেণ্ট আইন, সুইজারল্যাণ্ডের ১৮৩১ সালের পেটেণ্ট আইন, সুইডারল্যাণ্ডের ১৮৪৯ সালের পেটেণ্টের ধারণা বাতিল হয়। পরবর্তীকালে কোন কোন দেশে অবশ্য কিছু কিছু বিষয়ের উপর পেটেণ্ট প্রদান করা শুরু হয়। জার্মান ও সুইজারল্যাণ্ড ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত রাসায়নিক দ্রব্যের উপর পেটেণ্টের অধিকার দেয়নি। এই শতকের শেষ ভাগে বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটায়। নিজ নিজ উপনিবেশে বাণিজ্য বিস্তার করার কাজে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মানব সম্পদকে কাজে লাগানো হল। বাণিজ্য সম্প্রসারিত হল। আর তখন থেকেই আবার পরিষেবা, মেধাস্বত্ব ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পেটেণ্ট আইনের প্রয়োজন হল নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে। এই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রগুলি ১৮৮৩ সালে প্যারিস কনভেনশনে মিলিত হল। এখানেই যে পেটেণ্ট আইন চালু করা হল তা তৃতীয় বিশ্বের উপনিবেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী। এখানে মনে রাখা দরকার ভারতে ১৮৫৯ সালে পেটেণ্ট আইন রচিত হয়েছিল বিদেশী শাসক বর্গের ইচ্ছানুযায়ী। যাইহোক প্যারিস কনভেনশন থেকে গৃহীত পেটেণ্ট আইন ৬ বার পরিবর্তিত হয়েছিল।

১৯৭০ সালের একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে গোটা বিশ্বে যখন ৩৫ লক্ষ পেটেণ্ট স্বীকৃত ছিল তার মধ্যে ২ লক্ষ পেটেণ্টকে কাজে লাগানো হয়েছিল বাকীগুলি অব্যবহার্য হিসাবেই ছিল। এগুলি থেকে দেশের কোন উপকার হয়নি। কোন উৎপাদন প্রযুক্তি গড়ে ওঠেনি। এরপর ১৯৭৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের প্রজ্ঞাব অনুযায়ী আংকটাডের প্রযুক্তি হস্তান্তর কমিটি কিছু সুপারিশ করে যাতে তৃতীয় বিশ্বের বেশগুলির কথা মাথায় রেখে দেশে দেশে গবেষণা, প্রযুক্তি সংক্রান্ত আদানের বিনিময় সহজ ও সরল হয় ও দেশের সার্বিক বিকাশের দিকে নজর দেওয়া হয়। বলা হয় কোন বিদেশী পেটেণ্টজাত পণ্যের আমদানি ও ঐ পেটেণ্টকে ঐ দেশে চালু করা সমার্থক নয়। আরো বলা হয় যে মেধাস্বত্ব নিয়ে কোন আলোচনা গ্যাটের আওতায় থাকবে না তা থাকবে আংকটাড এবং ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশনের আওতায়।

সুতরাং গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন রেখে মেধাজাত সম্পত্তি সংরক্ষণের অধিকারের আলোচনা করা অসম্ভব। এখন পেটেণ্ট আইন নিয়ে নানা বিচার করতে হয় তবে একদিকে যেমন মেধাস্বত্ব রক্ষিত হচ্ছে কিনা দেখতে হবে, পাশাপাশি তা দেশজ উৎপাদনে সাহায্য করছে কিনা তাও দেখা দরকার। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ভারতের পেটেণ্ট আইন (১৯৭০)-এ প্রযুক্তি গোপনকে মেধাস্বত্ব দেওয়া হত। কিন্তু গবেষণার দ্বারা বিকল্প পথে ঐ সমমানের পণ্য উৎপাদনে কোন বাধা দেওয়া হত না। কৃষি; উদ্যান জীব বা উদ্ভিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে পেটেণ্ট দেওয়া হত। ফলে গবেষণা করার সুযোগ ছিল। কিন্তু ট্রিপস অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে কৃষিতে প্লাণ্ট ব্রিডার্স রাইট অনুযায়ী গবেষণার কাজকর্ম সংকুচিত হবে। পূর্বে ভারতে যে আইন ছিল তার ফলে উচ্চফলনশীল বীজের গবেষণা করা হয়েছে। দেশে সবুজ বিপ্লব করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংএর মত আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ কম। এ নিয়ে গবেষণা চলছে। কিন্তু 'প্লাণ্ট ব্রিডার্স রাইট' অনুযায়ী সেইসব গবেষণার সুযোগ কমবে। এখন পণ্যের ও উৎপাদনের প্রক্রিয়ার উপর পেটেণ্টের অধিকার সুরক্ষিত হওয়ায় দেশে দেশে বিকল্প পথে গবেষণার কাজকর্ম বন্ধ হবে।

ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি পণ্য উৎপাদন সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিনিয়ত তথ্যের যোগান অব্যাহত রাখতে হয়। নতুবা পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন উপায়গুলির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হবে না। গবেষক কাজ করতে পারবে না। পণ্য উৎপাদিত না হলে বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে না। প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন রেখে সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্ণধার ডাঃ এস, আর রঙ্গনাথন এই ধারণা পোষন করতেন যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে গেলে নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য সরবরাহের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। দেশের মঙ্গলের জন্য এসব করতে হবে এবং গবেষকও প্রবৃত্তিবিদদের হাতে তুলে দিতে হবে প্রয়োজনীয় তথ্য।

বর্তমানে গবেষণা মূলক কাজকর্ম, প্রবৃত্তির প্রয়োগ এত দ্রুতহারে বাড়ছে যে গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মও এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। ৬০-র দশকের পর থেকে তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলিও প্রবৃত্তি করায়ত্ত করে পণ্য উৎপাদন শুরু করতে থাকে ও ধীরে ধীরে পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারেও প্রবেশ করতে শুরু করে। এরই সাথে সাথে দেশে দেশে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করতে থাকে। 'ইফলা' ও ইউনেস্কোর মিলিত উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনে আসে জোয়ার। দেশে দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। ইউনিভার্সাল অ্যাভেলেবিলিটি অব পাবলিকেশন এবং ইউনিভার্সাল বিবলিওগ্রাফিক কন্ট্রোলের কাজও ত্বরান্বিত হতে থাকে। প্রতিনিয়ত যে তথ্য তৈরী হচ্ছে তাকে সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে হয়। প্রয়োজনে তা আবার সরবরাহ করতে হয়। বৈজ্ঞানিক, প্রবৃত্তিবিদ গবেষকদের মধ্যে খোলামেলা সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রত্যেকেই উপকৃত হয়। আর এই কাজে নীরবে সহায়তা করে গ্রন্থাগারের কর্মীরা। মানবদেহকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত হার্ট, লাং যেভাবে কাজ করে ঠিক সে রকমই দেশের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মকে অব্যাহত রাখতে গ্রন্থাগার কর্মীরা কাজ করে যায়। এটা একটা জটিল প্রক্রিয়া। কোন একটাতে বাধা সৃষ্টি হলে গোটা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটাই ভেঙ্গে পড়তে পারে। ফলে মানুষের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার নষ্ট হতে পারে। সভ্যতার অগ্রগতিও রুদ্ধ হতে পারে।

যদি অতীতের দিকে ফিরে তাকাই তবে দেখতে পারব যে একদা ভারতবর্ষ ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। আর তার পিছনে ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার গ্রন্থাগার। ছিল বিশেষ তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। বার বার আক্রান্ত হয়েও লুণ্ঠিত হয়েও তার গৌরব ছিল ম্লান।

সুতরাং 'তথ্যই হল অর্থ'। তথ্যের উপর দখলদারী যার থাকবে বিশ্বে তারই থাকবে আধিপত্য। একথা সর্ববিদিত যে মানুষ যখন কথা বলতে পারত না তখনও মানুষ যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন উপায়ের ব্যবহার ঘটিয়েছিল। মানুষ এর পরে কথা বলতে শিখল। এর ফলে 'ইনফরমেশন কমিউনিকেশনের ক্ষেত্র কিছুটা প্রশস্ত হল। লিখতে শেখার সাথে সাথে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হল। প্রয়োজন হল জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। তৈরী হল গ্রন্থাগার। এর ফলে তথ্য যোগাযোগ বা ইনফরমেশন কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আরও দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হল। পুস্তকের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের আদান প্রদান করা সহজ সাধ্য হল। এল টেলিগ্রাফ, টেলিফোন। সরবর্তীকালে এল টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার। তৈরী হল ইনফরমেশন টেকনলজির যুগ। আর এই ক্রম-বিকাশের সাথে সাথে 'গ্রন্থাগার' তার অবস্থান পাল্টে নিয়ে 'গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান'-এ পরিণত হল। তথ্য বিজ্ঞান আজ আর বিশেষ কোন জায়গার আবদ্ধ নয়। সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমস্ত কর্মকাণ্ডের পিছনে রয়েছে উন্নত তথ্য ব্যবস্থা। ১৯৮০ সালে, মার্কিন কংগ্রেসের কাছে এই বার্তা আসে যে '৮০-র দশকে

তাঁর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব অর্থনীতির সম্মুখে আমেরিকার অবস্থা সঙ্গীন হবে। তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্বে থাকলে আমেরিকার বাণিজ্য-ব্যবস্থা সর্বোত্তভাবে উন্নত হবে। এর পর ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তৈরী হল। এই সংস্থা ১৯৮৮ সালে NTIA—২০০০ নামে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বাণিজ্য নীতির এক রিপোর্ট পেশ করে, যা টিপস ও টিপসের মধ্যে প্রতিফলিত।

নতুন নীতিতে গবেষণামূলক কাজকর্ম অব্যাহত রাখা সহজ হবে না। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যদি বিকাশ না ঘটে, যদি মেধাশক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, যদি দ্রব্য সামগ্রী পেটেন্ট করে তার গবেষণা মূলক কাগজপত্র গোপন রাখা হয়, যদি বিভিন্ন সম্ভাব্য বিকল্প উপাত্তগুলিকে পেটেন্ট করে রাখা হয় তবে তা দেশের প্রকৃত কল্যাণে ব্যবহৃত হবে না। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তথ্যের কেন্দ্রীভবন ঘটবে। এছাড়া টিপসের মধ্যে যে দিকটি আলোচনা করা দরকার তা হল ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটের সাথে 'ট্রেড রিলেটেড' কথাটি জোড়া হয়েছে। বস্তুত এই কথার অর্থ ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে। আমরা যখন, শিক্ষাগ্রহণ করি, জ্ঞান আহরণ করি তা হয়ত তখন ট্রেড রিলেটেড হয় না, কিন্তু যখন সেই জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক অবদান রাখতে চেষ্টা করি তখন তা কখনো কখনো ট্রেড রিলেটেড হয়ে ওঠে। গবেষণাগারে যখন গবেষণা চলে তখন হয়ত তা সরাসরি ট্রেড রিলেটেড হয় না, কিন্তু যখন ঐ গবেষণা লব্ধ জ্ঞান মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাই তখন তা ধীরে ধীরে ট্রেড রিলেটেড হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কোন কোন সময় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতি ট্রেড রিলেটেড হয়ে যায়। সুতরাং টিপসের মধ্য দিয়ে প্রভূত ভবিষ্যতে সমস্ত ধরণের গবেষণামূলক কাজকর্মের উপরে নিয়ন্ত্রণ করা হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

একদা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ডাঃ এস আর রঙ্গনাথনের প্রলেণ্ট্যায় যেটুকু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল তাকে আরো সংহত করা দরকার। গ্রন্থাগারে যদি তথ্য সংগ্রহ করার বিঘ্ন ঘটে, যদি মেধাশক্তির প্রয়োগ সংকুচিত হয় তবে তা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে দুর্বল করবে। বই বা তথ্য ব্যবহারে জন্য, প্রত্যেকটি বই বা তথ্যের জন্য থাকবে পাঠক, প্রত্যেক পাঠকের জন্য বই বা তথ্য থাকবে, এই সূত্রগুলি ধীরে ধীরে উপেক্ষিত হবে। টিপসের প্রভাবে তথ্যের অতিকেন্দ্রিকরণে প্রবল হবে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির স্বাধীন কার্যকলাপ চালাবার ক্ষমতা হ্রাস পাবে। গবেষণা মূলক কাজকর্মের ব্যাপকতা কমতে থাকবে। এর ফলে দেশে দেশে মেধাশক্তি বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ কমে যাবে। মেধাশক্তি বাইরে বিক্রি হবে। ব্রেইন ড্রেইন বাড়বে। গ্রন্থাগারগুলি অনুৎপাদক খাতা হিসাবে চিহ্নিত হবে। তথ্য যেহেতু পণ্যে পরিণত হবে তাই ইনফরমেশন ব্রোকারদের ব্যবসা হবে রমরমা। শিক্ষার বেসরকারীকরণের সাথে সাথে প্রি-পেইড এডুকেশন চালু হবে। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারের ভর বাতিল হবে। ইতিমধ্যেই এবছরের ১৩ই জুলাই 'দূর সংযোগ ব্যবস্থা'কে বেসরকারীকরণের জন্য নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকেই ভ্যালু অ্যাড সার্ভিসের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন—ভয়েস মেইল, ইলেকট্রনিক মেইল ডাটা সার্ভিসেস, অডিও—ভিডিও টেক্সট্ সারভিসেস ইত্যাদিকে বেসরকারীকরণের কথা চলছে। সুতরাং গ্যাট চুক্তির সমস্ত দিক নিয়ে গ্রন্থাগার দরদী ব্যক্তিদের মূল্যবান পরামর্শ আজ প্রয়োজন। বিচ্ছিন্ন না থেকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্যান্য শুভশক্তির সাথে মিলে মিশে কাজ করা দরকার, তবেই ইউনেসকোর ঘোষণা অনুযায়ী গ্রন্থাগারকে শিক্ষা, সংস্কৃতি জ্ঞানের জীবন্ত শক্তির মূর্ত প্রতিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

"বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ" ও কিছু ভাবনা

ডঃ কবিতা মুখোপাধ্যায়

বই এর সঠিক বিন্যাস একান্তই প্রয়োজন। নতুবা পথ হারানো পথিকের মত গ্রন্থাগারের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে। প্রয়োজনীয় বইটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। এই সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ দিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে চলেছে বর্গীকরণ পদ্ধতি। সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে অধিক ব্যবহৃত বর্গীকরণ পদ্ধতি ডিউই-র দশমিক বর্গীকরণ। এই পদ্ধতির উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব বেশি হওয়ায় বহু ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য-র শ্রেণী বিন্যাস যথার্থ হতে পারে না বর্গীকরণের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কারণে। এই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির অনুসরণে সৃষ্টি করেছেন 'বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ'। গ্রন্থবর্গীকরণ-এর আগে 'বাংলা' কথাটি যুক্ত করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্ট বর্গীকরণ পদ্ধতির উপর কিছুটা সীমারেখা টেনেছেন। অবশ্য ভূমিকাতে তিনি স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন ডিউই-র পদ্ধতিতে ভারতীয় ও প্রাচ্য বিষয়গুলির স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ বলে পদে পদে অসুবিধা বোধ করলাম। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই তাঁর এই 'বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ'-এর সৃষ্টি। স্বাভাবিক ভাবেই এর ব্যাপক ব্যাপ্তি ঘটেনি। কিন্তু, যদি এই বর্গীকরণ পদ্ধতিটিকে একটু পরিমার্জিত ও কিছুটা পরিবর্ধিত করে নেওয়া যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, তবে এর ব্যাপক প্রচলন সম্ভব। বিশেষতঃ বর্তমানে বিভিন্ন গ্রামীণ, সহর বা স্কুল গ্রন্থাগারের পক্ষে এটি বিশেষ ভাবে উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ পদ্ধতির সবচাইতে সুবিধাজনক শর্ত হল এটি ভারতীয় ভাবধারায় গঠিত। সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি জ্ঞানের যে কোন শাখায় যাওয়া যাক না কেন তার মধ্যে একটা ভারতীয়করণের ভাবনা সচেতন ভাবে কাজ করেছে। এটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য ইতিহাসের যে কোন বইকে যত সহজে শ্রেণীভুক্ত করা যায় সেটা ভারতীয় ইতিহাসের বই-এর ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ফলে কাছাকাছি একটা শ্রেণী সংখ্যা দিয়ে বইটিকে নির্দিষ্ট করতে হয়। সঠিক শ্রেণী নির্দেশ করা যায় না। যেমন 'পলাশীর যুদ্ধ' ডিউই অনুসারে 954·0294, Anglo-French Conflict, 1744—1757, including Battle of Plassey 1757 ; বা 'সিপাহী বিদ্রোহ' 954·0317 Governorship of Canning, 1856—1862, including Sepoy Mutiny, 1857—1858 ; অথবা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দুশো বছরের যে ইতিহাস তার জন্য কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী সংখ্যা 19th Ed ডিউই সংস্করণ পর্যন্ত নেই। ১৯ তম ডিউই সংস্করণ অনুসারে 954·04কে নির্দিষ্ট করেছে Independence and Partition, 1947—1971। অথচ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ'-এ 'ভারতে স্বরাজ আন্দোলন পর্ব' (১৪'৪৫)-এই পর্যায়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কালের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। শুধু ইতিহাস নয় সমস্ত শ্রেণী সংখ্যা বিন্যাসের ক্ষেত্রেই রয়েছে ভারতীয় চিন্তা-দর্শনের সঠিক বিন্যাসের উপযোগী শ্রেণী সংখ্যা। তবে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কিছু পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন, নতুবা যথোপযুক্ত শ্রেণী বিন্যাসে অসুবিধার

সম্মুখীন হতে হবে।

সামগ্রিক ভাবে সমস্ত বাংলা গ্রন্থবর্গীকরণকে নিয়ে আলোচনা একটি মাত্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। হাতে কলমে কাজ করতে গিয়ে নিজস্ব যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সে দুইই উল্লেখ করছি। যেমন, বাংলা সাহিত্যের বই-এর শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনামা না থাকায় ও কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকায়, বর্তমানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভিন্নমুখি বই-এর বিন্যাসে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। এখানে তাঁর বিন্যাস ধারাটি প্রথমে তুলে ধরছি, সেই পরিবর্তনের কিছুটা রূপরেখা চিত্রিত করছি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় '৮০' সংখ্যাটিকে নির্দিষ্ট করেছেন সাহিত্যের জন্য ডিউইতে সাহিত্য হল '৮০০'।

৮০—সাহিত্য-সাধারণ

এর পরের ভাগানুভাগ রয়েছে

'০০১ সাহিত্য পঞ্জী

'০০২ সাহিত্য চুম্বক, সার সংগ্রহ

যথা বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ।

এই পর্যায়ে শেষ ভাগ করেছেন

'০০৯ সাহিত্যের ইতিহাস সর্বভাষাভিত্তিক।

এরপর ৮০'০১ বাংলা সাহিত্য বিচার।

'০২ বাংলা সাহিত্য চুম্বক, সার সংগ্রহ

এই পর্যায়ের শেষ সংখ্যা '০৯ বাংলাসাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী।

লক্ষণীয় বিষয় হল প্রভাতকুমার '৯' সংখ্যাটিকে ডিউই-র মত শুধুমাত্র ইতিহাস ও ভৌগোলিক ধারণাকে বোঝাতে ব্যবহার করেন নি। কেননা '০০৯-কে নির্দেশ করেছেন 'সাহিত্যের ইতিহাস সর্বভাষা ভিত্তিক', (অবশ্য এখানে ইতিহাস-এর ধারণাটা রয়েছে)। কিন্তু '০৯ বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ৮১৯ বিদেশী কবিতা। এভাবে '৯' সংখ্যাটির ভিন্নতর ব্যবহার শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ-বর্গীকরণে

৮০—সাহিত্য সাধারণ

'০০১—সাহিত্য পঞ্জী···

'০০৯ –সাহিত্যের ইতিহাস সর্বভাষাভিত্তিক

এরপর শ্রেণী বিন্যাসিত হয়েছে

৮০'০১ বাংলা সাহিত্য বিচার···

৮০'০৯ বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী

এরপর সংক্ষেপিত রূপে বিন্যাসিত হয়েছে

৮০'১ বাংলা কাব্য বিচার···

৮০'৯ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

পরবর্তী বিন্যাস পর্যায় রয়েছে।

৮০'১ বিস্তারিত

৮০'১ বাংলা কাব্য বিচার

৮০'১৯ বিদেশী কাব্য সাহিত্যের বিচার···

৮০'২ বিস্তারিত

৮০'২ নাট্য বিচার

৮০'২৯ বিদেশী নাটকের সমালোচনা

৮০'৩ বিস্তারিত

৮০'৩ কথা সাহিত্য উপন্যাস বিচার

৮০'৩৯ বিদেশী উপন্যাস বিচার

এই ভাবে শ্রেণী বিন্যাস করে ৮০'৯কে নির্দিষ্ট করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (বিষয়ানুযায়ী)'

৮০'৯০১ কাব্য সাহিত্য

৮০'৯০২ নাট্য সাহিত্য

এই পর্যায়ে শেষে শ্রেণী সংখ্যা করেছেন :

৮০'৯০৯ বিদেশী সাহিত্যের ইতিহাস।

এই বিন্যাস ধারায় শুধুমাত্র বাংলাভাষার সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্য কিভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে এই শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতিতে তার কোন উল্লেখ নেই। বিদেশী সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি মূল শ্রেণী সংখ্যার সঙ্গে কোলন দিয়ে দেশের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণী সংখ্যা যুক্ত করার কথা নথিভুক্ত করেছেন, যেমন ৮০'২৯ : ৪২ শেকস্‌পীয়রের নাট্য বিচার, কিন্তু এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন নির্দেশ

নাবিভুক্ত করেন নি। তাঁর এই বিন্যাস পদ্ধতিতে বারে বারে বিভ্রান্তি আসে কেননা যেখানে তিনি সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন 'বাংলা কাব্য বিচার' (৮০'১) সেক্ষেত্রে অন্যান্য সাহিত্যের কাব্য বিচার বিন্যাসিত হবে কোন শ্রেণী সংখ্যায়? এদব ক্ষেত্রে 'বাংলা' কথাটা লোপ করে সাধারণভাবে সমস্ত ভাষার সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

কিন্তু ডিউই পদ্ধতিতে দেখা যাচ্ছে।

801 Philosophy & theory
·3 Value, Influence, effect
802 Miscellany about literature
808 Rhetoric and collections
809 History, Description, critical appraisal of more than one literature

এই ভাগানুভাগে নির্দিষ্ট কোন দেশের বা ভাষার সাহিত্য নয়, সাধারণভাবে সাহিত্যের শ্রেণী বিভাজন হয়েছে, যেটা জটিলতা কম সৃষ্টি করে। ডিউই 810—890 কে নির্দিষ্ট করেছেন বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের জন্য, যেমন 820 Eng. Literature, আর প্রতিটি ভাষার শ্রেণী বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন একটি করে 'Period Division'. প্রভাতকুমার 'সময়' (Period)-এর 'ভাগ' (Division) যোগ করেছেন শুধু মাত্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

৮১'২ পরিবর্তন যুগের কাব্য (১৭৫০-১৮৪০)
৮১'৫ বর্তমান যুগ (১৯৪০—)

যার ফলে বাংলা ছাড়া অন্য সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিন্যাস করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে একটা 'Period Division' যুক্ত করা যেতে পারে যাকে সর্বভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য এর শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতিটিকে যদি ডিউই পদ্ধতির অনুরূপে বিন্যাস করা যায়, যেমন ৮০ সাধারণ ভাবে সাহিত্য আলোচনা যেমন রয়েছে (ডিউই 801···) সেই ভাবনাটাকে রেখে সাহিত্যের একটা 'Form Division' অর্থাৎ কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প রচনা ইত্যাদির জন্য শ্রেণী বিন্যাস করা। যে 'Form Divison' সর্বভাষার সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনায়াসেই প্রযুক্ত হবে। এরপর ৮১ কাব্য সাহিত্য, ৮২ যাত্রা, নাট্য সাহিত্য, ৮৩ গল্প-উপন্যাস না করে ৮১-৮৯ পর্যন্ত ডিউই-র অনুরূপে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের জন্য নির্দিষ্ট করা। অবশ্য এই নব পর্যায়ে শ্রেণীর পুনর্বিন্যাসটি করতে হবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বর্গীকরণ পদ্ধতির দিকে নজর রেখেই, যাতে ভারতীয় চিন্তাদর্শের প্রাধান্য থাকে।

'বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ'-এর ভূমিকাতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'কোলন'-এর শ্রেণী সংখ্যার জটিলতার কথা উল্লেখ করেছেন, "···কোলন (Colon) পদ্ধতিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের নব্য ন্যায়ের নম্বর হচ্ছে R 625×6 : 1 এই বই স্থান চ্যুত হলে কে খুঁজে বের করবে? আমাদের সংস্কৃত বর্গীকরণে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের নম্বর 11·71"। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে 'কোলন'-কে অনুসরণ না করেও 'কোলন'-এর কিছু নিয়ম প্রয়োগ করে এই বর্গীকরণ পদ্ধতিটিকে বই শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে আর একটু উপযোগী করে তোলা যেতে পারে। শ্রী মুখোপাধ্যায় নিজেও 'কোলন'-এর কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তাঁর বর্গীকরণ পদ্ধতিতে, অবশ্য খানিকটা ভিন্নতর নিয়মে, যেমন 'বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ' অনুসারে ভারতীয় জ্যোতিষীদের জীবনী ৯২'৫২ : ৫৪ বা বুল জ্যোতিষী ৯২'৫২ : ৪৭। এখানে স্থান নির্দেশের জন্য ব্যবহার হয়েছে ' : ৫৪' এবং ' : '৪৭'। 'কোলন'-এ ' : ' ব্যবহৃত হয় 'E' (Energy) বোঝাতে। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাকে নির্দিষ্ট করার জন্য তিনি একটি করে বর্ণ", (alphabet) ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন এবং একটি তালিকাও সংযোজন করেছেন। যেমন সংস্কৃত : C0—99, অসমিয়া A 00—A 99, কানাড়ি C 00—C 99 ইত্যাদি।

এই 'বর্ণ' ব্যবহারের মধ্যে সূত্র থেকে যায় 'কোলন'

এ 'বর্ণ' (alphabet) ব্যবহার করে শ্রেণী নির্দেশ করা, যেমন : O-Literature, Q-Religion, বা S-Psychology ইত্যাদির প্রভাব। সুতরাং 'কোলন' বর্গীকরনের কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বর্গীকরণ পদ্ধতিটিকে অনেক বেশি শ্রেণীবিন্যাসে উপযোগী করে তোলা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে 'কোলন'-এ ব্যবহৃত 'Subject Device' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যার ব্যবহারে অনেক মিশ্র বিষয়কে শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব হয় সহজেই। যেটা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বর্গীকরণ পদ্ধতিতে বিশেষ উপযোগী হবে বলে অনুমান করি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ' অনুসারে বাংলা সাহিত্য সহ বাংলায় লেখা অন্যান্য সাহিত্যের বইগুলির শ্রেণী বিন্যাস করতে গিয়ে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকি সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজস্ব ভাবনাটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তবে পরিবর্তন ও পরিমার্জন যাই করা হোক না কেন সবসময় মনে রাখতে হবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল চিন্তা ধারা যেন ব্যাহত না হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে আরও একটা বিষয় উল্লেখ করব, এই বর্গীকরণ পদ্ধতিটিকে আরও সংপ্রসারিত করার জন্য 'Standard Subdivision' ও 'Period division' সংযোজন করা জরুরি। নতুবা অনেক ক্ষেত্রে 'সময়' উপেক্ষিত থেকে যাবে যা অধিকাংশ বইএর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া এই বর্গীকরণ পদ্ধতিটির সহজ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন সাধারণ কিছু নির্দেশাবলী, যার অভাব খুব বেশি ভাবে অনুভূত হয়।

পরিশেষে বলব যদি এই বর্গীকরণ পদ্ধতিটিকে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করা যায়, তবে সামগ্রিকভাবে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় ভারতের সব প্রদেশেই ছোট ও মাঝারি গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে একটা সহজবোধ্য ও সহজগম্য বর্গীকরণ পদ্ধতি পাওয়া যেতে পারে, যা একান্তভাবেই ভারতবর্ষের মূল চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী।

পাঠতালিকা

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ'।

২। Dewey Decimal Classification, 19th Ed.

৩। S. R. Ranganathan, Colon classification, 6th Ed.

ENGLISH ABSTRACTS

Abstracts by Dr. Ratna DasBanerjee

of articles, editorials etc.
Published in Granthagar V. 45,
Nos. 9—10 ; 1995-1996
Vol. 45, No. 9 Dec.—Jan. 1995-1996

Editorial :

In 1972 The Raja Rammohan Roy Library Foundation (RRRLF) was established to extend the all India library movement to grass root level and thus to establish the fact that books are for all. The Foundation is constituted with 22 members selected by the Central Government. The first Chairman of this Foundation was late prof-Nurul Hasan. The most popular project of this Foundation is the book donation project. Through the central book selection committee of the Foundation, mainly English books are distributed to state central libraries and district libraries. But for the last 3 years only Hindi books were given to district libraries and some of them are not standard books, These are not satisfying the users' demand of mainly non-Hindi speaking states. There are certain irregularities in the internal administration of the Foundation also. RRRLF should take proper care of these.

Technology library and Information Centrl —Ashish Bhattacharyya PP. 3—7

The nature and service of libraries are changing with technological development. The users of the technology library are coming mainly from two fields—education and industry. The resources of this type of library should contain textbooks, reference materials, handbooks, subject encyclopadia, manual, specifications, tables, charts, pamphlets of industries, journals, seminar procedings etc. Different services like inter library loan, computerised databases etc. should be introduced to organise and develop better information services.

Public libraries and its chronic problems —Pomi Sen PP. 8—10

States the problems of Government sponsored public libraries and suggests solutions. All members of the library committee should be aware of the library rules and regulations. Library workers should get their salaries through DLO and they should have freedom to apply their professional training in libraries. Librarians have to maintain accounts, so Accounting should be introduced as a subject in certificate and B. Lib. Sc. level. While one library worker is on study leave, generally without pay, another person can be recruited on leave vacancy. Library workers should also be

756·3/008/15

transferred every 3 to 4 years and authority should visit these sponsored libraries frequently.

An outline of information system in University Libraries—Anup Kumar Sarkar PP. 11—14

University library users can be broadly divided into three categories—Students, Researchers, teachers. They have different types of demand. Librarians should satisfy these various demands. This article has shown the information system of the university libraries with a diagram. The success of it is dependent on a good relation between the librarians and the users.

Information service in different types of libraries : an outline—public libraries—Ashok Kumar Roy PP. 15—17

Public libraries should make a survey of the locality to assess the users' demand and should collect resources like map of the locality, time table of local and long-distance trains and buses, names of local doctors, schools, important personalities, etc. and library workers should have an attitude to serve.

Vol. 45, No. 10 January-February 1996

Editorial—PP. 1—2

During 21—24th December, 1995, with the initiative of the Department of Science and Technology, Bengal Library Association Organised a Seminar and Exhibition at Calcutta Information Centre to open a new world to the library workers. Revolutionary changes are visible in the field of information technology through the development of various networks at national level such as I-net, Indonet, Nicnet, Railnet, Brnet, Sitnet etc. VSNL, CMC, AHED, NRDC, Informatics etc. showed some new resources giving a clear picture of the paperless libraries in the near future. Topics of discussion were mainly on information, marketing, information technology, information communication etc. and participants were from the field of information services. This shows the future course of the library movement.

P 10,043

Kalyani Public Library—Dr. Kunal Sinha PP. 3—8

States the history of Kalyani Public Library from its foundation. It was founded in August, 1975. The number of daily users of the library is quite high.

Role of bibliometrics in the public libraries of West Bengal—Kankan Sarkar PP. 9—16

Discusses the importance of bibliometrics in the present day library system. Defines 'bibliometrics' and 'librametrics'. The term 'librametrics' was first coined by Dr. S. R. Ranganathan. He applied it in his staff formula and planning the structure of service library. This article also shows the various application fields of bibliometrics. Many facets of bibliometrics and librametrics may be considered to be applicable to public libraries, such as Author Study, Productivity of Author, Content Study, Imprint Study, Ranking of journals, studies of word frequencies, citation study, bio-bibliometrics, evaluation of library resources, human resources, users etc.

প্রতিটি গ্রন্থাগারে অপরিহার্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশিত পুস্তক

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪) ৩৫·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) (১৯১৫-১৯৩০) ২০০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ ৪০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা ২৫·০০
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোন ২৫·০০
- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫·০০
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodology ১২৫·০০

Annual Subscription : Rs. 48·00 Licensed to post without prepayment
Single Issue Rs. 4·00. LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 46 : No. 3 June-July 1996

CONTENTS

PAGE

Editorial 1

Arun Ghosh

What and Why Information Society 3

Prodosh Bagchi

Libraries, Information Science and GAT Agreement 9

Dr. Kabita Mukhopadhyaya

"Bengali Book Classification" Some thoughts 14

Dr. Ratna DasBanerjee

English Abstracts 18

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay, for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014 Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005.
Editor : **Arun Ray**, Associate Editors : **Nirmalya Ray**

ISSN 0017-384X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৫ সম্পাদক : অরুণ রায় সহযোগী সম্পাদক : নির্মাল্য রায় ভাদ্র, ১৪০৩

সূচী

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় গ্রন্থাগারিক দিবস ১

ড. এফ. এম. বদিউর রহমান

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট

কাজলকুমার ঘোষ

বাংলা বইয়ের পাঠক বনাম ভোগ্যপণ্য

পলি দত্ত

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের চার দশক ১১

কুণাল সিংহ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবস্থা

চিঠিপত্র

সম্পাদকের বক্তব্য ২৮

ইউ ডি সির বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৫, সম্পাদক : অরুণ রায় / সহযোগী সম্পাদক : নির্মাল্য রায়। ভাদ্র, ১৪০৩

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিক দিবস

বিগত ১৯৯০ সাল থেকে প্রতি বছর আগষ্ট মাসের ১২ তারিখটি গ্রন্থাগারিক দিবস হিসাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। তারিখটি হল ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের (১৮৯২—১৯৭২) জন্মদিন।

এই দিবস উদ্‌যাপনের পশ্চাৎপট হল যে ১৯৮৯ সালে জয়পুরে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফর্মেশন সেন্টার্স (IASLIC)-এর বিষার্ষিক সম্মেলনকালে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েসনস অফ ইন্ডিয়া (JOCLAI, স্থাপিত ১৯৮০) নামে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সর্বভারতীয় সংসদের অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে স্থির হয় যে প্রতি বছর ১২ আগষ্ট তারিখটি অতঃপর গ্রন্থাগারিক দিবস হিসাবে পালিত হবে। জয়পুর সম্মেলনেই ইয়াসলিকের বার্ষিক সাধারণ সভায় ওই সুপারিশটি গৃহীত হয়। পরে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (ILA) সহ অন্যান্য পরিষদও সুপারিশটি গ্রহণ করেন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন যেমন শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয় এটিও সম্ভবত সেই নজিরে স্থির হয়।

পশ্চিম বঙ্গে ইয়াসলিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম-উদ্যোগে সারা দিনব্যাপী একটি সেমিনারের মাধ্যমে দিবসটি প্রথমাবধি উদ্‌যাপিত হয়ে এসেছে। এক এক বছরে এক একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় তাঁদের প্রেক্ষাগারে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। যথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন (১৯৯৭), রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন (১৯৯১), বোস ইনস্টিটিউট (১৯৯২), পরিষদ ভবন (১৯৯৩), সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (১৯৯৪), জাতীয় গ্রন্থাগার (১৯৯৫)। ১৯৯৬ সালে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনটি অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য নির্বাচিত হয়।

উল্লেখ্য, সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গে ১২ তারিখের পূর্বে কিংবা পরে কাছাকাছি কোনো ছুটির দিন অথবা রবিবার দিনটি উদ্‌যাপিত হয়ে এসেছে। সেই কারণে ১৯৯৬ সালের ১১ আগষ্ট তারিখটি রবিবার থাকায় কলকাতায় এবং দিল্লিতেও (ILA) দিনটি নির্বাচিত হয়েছে। জন্মদিনের পূর্বে কিংবা পরে দিবস উদ্‌যাপনের রীতি প্রচলন-বহির্ভূত নয়। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনে ১ বৈশাখ তারিখে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। অনুরূপ আরও নজির আছে।

গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬ সাল থেকে আরও একটি দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। সেটি

হল ২০ ডিসেম্বর ; তারিখটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ; দিনটি এবং ওই দিন থেকে পরবর্তী সপ্তাহ এ রাজ্যে যথাক্রমে গ্রন্থাগার দিবস এবং গ্রন্থাগার সপ্তাহ হিসাবে পালিত হয়।

গ্রন্থাগার দিবস এবং গ্রন্থাগারিক দিবসের তাৎপর্য অবশ্য এক নয়। লক্ষ্য ও কর্মসূচিও ভিন্ন। সেকথা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার।

গ্রন্থাগার দিবস (২০ ডিসেম্বর) সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। দিবসটি হল গ্রন্থাগার আন্দোলনের অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণের, বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন এবং আগামী দিনের কর্মপন্থা নিরূপণের একটি উপলক্ষ বিশেষ। সর্বস্তরের মানুষকে গ্রন্থমুখী ও গ্রন্থাগারমনা করার উদ্যোগী কর্মসূচীর মাধ্যমে দিনটি সাধারণভাবে জনসংযোগ বৃদ্ধির জন্য চিহ্নিত থাকে। সাক্ষরতা শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে বই মিছিল, বইমেলা, বই ও অর্থ সংগ্রহ আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন হল ওই কর্মসূচীর অঙ্গ।

অপরদিকে গ্রন্থাগারিক দিবস হল গ্রন্থাগার কর্মীদের একান্ত নিজস্ব একটি উপলক্ষ্য যেদিন কর্মীরা একত্রে মনপ্রাণ খুলে পরিষেবাগত নিজেদের অনুভূতি ও ভাবনাচিন্তা ব্যক্ত করেন। আত্মসমীক্ষা, আত্মসমালোচনা ও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে পরিষেবার মূল্যায়ন করেন। পুরোনো কাজের ধারার বিচার-বিশ্লেষণ ও নতুন উদ্ভাবনার কথাও বলা হয়ে থাকে অল্প বিস্তর। গ্রন্থাগারের প্রকার নির্বিশেষে ছোটবড় সর্বস্তরের কর্মীরাই আলোচনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পান। ভাবটা অনেকটা 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজ্যের রাজত্বে'। কর্মীদের নিজস্ব এই গ্রন্থাগারিক দিবস Ritualistic কিছু নয়। তাই বৃত্তির বাইরের কারুর উপদেশ ও আদর্শের কথা শোনার অবকাশ হয়নি এযাবৎকাল।

১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের কালপর্বে প্রথম চার বছর গ্রন্থাগার বৃত্তির প্রবীণ ব্যক্তিরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়বিশেষের উপর বক্তৃতা দিয়েছেন ; রঙ্গনাথনের চিন্তাভাবনার পর্যালোচনা ও তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ। পরবর্তী দু'বছর অর্থাৎ ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠানের প্যাটার্ন পাল্টে যায়। 'প্যানেল ডিস্কাসান' রীতি অনুযায়ী একজন মডারেটর (সঞ্চালক) বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার কর্মীদের আলোচনার কাজ করেন। তাতে তাই সাধারণ, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগারের নবীন ও প্রবীণ কর্মীরা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করেন, যার ভিত্তিতে অন্যেরাও আলোচনায় অংশ নেন।

গ্রন্থাগারিক দিবসে বৃত্তিগত মৈত্রী (professional fraternity), কর্মীদের পারস্পরিক মিলন (get together) এবং সেইসঙ্গে বৃত্তিগত কর্মসম্পাদনে উদ্ভূত সমস্যা ও সম্ভাবনার উপর কর্মীদের পারস্পরিক অনুভূতি ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ পাওয়া যায়। সেই নিরিখে দিনটির মূল্য আজ অনস্বীকার্য। দিবসটি রাজ্যের অন্যান্য শহর এবং জেলা স্তরেও উদ্‌যাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট

এ. এফ. এম. বদিউর রহমান, ডাইরেক্টর অব্ দি ডিপার্টমেন্ট অব্ পাব্লিক লাইব্রেরীস,
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রবন্ধটি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন

তরুণ কুমার মণ্ডল

সূচনা :

বাংলাদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। নদীমাতৃক এই দেশে ২৩০টি নদনদী (যার মোট দৈর্ঘ্য ২৪,১৪০ কিঃ মিঃ) বয়ে চলেছে। স্বভাবতঃই এ দেশের মৃত্তিকা কৃষিতে উর্বর। আবার প্লাবন, ঝঞ্ঝা ও সামুদ্রিক স্রোতের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বারবার বাংলাদেশের ভাগ্যে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। ১,৪৭,৫৭০ বঃ কিঃ মিঃ আয়তনে বাহ্যে কোটিরও বেশি লোকের বাস। সিঙ্গাপুরের মতো কয়েকটি নগর রাষ্ট্র বাদ দিলে প্রতি বঃ কিঃ মিঃ তে জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে বাংলাদেশই পৃথিবীতে প্রথম স্থানে রয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৫৫ জন মানুষের বাস।

পৃথিবীর ৩১টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ৪১টি স্বল্প-আয়ের দেশগুলির মধ্যেও বাংলাদেশের স্থান রয়েছে, যদিও বিগত কয়েক বছরে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে। ১৯৭১-এ জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ তার জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণে ও জীবন-ধারণের মানোন্নয়নে ব্যস্ত। বর্তমানে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৩৪ ডলারের মতো।

সাম্প্রতিক অতীতে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুব উজ্জ্বল না হলেও বেশ কিছুটা স্থিতি এসেছে বলা যায়। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ, বিদেশী ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বেড়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার ৪-৫ শতাংশে হয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী স্বাক্ষরতার হার ছিল ৩২-৪ শতাংশ, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬-৬ শতাংশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং গত কয়েক বৎসর ধরে বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় করছেন। সরকার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ ব্যবহারের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। একটি জাতীয় গ্রন্থনীতি ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে এবং এতে গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, গ্রন্থনীতি প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন সম্ভব হবে। বিদেশ থেকে বই, পত্র-পত্রিকা আমদানীর ক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রার কোন সমস্যা বাংলাদেশে নেই।

গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা :

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র রয়েছে। যেমন, সাধারণের গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার। এ গুলি জনগণের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা মিটিয়ে চলেছে। বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

সাধারণের গ্রন্থাগার--ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের জন্ম। ঐ বৎসরে এক ভয়ংকর ও রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অধিষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে ঢাকায় ইষ্ট পাকিস্তান সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরী (১৯৫৮ সালের মার্চে স্থাপিত) নামে একটি সাধারণের গ্রন্থাগার এবং খুলনা ও চট্টগ্রাম ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্সে একটি করে সাধারণের গ্রন্থাগার ছিল। এ ছাড়া, ঢাকায় ছিল সেন্ট্রাল লাইব্রেরী অব্ পাকিস্তান। কপিরাইট অর্ডিন্যান্স, ১৯৬২ অনুসারে গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রকাশনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬২ সালে। তদানীন্তন পাকিস্তানের জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্ববঙ্গীয় অংশের বীজ এর মধ্যে নিহিত ছিল বলা যায়।

এ ছাড়া, পাকিস্তান কাউন্সিল নামে একটি সংস্থার তত্ত্বাবধানে আর এক ধরনের সাধারণের গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরে এর শাখা ছিল। এ ছাড়াও তথ্য মন্ত্রকের অধীনে, জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে, প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা হেডকোয়ার্টার্সে তথ্যকেন্দ্রে ২০০০—৩০০০ গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রকাশনা ছিল। বাংলাদেশের মুক্তির পর প্রথমোক্ত চারটি গ্রন্থাগারের নূতন নামকরণ হয় যথাক্রমে বাংলাদেশ সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরী, খুলনা ও চট্টগ্রাম ডিভিশনাল পাবলিক লাইব্রেরী এবং বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার। এগুলি সবই সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন। পাকিস্তান কাউন্সিলের নামকরণ হয় বাংলাদেশ পরিষদ এবং জনসংযোগ দপ্তরের অধীন সব জেলা ও মহকুমা তথ্যকেন্দ্রকে পরিষদের অধীনে আনা হয়।

এ ছাড়া, দেশে আর এক ধরণের গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল। এগুলিকে বলা হত বেসরকারী সাধারণের গ্রন্থাগার। ব্রিটিশ রাজত্বকালে বিক্ষিপ্তভাবে এগুলি তদানীন্তন জমিদার বা উচ্চবর্গীয় সরকারী কর্মচারী বা লোকহিতৈষী ব্যক্তি বা বিভিন্ন ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের বদান্যতায় তৈরী হয়েছিল। ১৮৫০ সালে ইংল্যান্ডে এইসব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাক্ট গৃহীত হয়, এর প্রভাবে ১৮৫১ সালে বর্ধমান জেলা শহরে প্রথম এই ধরনের সাধারণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর ১৮৫৪ সালে বগুড়া, রংপুর ও বরিশাল জেলা শহরে সাধারণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে রাজশাহী (১৮৭১), ঢাকা (১৮৭৪), কুমিল্লা (১৮৮৪), পাবনা (১৮৯০), নোয়াখালি এবং সিলেট (১৮৯৭), চট্টগ্রাম (১৯০৪), কক্সবাজার (১৯০৬), মুন্সীগঞ্জ (১৯০৮), কিশোরগঞ্জ (১৯০৯), কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও খুলনা (১৯১৪), দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ (১৯৩০)-তে সাধারণের গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থাগার গুলি সবই বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কোনো আইনী বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে নয়। যদিও লোকাল গবর্ণমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮৪ এবং এই আইনের ১৯১৯ সালের সংশোধনী অনুযায়ী জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে গ্রন্থাগার স্থাপন ও তত্ত্বাবধানের জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাধ্যতামূলক না হওয়ায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে খুব একটা উদ্যোগ নেয় নি। যাইহোক তারা পূর্বোক্ত গ্রন্থাগারগুলি আবেদন করলে অল্পস্বল্প অর্থ সাহায্য করতো। এই গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহ ভালই ছিল। বাংলাদেশ মুক্তির সময় এই ধরনের গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ১১০। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায়, দেশে এই ধরনের সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারী গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৮৬৫। সারা দেশের শহর ও গ্রামীণ এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা এই গ্রন্থাগারগুলি সমাজসেবীদের দ্বারা পরিচালিত এবং চাঁদার বিনিময়ে শুধুমাত্র তালিকাবদ্ধ সদস্যদের পরিষেবা দিয়ে থাকে।

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার সংগঠনের বিকাশ

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রথম থেকেই অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা সাধারণের গ্রন্থাগার গুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ পরিষদের অবলুপ্তি ঘটে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ রিঅর্গানাইজেশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে পাবলিক লাইব্রেরীস ডিপার্টমেন্টের অধীনে বাংলাদেশ সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরীকে শীর্ষে রেখে এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা ডিভিশনাল পাবলিক লাইব্রেরী গুলিকে নিয়ে একটি ব্যবস্থা চালু হয়। অবলুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদের অধীন যেসব জেলা ও মহকুমা (বর্তমানে জেলাভেরে উন্নীত) হেডকোয়ার্টার্সের গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলি ছিল সেগুলিকে ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক লাইব্রেরীজ এর অধীনে ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক লাইব্রেরী ও দপ্তরের উপকেন্দ্র হিসাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানার, সাথে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে এবং এই দুটি সংস্থা সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন ডাইরেক্টরেট অব আর্কাইভস এ্যান্ড লাইব্রেরীস-এর আওতাভুক্ত।

মুক্তির সময় বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্লামেন্ট লাইব্রেরী এবং তদানীন্তন ইস্ট পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী (অধুনা বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী) উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিল। প্রথমটি পার্লামেন্ট সেক্রেটারিয়েটের অধীনে এবং এটি বাংলাদেশ সংসদের তথ্য চাহিদা মিটিয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি এস্টাবলিশমেন্ট মিনিস্ট্রির অধীনে আছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রককে অনুলয়সেবা দেওয়া এর কাজ। এ ছাড়াও, বাংলাদেশ সরকারের বেশীর ভাগ মন্ত্রকের অধীনে নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে।

বাংলাদেশে এখনও কোন গ্রন্থাগার আইন নেই, ফলে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি।

সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা :

জাতীয় গ্রন্থাগার সমেত সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সকল কার্যাবলী ও নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা সংস্কৃতিমন্ত্রকের উপর ন্যস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চিত্রটি নিম্নরূপ :

- জাতীয় গ্রন্থাগার
—বাংলাদেশ সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরী
—৩টি ডিভিশনাল পাবলিক লাইব্রেরী
—৫৮টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরী (আরও দুটি শীঘ্রই স্থাপিত হবে)
—৪টি শাখা গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান :

উপরোক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগ্রহে সর্বমোট ৯, ৪৮, ৬৬৮টি গ্রন্থ ও বাঁধাই পত্র-পত্রিকা রয়েছে। নীচের সারণি থেকে পার্লামেন্ট ও সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের সংগ্রহ, কর্মী ও ব্যবস্থাকারীর সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।

গ্রন্থাগারের প্রকৃতি	সংগ্রহ (১৯৯৩)	কর্মী সংখ্যা	দৈনিক গড়ে পাঠক সংখ্যা
জাতীয় গ্রন্থাগার	১,৫০,০০০	৫৬	১২৫
বাংলাদেশ সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরী	১,১৮,২৭৯	১০৬	২,০০০
৩টি ডিভিশনাল পাবলিক লাইব্রেরী	১,৫৪,২৯৩	৬৮	৪,৭৫১
৫৮টি জেলা গ্রন্থাগার ও ৩টি শাখা গ্রন্থাগার	৪,২১,০৯৬	২০২	৮,৬১৫
ন্যাশনাল পার্লামেন্ট লাইব্রেরী	৭০,০০০	২০	—
বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী	৩৫,০০০	০৭	৫০

গ্রন্থাগার কার্যাবলী :

গ্রন্থাগারের প্রকৃতি, আয়তন, অবস্থান ও ক্ষমতার উপর তার কার্যাবলী নির্ভর করে। নীচে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের কার্যাবলী বর্ণিত হলো :—

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার ঐ দেশে প্রকাশিত প্রতিটি প্রকাশনার সম্পদ ভান্ডার (depository) হিসাবে কাজ করে। জাতীয় গ্রন্থাগার অনুলেখ সেবা এবং গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য গ্রন্থগুলি সংগ্রহ, ব্যবহার উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া, ও সংরক্ষণ করে এবং এর ভিত্তিতে প্রতি বৎসর জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলন ও প্রকাশ করে থাকে। এ ছাড়াও জাতীয় গ্রন্থাগার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর বিশেষ করে বিদেশে প্রকাশিত বাংলাদেশ সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করে থাকে। জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি পাঠককক্ষও আছে।

বাংলাদেশে পাবলিক লাইব্রেরী নেটওয়ার্কের শীর্ষে রয়েছে সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরী। এটি গ্রন্থ ও অন্যান্য উপাদান কেন্দ্রীয় ভাবে সংগ্রহ, ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া (প্রসেসিং) ও বন্টন করে থাকে। কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ এবং তাদের ট্রেনিং ও কেন্দ্রীয় ভাবে হয়ে থাকে। এ ছাড়াও গ্রন্থাগারটি নিম্নলিখিত কাজগুলিও করে :—

—জাতি, ধর্ম, বয়স, নির্বিশেষে প্রতিটি নরনারীকে নিঃশুল্ক পরিষেবা দেয়।

– জনগণকে এবং বিশেষ করে সরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহকে অনুলেখ সেবা দেয় এবং গবেষণায় সহায়তা করে।

—শিশু ও কিশোরদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ও ঔৎসুক্যবৃদ্ধির জন্য একটি পৃথক গ্রন্থ সংগ্রহ ও পাঠকক্ষের বন্দোবস্ত।

—জনগণের বৌদ্ধিক বিকাশের লক্ষ্যে বক্তৃতা, গ্রন্থ প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগারটি একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

—সম্ভাব্য পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের আগ্রহের বিষয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা সংক্রান্ত নূতন গ্রন্থ ও পাঠ্য সামগ্রী সম্পর্কে খবর দেয়। রেট্রোগ্রাফিক সার্ভিস দেয়।

১৯৯৪ সাল থেকে তিনটি জেলা গ্রন্থাগার গ্রন্থ লেনদেন শুরু করেছে। অন্যান্য সাধারণের গ্রন্থাগারগুলি শুধু পাঠকক্ষের সুযোগ ও অনুলেখসেবা দিয়ে থাকে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার :

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (১১টি সরকারী ও ১০টি বেসরকারী) ১১টি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী ৯৮১টি ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ (সাধারণ) লাইব্রেরী, ৪টি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ লাইব্রেরী, ২টি সরকারী ও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ১টি ডেন্টাল কলেজ লাইব্রেরী, ৫টি পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী, ২৩টি হোমিওপ্যাথিক কলেজ লাইব্রেরী, ৫টি আয়ুর্বেদিক কলেজ লাইব্রেরী, ১০টি ইউনানী কলেজ লাইব্রেরী, ১টি টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ লাইব্রেরী, ৩টি এগ্রিকালচারাল কলেজ লাইব্রেরী, ৩২টি আইন কলেজ লাইব্রেরী, ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী এবং ১০টি গবর্ণমেন্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ লাইব্রেরী বর্তমান।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার :

বাংলাদেশে ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় (১১টি সরকারী এবং ১০টি বেসরকারী) এবং ১১টি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার রয়েছে। এ গুলি শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষকদের পরিষেবা দিয়ে থাকে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারের নিকট থেকে অর্থ সাহায্য পায়। ২১টির মধ্যে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ গড়ে ১০০,৭৯১ এবং পত্রিকা সংখ্যা গড়ে ৭৫৪। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সংগ্রহ বর্তমান, যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগারে তুলট কাগজ, বল্কল ও ভূর্জপত্রে লিখিত ৩০,০০০ পাণ্ডুলিপির এক বিরাট সংগ্রহ রয়েছে।

প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেই ফটোকপিয়ার, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস্, স্লাইড প্রজেক্টর, মাইক্রো-কম্পিউটার, ফ্যাক্স ইত্যাদি আধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলি রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব্ ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি লাইব্রেরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী তাদের নিজস্ব সংগ্রহের ডাটাবেস তৈরী করতে শুরু করেছে।

বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ভবন গুলি সুপরিকল্পিত নয় এবং আধুনিকীকরণেও অটোমেশনের সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত নয়। অন্যদিকে প্রচলিত কার্ড ক্যাটালগ সব গ্রন্থাগারেই আছে। এইসব গ্রন্থাগারের রেফারেন্স সংগ্রহ অবাধগম্য। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি BANSDOC-এর তত্ত্বাবধানে 'National Union Catalogue of Foreign Scientific and Technical Periodicals' সংকলনে অংশ গ্রহণ করেছে।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি নিজেদের মধ্যে এবং অনেক বিদেশী সংস্থার সাথে আন্তর্গ্রন্থাগার সহযোগিতা গড়ে তুলেছে। অনেক গ্রন্থাগারেই NAIS, DEVINSA, HELLIS, Medline, Popline ইত্যাদির সুবিধাগুলি রয়েছে।

কলেজ গ্রন্থাগার :

বর্তমানে বাংলাদেশে ১,০৩১টি কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট স্তরের ৩৮৪টি, স্নাতকস্তরের ৬০৫টি, সাম্মানিক স্তরের ৩০টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হলো ১৬টি। এ ছাড়াও ১৩১টি বৃত্তিমূলক কলেজ রয়েছে যার মধ্যে ১৭টি মেডিক্যাল, ১টি ডেন্টাল, ১টি নার্সিং, ৩৭টি হোমিওপ্যাথিক, ৩২টি আইন কলেজ, ২১টি সঙ্গীত কলেজ, ১০টি শিক্ষক শিক্ষণ, ২টি শারীর শিক্ষা ও ১৪টি অন্যান্য আন্তর্বিষয়ক কলেজ।

প্রতিটি কলেজেই একটি করে গ্রন্থাগার রয়েছে, কিন্তু সেগুলি সেকেলে হয়ে পড়েছে। স্তর এবং ছাত্র সংখ্যা নির্বিশেষে কলেজ গুলি গড়ে ১৩,০০০ টাকা গ্রন্থ ও অন্যান্য উপাদান ক্রয়ের জন্য পায়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এটি নিতান্তই অপ্রতুল। বিদেশী পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের কোনো সুযোগ নেই।

শতকরা ২৫ ভাগ সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারে বৃত্তি-কুশলী কর্মী রয়েছেন। বেসরকারী কলেজ গুলি গ্রন্থাগারে প্রায় কোনো বৃত্তিকুশলী কর্মী নেই বললেই চলে।

বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা গ্রন্থাগার :

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার :

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিলেও বাংলাদেশে বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার নেই বললেই চলে। অতি অল্প যে কয়েকটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার আছে সেগুলিও অসংগঠিত। গ্রন্থগুলি আলমারীতে তালাবন্ধ অবস্থায় থাকে কোন গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সংগঠিত নয়। দেশে বর্তমানে ১,০৯৫টি উচ্চবিদ্যালয়, ২,৭৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

মাদ্রাসা গ্রন্থাগার :

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬,১৬৯টি (৩,৮২৫টি দাখিল, ৮০৬টি আলিম, ৮৩২টি ফাজিল এবং ১০০টি কামিল স্তরের) মাদ্রাসা রয়েছে। এ ছাড়াও ১৬,২১৪টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে, কিন্তু এ গুলিতে কোনো গ্রন্থাগার নেই। অন্যান্য স্তরের মাদ্রাসা গুলিতে গ্রন্থাগার আছে। তবে গ্রন্থসংগ্রহ মূলতঃ ইসলাম ধর্ম-বিষয়ক।

বিশেষ গ্রন্থাগার :

বিশেষ গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের কোনো বিশেষ বিষয়ে তথ্য চাহিদা মিটিয়ে থাকে। বেশির ভাগ

দিলে আমাদের মর্যাদা থাকে না। দামী বিদেশী বই দিলে লোকে বুঝিবান ও বলবে। কিন্তু না, ভুলেও ওই ফ্যাশান প্যারেডে যেন কেউ সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' বা উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই' নিয়ে না যান। তবে হ্যাঁ, সত্যজিৎ রায়ের 'সেরা সত্যজিতের' মত দামী এবং স্বাস্থ্যবান বই বাংলায় হলেও দিতে পারেন কারণ সত্যজিৎ বিশ্ববিখ্যাত এবং এখনও বেশ টাট্‌কা।

বই কিনে কেউ ফতুর হয়েছেন এমন কথা কেউই শোনেনি, রেসের মাঠে বা অন্যভাবে টাকা উড়িয়ে সর্বশান্ত হওয়ার ঘটনা কিন্তু কম নেই। এই ব্যক্তব্য মুক্তবা আলীর। অথচ স্যার আশুতোষ পৃথিবীর অন্যতম বিবলিও ম্যানিয়াক ছিলেন যিনি মাসে তিন হাজার টাকার বই কিনতেন সারা পৃথিবী থেকে। মৃত্যুর সময় তাঁর কুড়ি হাজার টাকার বইয়ের অর্ডার ছিল। তাঁর বিচিত্র সংগ্রহ যে কোন ইচ্ছুক দর্শক জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে তার আংশিক ও দেখে আসতে পারেন।

কিন্তু বাংলা বইয়ের পাঠক বাড়াতে কি করণীয় তা আমি আপনি বললেই তো লোকে শুনবেন না। তবু আমাদেরই শুরু করতে হবে।

বুক ক্লাব আন্দোলনকে কি ভাবে সফল করা যেতে পারে? যদি শহরের এবং মফস্বলের কলেজে কলেজে এর উপকারিতা বোঝান যায় তার জন্যে কলেজ প্রধানদের অনুমতি নিয়ে তাদের সঙ্গে একটা ধারাবাহিক প্রচার চালান দরকার। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষা পাশ করা ছাড়াও যে বইয়ের ভূমিকা আছে তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারে ধারাবাহিক প্রচার। ফলে নতুন শিক্ষিত একটা পাঠক শ্রেণী তৈরী হবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার গড়ে তোলার মধ্যেই থাকে পড়াশোনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার অভ্যাস।

তা ছাড়া ঘরে ঘরে টি ভি এবং ভিডিও অনেক সময় নিয়েছে এবং পড়ার সময়ও অনেক কমে গেছে। অডিও ভিসুয়্যাল এই মাধ্যমকে একেবারে ছাড়বার উপায় নেই। বিশ্ব এখন ছোট হয়ে গেছে অনেক। [উন্নত দেশে, যেখানে টি ভি অনেকদিনের পুরোনো ব্যাপার হয়ে গেছে, সে সব দেশে বইয়ের বিক্রী কি কমেছে?] তাই বই বিক্রীর জন্যে T V-তে বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। T V-র বিজ্ঞাপনের খরচই বিশী। Book Sellers and Publishers Guild থেকে এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে কথা বলা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে যাতে বইয়ের বিজ্ঞাপনের খরচটা কম করা যায়। যদি না হয় তাহলে যৌথভাবে এই কাজ করা যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। রেডিয়োতেও বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে।

প্রতি বছর বইয়ের যে মেলা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে কলকাতায় এবং পশ্চিম বাংলার সর্বত্র সেখানে নিশ্চয়ই কিছু বই বিক্রী হয় ঠিকই কিন্তু নিয়মিত ধারাবাহিক ভাবে বইয়ের চাহিদা বাড়ানোর জন্যে বই মেলা একটা স্থায়ী কার্যকর ব্যবস্থা নয়। বই মেলায় নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকাশক এবং বিক্রেতাই হাজির থাকতে পারেন মাত্র।

পাঠকের রুচির বৈচিত্র্য বহুগুণ বেড়েছে, বেড়েছে বৈচিত্র্য কিন্তু ভালবাসা কি বেড়েছে বইয়ের প্রতি? মনে তো হয় না। আবার মুক্তবা আলীকেই স্মরণ করে তারই কথায় বলি, বইয়ের দাম বেশি বলে লোকে বই কেনে না আবার লোকে বই কেনে না বলে বইয়ের দামও কমান সম্ভব হয় না।

আসলে অন্যান্য কর্তব্য কর্মের কথা যা বলেছি তাছাড়া যা প্রাথমিক কাজ সেইটা আগে করি। সেটা হল বইকে ভালবাসি। সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার দিই বাংলা বই। একটু মিথ্যা মান মর্যাদা ত্যাগ করে এ কাজটা বোধ হয় আমাদের করতেই হবে।

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের চারদশক

পপি দত্ত

ভূমিকা : পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাদপদ জেলাগুলির মধ্যে বীরভূম হল অন্যতম। শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতি ও শিল্পে বিশেষ উন্নতি না ঘটায় জেলার সার্বিক বিকাশ অন্যান্য জেলাগুলির মত দ্রুত লয়ে ঘটেনি। শিক্ষার হার বেশী না থাকায় ও যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন উন্নতি না ঘটায় অন্যান্য আন্দোলন তেমন জোরদার হয় নি। এখানে যদিও সাঁওতাল বিদ্রোহের ঢেউ জেলার এক বৃহৎ অংশের জনগণকে সামিল করেছিল। এমন কি স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারও ওঠে প্রায় চল্লিশের দশকে। স্বাভাবিক কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিতীয় পর্যায়ে সারা বাংলাদেশে যে ব্যাপক গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে ওঠে তা এখানে খুব সীমিত ছিল। সিউড়ি শহরে 'জুবিলী গ্রন্থাগার' (১৮৯৯ খ্রীঃ) বর্তমানে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও 'রতন লাইব্রেরী'-র নাম উল্লেখযোগ্য। 'রতন লাইব্রেরী' একটি পারিবারিক গ্রন্থাগার (সিউড়ীর শিবরতন মিত্র মহাশয়ের) যার সংগৃহীত পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকের সংখ্যায় ও কৌলিন্যে সারা ভারতবর্ষে একটি বিশেষ স্থান ছিল। বর্তমানে গ্রন্থাগারটি অবলুপ্ত। সমস্ত সম্পদ বিশ্বভারতীকে প্রদান করেছেন মিত্র পরিবারের উত্তরাধিকারীগণ।

১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকাল :

স্বাধীনতাউত্তর ভারতবর্ষে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সারা ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং জনসাধারণকে গ্রন্থাগার পরিষেবার মধ্যে আনার জন্য সিন্‌হা কমিটির সুপারিশ অনুসারে রাজ্যে রাজ্যে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠল তারই মধ্যে অন্যতম হল জেলাস্তরে 'জেলা গ্রন্থাগার'। জেলা গ্রন্থাগার গুলি জেলাস্তরে 'জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ' হিসাবে জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করবে।

জেলা গ্রন্থাগারের অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি :

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের অনুমোদন পত্র প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই আসে। অনুমোদন পত্রটি তৎকালীন জেলাশাসক রঘু ব্যানার্জী মহাশয়ের নিকট ১৯৫৫খ্রীঃ-এর প্রথমদিকে আসে। এই সংবাদে জেলার সদর শহর সিউড়ীতে একটা আনন্দের জোয়ার উঠল। কারণ তাদের প্রাণপ্রিয় 'জুবিলী গ্রন্থাগার' জেলা গ্রন্থাগারে রূপায়িত হবে। সরকার এর জন্য দশজন কর্মী, গৃহ, আসবাবপত্রাদির জন্য বিশেষ অনুদান এবং মাসিক অনুদান দেবেন। এর ফলেবর আরও বৃদ্ধি হবে। এটি জেলার প্রধান গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করবে। স্বভাবতই সবাই উল্লসিত হলেন।

জুবিলি গ্রন্থাগার :

'জুবিলী গ্রন্থাগার' হেতমপুরের রাজার অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার শ্রীবৃদ্ধি বা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তেমন কোন স্থায়ী আয়ের সংস্থান না রাখার পরিচালন কর্তৃপক্ষ এর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তৎকালীন সিউড়ী শহরের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ প্রস্তাবটি সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং 'জুবিলী গ্রন্থাগার'কে জেলা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার জন্য বেশ কয়েকটি সভাও হল। কিন্তু বাদ সাধল সরকারী নির্দেশনামা। সরকারী নির্দেশনামায় বলা ছিল প্রতিষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

সমাজশিক্ষা দপ্তরের অনুমোদিত গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করবে। গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি সরকারী নিয়মানুসারে গঠিত করতে হবে। সভাপতি হবেন—জেলাশাসক স্বয়ং এবং সম্পাদক হিসাবে কাজ করবেন জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক। সমস্ত সম্পদ সরকারী সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে। সরকারের এই আদেশে বেঁকে বসলেন তৎকালীন জুবিলী গ্রন্থাগারের পরিচালনা কমিটির সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যরা। তাঁরা কোন রকমে গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব সরকারের হাতে দিতে নারাজ। জেলাশাসক যখন বহু প্রচেষ্টা চালিয়েও কর্তৃপক্ষকে সম্মত করতে ব্যর্থ হলেন তখন তিনি লীজ ক্লাবের সভাপতি হিসাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে লীজ ক্লাবের কাছ থেকে ছয় কাঠা জমি অধিগ্রহণ করেন এবং ৩০শে জুন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। জেলাশাসক মহাশয়ের ধারণা ছিল যদি কোনদিন 'জুবিলী গ্রন্থাগার এর কর্তৃপক্ষের মত পরিবর্তন হয় তাহলে দুটি গ্রন্থাগার একত্রিত হয়ে বৃহৎ গ্রন্থাগার হিসাবে পরিগণিত হবে এবং আরও উন্নতমানের পরিষেবা দিতে পারবে। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা এখনও পূরণ হয় নি, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত হতে পারে।

জেলা গ্রন্থাগার : প্রথম পর্ব

জুবিলী গ্রন্থাগারকে না পাওয়ায় জেলা গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু হয় এবং প্রাথমিকভাবে এর কাজ শুরু হয় বিদ্যালয় পরিদর্শক, বীরভূম এর দপ্তরে। ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসের পর এটি স্থানান্তরিত হয় ডাঙ্গাল পাড়ায়। গ্রন্থাগার ভবন তৈরী হওয়ার পর ১৫ই আগষ্ট ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বীরভূমের ডঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। জেলাশাসক মহাশয়ের দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা ছাড়া জেলা গ্রন্থাগার এত দ্রুত কাজ শুরু করতে পারত কিনা সন্দেহ।

প্রথম গ্রন্থাগারিক নিয়োগ :

প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগদান করেন লক্ষীন্দ্র চৌধুরী (মাঝিগ্রাম, বর্ধমান)। মাত্র কয়েকমাস (১৯. ৪. ৫৮—১৮. ৭. ৫৮) থাকার পর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গ্রন্থাগারিক পদে সুযোগ পেয়ে চলে যান।

দ্বিতীয় গ্রন্থাগারিকের যোগদান :

লক্ষীন্দ্র চৌধুরীর পরে দ্বিতীয় গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগদান করেন শ্রীনির্মলকুমার চৌধুরী (নবদ্বীপ, নদীয়া)। তিনি সর্বপ্রথমেই গ্রন্থাগারটিকে প্রানবন্ত করার উদ্যোগ নেন। তাঁর আগ্রহ, আন্তরিকতা, দক্ষতা, নৈপুন্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমে জেলা গ্রন্থাগার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২৯. ৭. ১৯৫৮ ৩০. ৮. ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ—মাত্র এই তিন বছরে জেলা গ্রন্থাগারের উন্নয়নের রূপরেখার প্রাথমিক কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি "পাঠাগার" নামে এক মাসিক পত্রিকা নিয়মিত জেলা গ্রন্থাগার থেকে প্রকাশ করেছিলেন। যার প্রভাবে সারা জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ, ভ্রাম্যমান শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন তাঁর এক অনন্য প্রচেষ্টা হিসাবে স্বীকৃত।

জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ও অন্যান্য তথ্য :

গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা :

জেলা গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২৫০০-এর মত গ্রন্থ ও কিছু পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল গল্প-উপন্যাস।

পরিষেবা :

গ্রন্থাগারে পরিষেবা বলতে ছিল মূলতঃ লেন্ডিং ও মোবাইল সার্ভিস।

গ্রন্থসূচী :

গ্রন্থসূচী পুস্তকাকৃতি (book form) ছিল।

বর্গীকরণ :

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসারে গ্রন্থের বর্গীকরণ করা হত।

নির্মলবাবুর আমলে পুস্তকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৭০০০। এই সময় সামান্য কিছু আকর গ্রন্থও (reference book) কেনা হয়।

কিন্তু নির্মল চৌধুরী এখানকার চাকুরী ছেড়ে টাকি জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করেন।

প্রধান সমস্যা : ক্রমাগত গ্রন্থাগারিক পরিবর্তন :

নির্মলবাবুর পরে গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগদান করেন অশোক মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), তাঁর কার্যকাল মাত্র নয় মাস (২৭. ১০. ৬১—২২. ৬. ৬২)। তারপর আসেন দিলীপ চৌধুরী (মাজিগ্রাম, বর্ধমান)। তাঁর কার্যকাল মাত্র একমাস (২৯. ৯. ৬২—১. ১১.৬২)। স্বভাবিক কারণে গ্রন্থাগারে তাঁদের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এরপর বাঁকুড়া জেলা হতে আসেন শ্রী আলি হোসেন। তাঁর কার্যকাল প্রায় সাড়ে ছয় বছর (৫. ২. ৬৩—১. ৮. ৬৯) তিনি গ্রন্থাগারকে সাজাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর আমলে গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা ছাপান, কিছু পাঠ্য-পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা সহ কিছু উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। আলি হোসেনের আমলে গ্রন্থাগারে ৪১২৮টি বাংলা ও ৫৩৪টি ইংরাজী অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে পুস্তকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,০০২টি ও সদস্য ৫৬৪ জন। এরপর গ্রন্থাগারিক রূপে আসেন শ্রী সনৎ প্রামাণিক (খয়রুন, বীরভূম), শ্রী প্রামাণিক প্রথমে খয়রুন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন, পরে লাভপুর কলেজে এবং সেখান হতে জেলা গ্রন্থাগারে যোগদান করেন। তাঁর কার্যকাল মাত্র এক বছর (2. 8. 69—20. 11.70)। এখানকার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীরূপে যোগদান করেন। এতক্ষণ গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বর্ণনা দিলাম।

গ্রন্থাগারের সমস্যাশঙ্কুল তৃতীয় দশক

জেলা গ্রন্থাগারের এই তৃতীয় দশকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় গ্রন্থাগারে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শ্রীমতী উমা গাঙ্গুলী এসময় গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করেন। সেই সময় বীরভূমে নকশাল আন্দোলন তুঙ্গে। চারিদিকে সন্ত্রস্তভাব। কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব। তাঁর কার্যকাল মাত্র চার বছর একমাস (২.৫.৭১ ৪-৬-৭৫)। এই চার বছরে নতুন গ্রন্থ যোগ হয় সর্বসাকুল্যে ২৬০৮টি, আর খোয়া যায় ৭৫০০টি গ্রন্থ। এ চিত্রেই তৎকালীন অবস্থা সহজে অনুমেয়। এর মধ্যে শ্রীমতী গাঙ্গুলী প্রথম সূচী পত্রক (Catalogue card) প্রবর্তণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তা বেশী দূর না এগোলেও তাঁর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। তিনি E. C. L এ চাকুরী পেয়ে চলে যান। পরবর্তীকালে আসেন সুশীল অধিকারী (হুগলী)। তাঁর কার্যকাল মাত্র দুই বছর (২৭.১২.৭৫-১-১-৭৮)। তিনি গ্রন্থাগারের উন্নয়নে তেমন কোন স্বাক্ষর রেখে যান নি।

ক্রমাগত গ্রন্থাগারিক পরিবর্তনের কারণ ও কুফল—

ক্রমাগত গ্রন্থাগারিক পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করে আমি যা বুঝতে পেরেছি তা হল—

(১) সূচনাকালে জেলা গ্রন্থাগারিক পদের বেতন ছিল সর্বসাকুল্যে মাত্র ২৫০ টাকা। এবং অন্য কোন ভাতাও ছিল না। তাছাড়া গ্রন্থাগারের অধঃস্তন কর্মীদের বেতন ছিল যৎসামান্য। সেইজন্য অনেকেই ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

(২) ভবিষ্যতের উন্নতির কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

(৩) বার্ষিক অনুদান বৃদ্ধি হয় নি (সূচনাকালে বার্ষিক অনুদানের বরাদ্দ মাত্র ৫০০০ টাকা ছিল। ১৯৭৭ পর্যন্ত এই অনুদান বহাল ছিল)।

(৪) কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নি। সূচনাকালে ১০ জন কর্মী এখনও তাই। কোন সহকারী গ্রন্থাগারিক পদ ছিল না, এখনও নেই।

(৫) প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনসন প্রভৃতি অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

কুফল—

(১) এত ঘন ঘন গ্রন্থাগারিক পরিবর্তনের সময় প্রধানতন কর্মী ভারপ্রাপ্ত থাকায় কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও কাজের মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পাঠকদের সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় না।

নতুন গ্রন্থাগারিকের নিয়োগ ও নতুন উদ্যমের শুরু—

এই সময় (২১. ২. ৭১) যোগদান করেন শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ রায় (বর্ধমান)। তিনি যখন যোগদান করেন তখন কর্মীরা নানাভাবে বিধ্বস্ত ও বিরত। একজন গ্রন্থাগার সহকারী বরখাস্ত, ও অন্যান্য সকল কর্মীরাই কোন না কোন ভাবে পরিচালন সমিতি কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত অথবা তিরস্কৃত। শ্রমমাণ বিভাগ বন্ধ। শুধু একটি লেন্ডিং বিভাগ চালু। পত্রক সূচী (Card Catalogue) নেই। এক হতশ্রী অবস্থা। তিনি সর্বপ্রথমে কর্মীদের মধ্যে মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন কর্মীদের পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে। পরিষেবার মান উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিভাগ গুলি তিনি প্রবর্তন করেন—যেমন শিশু বিভাগ, পাঠ্য-পুস্তক বিভাগ, পত্র-পত্রিকা বিভাগ ও পাঠকক্ষ, পাঠচক্র, রেফারেন্স বিভাগ এবং শ্রমমাণ বিভাগ পুনঃপ্রবর্তন করেন। কর্মীদের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার ফলে বিভাগ গুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হতে শুরু করে এবং গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বেড়ে যায়। সূচী পত্রক (Catalogue Card) চালু করার জন্য দিল্লীর 'এলিয়া লাইব্রেরী সার্ভিস' নামক সংস্থা হতে পত্রাধার (Card Cabinate) গুলি অনেক কম মূল্যে রেলওয়ে যোগে আনাবার ব্যবস্থা করেন। গ্রন্থাগারকে আরও আকর্ষণীয় ও সুসজ্জিত করে তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এইভাবে জনমানসে নতুন ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সক্ষম হওয়ায় এবং পরিষেবার মান উন্নত হওয়ার ফলে পাঠকের সংখ্যা ও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। গ্রন্থাগারে ব্যাপক মানুষের আগমণের পথকে প্রশস্ত করতে তিনি বাছাই পুস্তক ক্রয়ের উপর জোর যে দিয়েছিলেন তার প্রমাণ বর্তমান অমূল্য সম্ভার। পাঠ্য-পুস্তক ও রেফারেন্স বিভাগের সংগ্রহ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন কোর্সে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করতে পারেন কারণ তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক সংগ্রহে জোর দিয়েছেন। ১৯৮০ সাল হতে এইসব শিক্ষাণবিশীদের কাজে লাগিয়ে গ্রন্থাগারের প্রভূত উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। পত্রক সূচী চালু করার পশ্চাতে এই শিক্ষাণবিশদের অবদান অনস্বীকার্য।

সূচী পত্রক প্রবর্তন করতে গিয়ে তাঁকে যে সমস্যার পড়তে হয়েছিল তাহল পুরাতন (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বি বিন্দু বর্গীকরণ পদ্ধতি) পদ্ধতি বদল করে ডি ডি সি—১৬ সংস্করণ ও পরে ১৯ সংস্করণ অনুসারে বর্গীকরণ করা। আর একটি অন্যতম সমস্যা হল কর্মী সমস্যা। কর্মী সংখ্যা শুধু অল্পই নয়—শিক্ষিত কর্মীর সমস্যা প্রবল। বর্তমানে মোট কর্মী সংখ্যা দারোয়ান, নাইট গার্ড সহ ৮ জন। একজন আগামী মাসে অবসর নেবেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী মাত্র ৩ জন। বর্তমান গ্রন্থাগারিক এম. এ., এম. লিব. এস. সি., গ্রন্থাগার সহকারী দুইজন প্রি-ইউনিভারসিটি ও সার্টিফিকেট কোর্স পাশ। বাকী সব অষ্টম মান পর্যন্ত। এরা অধিকাংশই সেই সূচনাকাল হতে আছেন। পুরাতন যে পদ্ধতি অনুসারে গ্রন্থ সেলফে সাজান হোত সে সম্পর্কে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এখন ডি ডি সি

অনুসারে নম্বর দেওয়ার ফাঁয়া এখনও ভালোভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন নি। পাঠ্য-পুস্তক, রেফারেন্স ও শিশু বিভাগ মুক্ত দ্বার হওয়ায় ফলে পাঠকদের খুব সুবিধা হয়।

বিগত ১০ বছরের গ্রন্থাগারের অবস্থা—

বিগত ১০ বছরে গ্রন্থাগার পরিষেবার যে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে সেটা এই চিত্র থেকে বোঝা যাবে।

সদস্য সংখ্যা—

আজীবন :

বৎসর	বয়স্ক সদস্য সংখ্যা	শিশু সদস্য	মোট	প্রতিষ্ঠান গত সদস্য
১৯৭৭	৫০৭	২০	= ৫২৭	৬৮
১৯৭৯	৬১৫	৪০	= ৬৫৫	১৩৮
১৯৯০	৩২০০	৫৬৭	=৩৭৬৭	১২৮
		নবসাক্ষর সদস্য	৪৭	
			৩৮১৪	

পুস্তক সংখ্যা—

বৎসর	বাংলা	ইংরাজী	রামমোহন কাউন্ডেশন	মোট
১৯৭৭	১০,০৫৫	৩,১৪৫	৪,১০০	=১৭,৩০০
১৯৯৫	২৪,৯৩০	৭,৪০১	৬,৭৫০	=৩৯,১৮১

ব্যবহারকারীর সংখ্যা—

বৎসর	পাঠকক্ষ	লেন্ডিং	রেফারেন্স
১৯৭৭	১১০০	৮২০০	৩০০
১৯৯৫	২৬,০০০	৫১,২০০	৫,০০০

পুঁথি ও পুস্তক সংগ্রহ—

শ্রী রায়ের উদ্যোগে বহু পুঁথি সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার করা পুঁথি সযত্নে রাখা হয়েছে। তিনি বহু অমূল্য পুস্তকও সংগ্রহ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির সহযোগিতা পেয়েছেন। সারা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হতে বহু মানুষ নানা তথ্যের সন্ধানে প্রতিদিন আসছেন।

গ্রন্থাগারের দুঃষ্প্রাপ্য সংগ্রহ ও ভ্রাম্যমাণ বিভাগ—

গ্রন্থাগারের দুঃষ্প্রাপ্য সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল—

১। L. S. S. O' Mallcy/Birbhum Gazatteer (1910)

২। W. W. Hunter/Statistical Account of Bengal (1867)

এ ছাড়াও বীরভূম বিবরণী, বীরভূমের ইতিহাস (১ম ও ২য়) সহ প্রায় দুইশত অন্যান্য পুস্তক রয়েছে। ভ্রাম্যমাণ বিভাগ পুনরায় চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামীণ (rural), বেসরকারী (non-govt.) ও অন্যান্য গ্রন্থাগার গুলিতে এই সেবা প্রদান করা হয়। সদ্য সাক্ষর বা নব-সাক্ষরদের জন্যও এই গ্রন্থাগার বিশেষ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করে চলেছে।

উপসংহার—

এতদ্‌সত্ত্বেও বলব জেলা গ্রন্থাগার তার পরিষেবার আওতায় ব্যাপক মানুষকে এখনও আনতে পারে নি বহু মানুষ এর বাইরে রয়েছেন। অপরদিকে জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে শুধু সিউড়ী শহরের প্রতিনিধিত্ব থাকছে, সারা জেলার মানুষের প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করা দরকার। সহকারী গ্রন্থাগারিক পদ সহ কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি, উপযুক্ত বেতন ও পদোন্নতির সুযোগ এবং আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি (প্রতি পাঁচ বছর অন্তর) প্রতিষ্ঠানটিকে জেলায় যথার্থভাবে পরিষেবা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান হিসাবে নেতৃত্ব দিতে পারবে বলে বিশ্বাস।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ রায় এই প্রবন্ধটি লিখতে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবস্থা

কুণাল সিংহ

গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সর্বজন বিদিত। বিশেষ করে এখন যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পত্রপত্রিকা কেনার টাকা সংগ্রহ করতে পারছে না। নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে এখন পত্র-পত্রিকার তথ্যাদি অন্য সংস্থা থেকে সংগ্রহ করে আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবস্থা গড়ে তোলা তাই অত্যন্ত জরুরী।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তার একটি স্বশাসিত সংস্থা, 'ইনফরমেশন অ্যান্ড লাইব্রেরী নেটওয়ার্ক" (INFLIBNET) নামে প্রকল্পের সাহায্যে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণা-সংস্থাগুলিকে কম্পিউটারের মাধ্যমে সংযুক্ত করার কাজে নিযুক্ত আছে। ১৯৯১ সালের ১৫ই মে অধ্যাপক যশপালের সভাপতিত্বে এই সংস্থাটি স্থাপিত হয়। ডঃ প্রমোদকুমার এই সংস্থার ডিরেক্টর ও মিঃ অরোরা সদস্য সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৯২ সালের ৯ই জানুয়ারী কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টারকে (S. L. C.) উচ্চতর ক্রমমাত্রায় উন্নীতকরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ২০ লাখ টাকা মঞ্জুর করে। এই বরাদ্দের মধ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে একটি PC/AT—386 ও একটি প্রিন্টার কেনার জন্য অর্থ সংস্থান করা হয়। এই অর্থে ১৯৯৩ সালে একটি PC/AT—386 ও একটি প্রিন্টার কেনা হয়। এই সময়েই একটি টেলিফোন ও মডেমের সাহায্যে E—mail ব্যবস্থা চালু করা হয় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে E—mail ব্যবস্থা চালু আছে বলে আমাদের জানা নেই।

E—mail-এ ERNET-এর সাহায্যে আমরা দেশ-বিদেশে যে কোনো গ্রন্থাগার ও গবেষণাকেন্দ্রে—যেখানে E-mail ব্যবস্থা আছে—সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারি। E-mail-এর সাহায্যে পত্রপত্রিকার প্রয়োজনীয় লেখা আমরা প্রতি অংশ খরচে বিদেশ থেকে বা স্বদেশের অন্য কোনো গ্রন্থাগার থেকে কম্পিউটারের মধ্যে এনে তার কপি নিতে পারি। দূর-দূরান্তের গবেষণার কেন্দ্রের সঙ্গে এইভাবে যোগাযোগ করা ও পত্র-পত্রিকার লেখা পাঠানো বা আনানো সম্ভব।

১৯৯৫ সালে U. G. C.র অর্থ সাহায্যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আরও সাতটি কম্পিউটার কেনা হয় এবং ১৯৯৬ সালের ৯ই জানুয়ারী কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে Acquisition, Cataloguing, Reference, Circulation ও Periodicals বিভাগে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা হয়। প্রত্যেকটি বিভাগ এখন পরস্পরের সঙ্গে LAN-এর মাধ্যমে যুক্ত। এ ব্যতীত E-mail-এর মাধ্যমে আমেদাবাদে INFLIBNET-এর প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্যাদি আদান-প্রদান সম্ভব।

সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যাপক গৌতম ভট্টাচার্য, ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের ডঃ স্বপনকুমার দে এবং VSNL এর ম্যানেজার শ্রীবিবেক ভাবেচার সাহায্যে INTERNET-এর কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা আমরা পাচ্ছি।

ভবিষ্যতে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করার আয়োজন চলেছে। তখন কোনো বিভাগে বসে শিক্ষক ও গবেষকগণ দেশ-বিদেশের সঙ্গে কম্পিউটারে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সম্পাদক সমীপেষু,

মাননীয় মহাশয়, গত ১৪০৩ আষাঢ় সংখ্যার 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টি পাঠ করে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের যে রাজসূয় যজ্ঞ চলছে সে সম্বন্ধে সর্বশেষ তথ্যাদি অবগত হ'লাম। সম্পাদকীয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। এজন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। একজন তরুণ গ্রন্থাগারকর্মী হিসাবে আমার কিছু ব্যক্তিগত মতামত এ প্রসঙ্গে সংযোজন করতে চাই।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক ও কর্মীদের সম্বন্ধে যে বিস্ফোরক মন্তব্য সম্পাদকীয়টিতে করা হয়েছে তা পড়ে বিষম খেতে হলো। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক ও শিক্ষাকর্মী মহলের বৃহত্তর অংশকে প্রগতিশীল ও সমাজ সচেতন বলেই জনতাম এতদিন। 'গ্রন্থাগার' এর উপরোক্ত সংখ্যাটি খুব সম্ভবতঃ সংশ্লিষ্ট মহলে বা তাঁদের সংগঠনের নেতাদের কাছে পৌঁছবে না। পৌঁছলে তাঁদের প্রতিক্রিয়া কি হবে জানতে কৌতূহল হচ্ছে।

সম্পাদকীয়টির শেষের দিকে মন্তব্য করা হয়েছে, "কর্মীরা যদি নিরলস পরিশ্রম করে গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নতি না করতে পারেন তা হলে গ্রন্থাগার দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না। সেজন্য আজকের দিনে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার কর্মীর যৌথ উদ্যোগ বিশেষ প্রয়োজন…" ইত্যাদি। "যৌথ উদ্যোগ" শব্দটির উপর জোর দিতে চাই। মুক্ত অর্থনীতির সৌজন্যে শব্দটি আজ আমাদের চায়ের টেবিলে চলে এসেছে। খবরের কাগজ খুললেই দেখি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে যৌথ উদ্যোগ, দেশী সংস্থার সাথে বিদেশী সংস্থার যৌথ উদ্যোগ। এবার শুনছি গ্রন্থাগারিক—গ্রন্থাগারকর্মীর যৌথ উদ্যোগ। কিন্তু এ হেন 'যৌথ উদ্যোগে' অংশ গ্রহণ করার মত যথেষ্ট বিদ্যেবুদ্ধি গ্রন্থাগার কর্মীদের আছে কিনা তা যাচাই করা দরকার।

এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের হাঁড়ির খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন, বুদ্ধিকুশলী কর্মীদের সর্বনিম্ন পদে নিয়োগ যোগ্যতা (Recruitment qualification) হলো গ্রাজুয়েট ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে গ্রাজুয়েট ও বি. লিব. যোগ্যতা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় তাদের সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনে এই পদের জন্য বি. লিব. চেয়েছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ম্যানেজমেণ্ট ও ইনফর্মেশন টেকনোলজির সর্বশেষ জ্ঞানপ্রাপ্ত একজন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক তাঁর দৈনন্দিন কাজেকর্মে যে ভাষায় কথা বলবেন, যে শব্দ প্রয়োগ করবেন তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও সার্টিফিকেটধারী গ্রন্থাগার কর্মীটির ব্যবহৃত শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ হবে। গ্রন্থাগারিক কথায় কথায় Database, Standardisation, LAN, WAM, MARC, CCF, ROM, RAM, Mutlimedlia, Thesaurus, LCSH UDR Medium, DCZO, AACRZ, ISBD, Quality Control-ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করবেন। সার্টিফিকেটধারী কর্মীটির কাছে এগুলি কি ল্যাটিন, গ্রীকের মতো মনে হবে না? সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষক হিসাবে সেই কোর্সের সিলেবাসটি শিক্ষাদাতার জানা আছে। একটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে কোন স্তরের টেকনিক্যাল কাজ সেখানে করতে

হয় তাও পত্রদাতার জানা। যৌথ উদ্যোগের অন্যতম শর্ত হলো দুজনের মধ্যে সুচারু Communication. জ্ঞানের ও ভাষার এই দুস্তর ব্যবধানকে অতিক্রম করে তা কি আদৌ সম্ভব ?

আসলে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এ ধরনের যৌথ উদ্যোগের পরিকাঠামোটিই নেই। ১৯৮২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের জন্য গঠিত পে কমিটির নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দেওয়া স্মারকলিপিতে দেখতে পাই, "No modern scientific management procedure has been adopted for administration of University Libraries". বাস্তবে এটিই সত্য। অর্থ সংকটের কারণে শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ হয় না। নানা কারণে আধিকারিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি শূন্য পড়ে থাকে বছরের পর বছর। কর্মীদের জ্ঞান নবীকরণের জন্য নেই কোনো রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা। উচ্চতর পেশাগত যোগ্যতার জন্য নেই আর্থিক সুবিধা-দানের বিষয়টি। যদিও, দৈনন্দিন কাজেকর্মে স্নাতকোত্তর জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হয়। তাঁদের বেতন ক্রমটিও তথৈবচ। পত্রদাতার কাছে তথ্য আছে, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মরত এজন গ্রাজুয়েট+বি. লিব যোগ্যতার কর্মীর বেতন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধীন সংস্থায় কর্মরত সমযোগ্যতার কর্মীর চেয়ে অনেক কম। এব্যাপারে 'গ্রন্থাগার' এর পরবর্তী কোনো সংখ্যায় বিশদে আলোচনা করা যাবে।

এই সামগ্রিক অব্যবস্থার মধ্যেও "আছেন দুই একজন বিবেকবান" প্রশাসক "যাঁরা এরকম অবস্থাতেও চেষ্টা করে যাচ্ছেন।" সব রকমের 'উচ্চাঙ্গ' ও 'নিম্নাঙ্গ'কে সামলে চেষ্টা করে যাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দিতে। এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যেন শুনতে পাচ্ছি কর্মীবাহিনীর প্রতি তাঁদের উদাত্ত আহ্বান, "হে গ্রন্থাগার কর্মী বন্ধুগণ। আর আমাদের সময় নষ্ট করার সময় নেই। এখন আমাদের পরিষেবাকে নিয়ে যেতে হবে আই. আই টি, টি, আই, এফ আর, ডেসিডক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে। এর জন্য আপনাদের নিরলস পরিশ্রম করতে হবে। আপনার পেশাগত জ্ঞানের সর্বোচ্চ মানকে কাজে লাগিয়ে পরিষেবাকে গুণগত ও পরিমানগত ভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। আসুন, আমরা 'যৌথ উদ্যোগে' অংশ গ্রহণ করি।"

হায় সম্পাদক মহাশয়, দুঃখের ব্যাপার কি জানেন ? এই "বিবেকবান" প্রশাসকরা যখন গ্রন্থাগার কর্মীদের ব্যাপারে নীতিনির্ধারকের ভূমিকা পালন করেন, তখন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কেমন অন্যরকম হয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁদের চিন্তাভাবনা যেন এরকম : "ওহে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারকর্মী। যে নিম্নপর্যায়ের (lower level) কাজ তোমরা করো, তার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সর্বনিম্ন কোর্স সার্টিফিকেটের জ্ঞান বহুক্ষেত্রেই চেয়ে বেশী, তাই গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির নিম্নপর্যায়ের বেতনটিই তোমাদের প্রাপ্য।" বিবেকের কী বিপরীতমুখী পরিবর্তন। পরিষেবা দাও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বেতন নাও সর্বনিম্ন পর্যায়ের—এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কীই বা হতে পারে ? বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি এই বঞ্চনার শেষ হবে কবে ? সহৃদয় পাঠক হয়তো ভাবছেন, পত্রদাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আধুনিকীকরনের প্রশ্নে কেবল কর্মীদের বেতনের ব্যাপারটিকে নিছক বড়ো করে দেখছেন। না পাঠক, ভুল বুঝবেন না। যোগ্যতা ও বেতনক্রম একটি পেশার মর্যাদার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। "Profession alism can not be isolated from money" —সাম্প্রতিক একটি বহুচর্চায় একথা বলতে শুনেছি আমাদের কালের অন্যতম তথ্যবিজ্ঞানী গণেশ ভট্টাচার্যকে। এটিকে যাঁরা অস্বীকার করতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন, "এ আত্ম প্রবঞ্চনা কতকাল চলবে ?"

সম্পাদকের কাছে একটি নিবেদন আছে।- গ্রন্থাগার এর আগামী কোনো সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সংক্রান্ত একটি সম্পাদকীয় দেখতে পাবো আশা করি। পরিশেষে এই দীর্ঘ পত্রটি প্রকাশের জন্য সম্পাদককে অজস্র ধন্যবাদ।

তরুণ কুমার মন্ডল
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদকের বক্তব্য

তরুণ গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীতরুণকুমার মণ্ডলের চিঠিটি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কারণ শ্রীমণ্ডল "সম্পাদকীয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে এজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ" জানিয়ে তার পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে যে বিদ্রূপ ও বক্রোক্তি করেছেন তা লক্ষ করেছি। সম্পাদকীয় যেহেতু পরিষদের বক্তব্য বহন করে এজন্য এর উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীমণ্ডল বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র, গবেষক ও কর্মীদের সম্পর্কে 'বিস্ফোরক' মন্তব্য পড়ে বিষম খেয়েছেন জেনে আশ্চর্যান্বিত হলাম এই কারণে যে মনে হচ্ছে শ্রীমণ্ডল যেন আমেরিকা বা ইংলণ্ড থেকে কলকাতার মাটিতে হঠাৎ অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এই ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ড দেখে 'বিষম' খেয়েছেন। সমগ্র দেশে শিক্ষাক্ষেত্রেরই অব্যবস্থা বা শিক্ষা ব্যবস্থার ভেঙ্গে পড়ার বিষয় দীর্ঘ আলোচিত হয়েছে ভবতোষ দত্ত কমিশনের, অশোক মিত্র কমিশনের রিপোর্টে, University News এ প্রকাশিত বিভিন্ন এ্যাকাডেমিশিয়ানদের Convocation Address গুলিতে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন এবং গ্রন্থাগার কেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্গাতা। উপরিউল্লিখিত report ইত্যাদি শ্রীমণ্ডল যে গ্রন্থাগারে কাজ করেন বোধ হয় সেখানে আছে, একটু সময় নিয়ে পড়লে 'বিষম' খেতেন না বলেই সম্পাদকের ধারণা।

শ্রীমণ্ডলের 'কৌতূহল' সম্পর্কে জানাই গ্রন্থাগার পত্রিকাটি গ্রন্থাগার আন্দোলনের পত্রিকা। পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের দায়িত্ব পরিষদের, এটা কোন গোপন সংগঠনের গোপন নিউজলেটার নয়। সংশ্লিষ্ট আন্দোলন গুলির অনেকেই হয়ত গ্রন্থাগার প্রাপকের তালিকায় আছেন। তবু যদি শ্রীমণ্ডল কোন বিশেষ মহলে পৌঁছে দিতে চান, তবে সম্পাদক সহায়তা করতে প্রস্তুত।

যৌথ উদ্যোগ বিষয়টি শ্রীমণ্ডলের একটা মজার জিনিষ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু শিল্পে যৌথ উদ্যোগ আর গ্রন্থাগারে প্রশাসক ও কর্মীর যৌথ উদ্যোগ যে এক জিনিষ নয় এটাও যদি শ্রীমণ্ডলের মত উচ্চশিক্ষিত, সমাজ সচেতন ব্যক্তিকে বোঝাতে হয় তবে তো মুস্কিল। শিল্পে মুনাফা আবশ্যিক শর্ত; গ্রন্থাগারে তো নয়। গ্রন্থাগার কোন production centre নয়।

শ্রীমণ্ডলের মত অন্য গ্রন্থাগার কর্মীরা "যথেষ্ট বিদ্যা বুদ্ধি" না থাকলেও, গ্রন্থাগারের সকল স্তরের কর্মীরা এক সাথে অর্থাৎ যৌথ ভাবে কাজ করে থাকেন আর না করলে গ্রন্থাগার যে খাঁড়িয়ে চলে বা চলেনা তার নজিরের তো অভাব নেই। শ্রীমণ্ডল কি বলতে চান যে দায়িত্ব পালনে গ্রন্থাগারের কর্মীরা উদ্যোগ নেবেন না? বা গ্রন্থাগার উন্নয়নে উদ্যোগ নেবেন না? শ্রীমণ্ডলের অবগতির জন্য 'যাচাইয়ের প্রয়োজন নয়' শব্দ জানানো প্রয়োজন যে ষাটের দশকে তাঁর কর্মস্থলে বহু বড় বড় কাজ প্রশাসন ও কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে ও উদ্যমের ফলেই সুসম্পন্ন হয়েছে। সে দিনের উদ্যোগ গুলিতে বৃত্তি কুশলীরাও ছিলেন আবার স্বল্পশিক্ষিত কর্মীরাও ছিলেন। আজ যে তা নেই শ্রীমণ্ডলের পরই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে আরও একটু বলতে চাই যে তাঁর গ্রন্থাগারের পাঠকুল শ্রীবাণেশ্বর মাইতি, শ্রীভূষর মাইতি প্রমাত অশিক্ষিত সে প্রমুখ অ-বৃত্তি-কুশলী কর্মীদের কাছ থেকে যে সহানুভূতিশীল, তৎপর পরিষেবা পেতেন আজকে উচ্চতর বা উচ্চতম শিক্ষাসম্পন্ন বৃত্তিকুশলীদের কাছ থেকে সেই আন্তরিকতা পান কি?

শ্রীমণ্ডলের মতে একজন 'সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক যে তরঙ্গ দৈর্ঘে কথা বলবেন বা কাজ করবেন, একজন সার্টিফিকেট ধারী তার পরিমাপ করতে পারবেন না এবং এর ফলে Communication

Gap হবে।'

পরিষদের Certificate Course-এ Computerised Library Management, Computer Aided Library Syatem সম্পর্কিত বিষয় সমূহ পড়ানো হয় না, কিন্তু আজ যুগের প্রয়োজনে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন ব্যয়ভার থেকে (পরিষদ থেকেও) Computer Course করে নিচ্ছেন। আর Certificate Course এ UDC শেখানো হয় না। তিনি যে গ্রন্থাগারে কাজ করেন, সেই গ্রন্থাগারের Cataloguer রা প্রায় সবাই UDC-তে 'অজ্ঞ' হয়েও সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গেই কাজটি করে গেছেন গ্রন্থাগারটির সংগঠনের দিনগুলিতে। গ্রন্থাগারের সুচীটি আজও তার প্রচুর সাক্ষ্য বহন করে। তাছাড়াও শ্রীমন্ডল যেমন তাঁর কর্মস্থলে এসে Computer training নিয়েছেন অন্যদের ক্ষেত্রেও তার কোন বাধা আছে বলে জানা নেই। শ্রীমন্ডলের কাজে যোগ দেওয়ার আগে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে (বা বোধ উদ্যোগে) সকল গ্রন্থাগার কর্মীকেই (Professioual Staff) Computer সম্ক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষণে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছেন। শ্রীমন্ডল ও তাঁর কিছু সহকর্মী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কর্মসূচী অনুযায়ী তথ্য প্রযুক্তির ট্রেনিং নিয়েছেন। সুতরাং রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা নেই বক্তব্যের সারবত্তা কোথায়? এই সমস্ত কর্মীরা নতুন জ্ঞান আহরণ করে কাজে লাগানোর কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিচ্ছেন তা জানার আগ্রহ রয়েছে। এ ছাড়া সদ্য নিযুক্ত উচ্চশিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে প্রশাসনের dialog কি একই তরঙ্গ দৈর্ঘে প্রবাহিত হচ্ছে?

শ্রীমন্ডলের কর্মস্থলে কর্মরত অবস্থায় কেউ উচ্চশিক্ষা লাভ করলে তা বৃত্তিগত শিক্ষাই হোক বা সাধারণ শিক্ষাই হোক, অন্তত ১টি অতিরিক্ত increament পাওয়া যায়। কাজেই একেবারেই সুযোগ নেই বলাটা বোধহয় সত্যের অপলাপ করা হয়।

এটা ঠিকই উচ্চতর তাত্বিক জ্ঞান থাকলে আত্মবিশ্বাসটাও বেশী থাকে; কিন্তু সর্বোচ্চ ডিগ্রী না থাকলে, যে ডিগ্রী শ্রীমন্ডলের অনেকেরই নেই, তাঁরা ভুল কাজ করেছেন এটাও সম্পাদকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে বা অন্য গ্রন্থাগারগুলির এমন কি কাজ আছে যা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রী না থাকলে করা যায় না? গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ ডিগ্রী আবশ্যিক কিন্তু গ্রন্থাগারগুলিতে সমস্ত পেশাগত পদেও কি সেই জ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে?

১৯৮৭ সালে পরিষদের স্মারকলিপিতে যা বলা হয়েছে তা কি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? অন্য সব ধরনের গ্রন্থাগারে কি Modern Scientific Management চলছে? অভিজ্ঞতা তা বলে না। সারা দেশের বেশীর ভাগ Library System অগোছালো তা যে ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই হোক, এর সঙ্গে অবশ্যই ব্যতিক্রমী কিছু সংগঠনের গ্রন্থাগার আছে যাদের Modern Scentific Management এর ভেতর ফেলা যায়।

"বিবেকবান" অভিধাটি শ্রীমন্ডলের পছন্দ হয়নি কারণ দেখতে পাচ্ছি বেশ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতেই তিনি শব্দটি একাধিকবার " " চিহ্নের ভেতর ব্যবহার করেছেন, সেই "বিবেকবান" ব্যক্তিদের আহ্বান তৈরী করেছেন নিজেই। যদি কেউ কোন আহ্বান জানান, তবে তাকে তো উন্নত ব্যবস্থা যা আছে তারই উল্লেখ করতে হয় বলে জেনে এসেছি, আমরা না হয় ভেবে দেখবো সেই সব অবিবেচক "বিবেকবান" উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এর বিপরীত পরামর্শ দেওয়া যায় কিনা।

শ্রীমন্ডলের অবগতির জন্য তাঁরই গ্রন্থাগারের ইতিহাস কিছুটা নিবেদন করছি। শ্রীমন্ডলের ২জন শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে দেখেছি (তাঁরা তখন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কাজ করতেন) দিনের পর দিন নোংরা ঘেটে, প্রায় আলো বাতাস শূন্য ঘরে হাসিমুখে কাজ করছেন। তাঁদের বেতনক্রম তখনকার নিরিখেও ছিল অত্যন্ত কম। এই

নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করতেন, কিন্তু তাঁদের তৎকালীন শিক্ষক-প্রশাসককে বিব্রত করতেন না।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অসাম্য বা বন্টনের তারতম্য-হীনতা থাকে, সেটা কতটা কমান যায় তা নির্ভর করে বৃহত্তর আন্দোলনের উপর। কেউ তা যে পদেরই হোন, তিনি যদি কোন উচ্চপদ লাভ করেন বা উচ্চতর বেতনক্রম লাভ করেন তার খবর পেলে সম্পাদক ব্যক্তিগত ভাবে অত্যন্ত আনন্দিত হন, পরিষদের অন্য নেতৃবৃন্দ ও একই ভাবে ভাবিত হন এটাই দেখে এসেছি। এখানে পরশ্রীকাতরতা প্রশ্রয় পায় না, এখানে হতাশারও জায়গা নেই, কারণ এগিয়ে চলার চেষ্টাই আমাদের ব্রত।

শ্রীমণ্ডল অল্প কিছুদিন চাকুরী (২/০ বৎসর) করেই যতটা অসন্তুষ্ট, তাতে মনে হয় এদেশের জল হাওয়াও তাঁর অপছন্দের কারণ এখানে চাইলেই পছন্দমত বেতনক্রম, পদমর্যাদা ইত্যাদি পাওয়া যায়না, বহু চেষ্টার পর হয়ত কিছুটা এগোনো যায় মাত্র।

আন্দোলনের স্বার্থে তাঁর অভিমত অবশ্যই যথাসময়ে আলোচিত হবে, কারণ রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের জন্য একটি পে-কমিটি গঠন করেছেন। পরিষদ সেখানে স্মারকলিপি পেশ করবে। সেই স্মারকলিপি প্রস্তুত করার সময় শ্রীমণ্ডলের যদি কোন নির্দিষ্ট সুপারিশ থাকে ও তিনি পরিষদকে জানান, সেগুলি অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হবে। সেই সঙ্গে সবিনয়ে স্মরণ করাতে চাই যে প্রত্যেক কর্মীকেই তাঁর গ্রন্থাগারে সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার জন্য আন্দোলন করতে হয়, প্রত্যেক গ্রন্থাগারকেই তার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লড়াই করতে হয় অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য। এই লড়াইতে গ্রন্থাগার প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চ ডিগ্রী কোন কাজে আসবেনা—কারণ বহু গ্রন্থাগার বিজ্ঞান স্কুল অবলুপ্ত হচ্ছে, বহু গ্রন্থাগারের বাজেট কমছে, বহু গ্রন্থাগারে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ হচ্ছে না ফলে বহু গ্রন্থাগার আজ অস্তিত্বের সংকটের সামনে এসে পড়েছে। এই কথা মনে রেখেই সম্পাদকীয়তে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মীর বৌথ উদ্যোগের 'ডাক' আহ্বান জানানো হয়েছে। সেই আহ্বানে শ্রীমণ্ডল সাড়া দেবেন কিনা সেটা শ্রীমণ্ডলের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সম্পাদকের মনে হয়েছে গ্রন্থাগারে হতাশার জায়গা কম। প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতা আছেই, এই প্রতিযোগিতার অঙ্গনে গ্রন্থাগারকে তুলে ধরার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের একার নয়—বৃত্তিকুশলী সকলের। বৃত্তিকুশলীদের মূল দায়িত্ব উন্নত মানের পরিষেবা দেওয়া। উন্নত মানের পরিষেবা দিলেই তবে গ্রন্থাগারিকের সামাজিক স্বীকৃতি আসবে—উন্নত বেতন ক্রমের মাধ্যমে।

কোন বিষয়ের উপর কখন সম্পাদকীয় লেখা উচিত সেই স্বাধীনতাটুকু নিশ্চয়ই সম্পাদকেরই একান্ত।

পরিশেষে তরুণবাবুকে তাঁর পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

[বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কতিপয় ভুয়া শিক্ষাকেন্দ্র, যারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ডিগ্রি দিচ্ছিলেন, তাদের এই জালিয়াতির বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে সেই সকল শিক্ষাকেন্দ্রের নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন। ইউ, জি, সির উক্ত তালিকাটি আমরা মুদ্রিত করলাম। সম্পাদক]

University Grants Commission vide its letter D. O. No. F. 7-4/95 (CPP—1) dated 20. 6. 96 informs some institutions are suffixing the words "University"/"Vishwavidyalaya"/"Vishwavidyapith"/"Vidyapith ' to their names and are advertising that they are empowered to award degrees to the students enrolled with those Institutions, though they are not at all Universities. In order to check the fraud, UGC cautioned and sent a list of fake Universities as follows :—

LIST OF FAKE UNIVERSITIES AS ON MARCH, 1996

1. Maithili University/Vishwavidyalaya, Darbhanga, Bihar.
2. Mahila Gram Vidyapith/Vishwavidyalaya, (Women's University) Prayag, Allahabad (U. P.)
3. Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Gagatpuri, Delhi.
4. Commercial University Ltd., Darya Ganj, Delhi.
5. Indian Education Council of U. P., Lucknow (U. P.)
6. Gandhi Hindi Vidyapith, Prayag, Allahabad (U. P.)
7. National University of Electro Complex Homeopathy, Kanpur.
8. Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University) Achaltal, Aligarh (U. P.)
9. Shrimati Mahadevi Verma Open University, Mughal Sarai, (U. P.)
10. D. D. B. Sanskrit University, Putur, Trichi, Tamil Nadu.
11. Bharatiya Siksha Parishad (U. P.) Open Vishwavidyalaya, Lucknow (U. P.)
12. Arya University, Srinagar (J&K)
13. St. John's University, Kishanattam, Kerala.
14. National University, Nagpur.
15. United Nations University, Delhi.
16. Vocational University, Delhi.
17. Uttar Pradesh Vishwavidyalaya, Kosi Kalan, Mathura (U. P.)
18. Maharana Pratap Shiksha Niketan Vishwavidyalaya, Pratapgarh (U. P.)
19. Raja Arabic University, Nagpur.
20. Urdu University, Motia Park, Bhopal.

———

প্রতিটি গ্রন্থাগারে অপরিহার্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশিত পুস্তক

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪) ৩৫·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) (১৯১৫-১৯৩০) ২০০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ ৪০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা ২৫·০০
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোন ২৫·০০
- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫·০০
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodology ১২৫·০০

Annual Subscription : Rs. 48·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 4·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

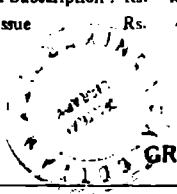

GRANTHAGAR

Volume 46 : No. 5 August-September 1996

CONTENTS

	PAGE
Editorial : Librarian's Day	1
A. F. M. Badiur Rahaman	
Library System of Bangladesh : A Situational Report	3
Kazalkumar Ghosh	
Readers of Bengali Books and Consumer items	9
Popy Datta	
Four Decades of Birbhum District Library	11
Kunal Sinha	
Computer System in Kalyani University Library	17
Letters to the Editor	18
Editors Comments	20
A Notification of U. G. C.	23

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 244-6866 at Impression Syndicate. 26/2A. Tarak Chatterjee Lane. Calcutta-700 005.
Editor : Arun Ray, Associate Editor : Nirmalya Ray

ISSN 0017-334X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৮ সম্পাদক : অরুণ রায় সহযোগী সম্পাদক : নিরাজ্য রায় আগ্রহায়ণ, ১৪০৬

সূচী

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১—৩
সুধাংশুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
তথ্য পরিষেবার মূল্যায়নে গ্রন্থাগারের সম্পদের ব্যবহারযোগ্যতা	৪—১০
পদ্মি সেন	
সাধারণ গ্রন্থাগার ও কর্মচর্চা	১৫—১৯
Dr. Ratna Banerjee	
English Abstracts	২০—২২
[illegible]	

গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৮, সম্পাদক : অরুণ রায় / সহযোগী সম্পাদক : নির্মাল্য রায়। অগ্রহায়ণ, ১৪০৩

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়টি পুরাতন। এ নিয়ে এ পর্যন্ত আমাদের পত্র-পত্রিকায় বহু লেখালেখি হয়েছে। তবে বিষয়টি পুরানো বলে সে সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়ে গেছে বা এ সম্বন্ধে আর কিছু বলার নেই বা ভাবার নেই এটা বলা চলে না। মনে হয় বর্তমানে গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের অর্থাৎ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত জনসাধারণের মনে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই ভ্রান্ত ধারণা এখনই দূর না করতে পারলে ভবিষ্যতে গ্রন্থাগার আন্দোলন তথা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে সমূহ ক্ষতি হবে এটা বলা বাহুল্য।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলতে আমরা কি বুঝি? লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শব্দ দুটির অর্থ প্রায় একই : লক্ষ্য বলতে সাধারণত নিশানা, চিহ্ন, আদর্শ, উদ্দেশ্য দ্রষ্টব্য বোঝায় আর উদ্দেশ্য হল অভিপ্রায়, তাৎপর্য, লক্ষ্য ইত্যাদি। খুব একটা পার্থক্য না থাকলেও এই দুটি শব্দ একত্রে ব্যবহার করা হয় ইংরেজী aims and objects বোঝাতে।

এখন গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলার আগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক বিন্যাস এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা বলা যাক। লক্ষ্য করলে আমরা দেখব দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার যেমন, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিশেষ ও বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগার, গবেষণা গ্রন্থাগার, শিশু গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার ইত্যাদি। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে এর কোন একটি বা একাধিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে সামগ্রিক ভাবে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বা গ্রন্থাগার আন্দোলন ব্যাহত হয়। তেমনি রয়েছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপাদানসমূহ যেমন, পুস্তক ও অন্যান্য তথ্য উৎস, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, এর সঙ্গে গ্রন্থাগার প্রকরণ পরিচালন, পুস্তক ও অন্যান্য তথ্য উৎসাদি নির্বাচন; বর্গীকরণ, সূচীকরণ, পরিষেবা, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ প্রভৃতি। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে গ্রন্থাগার ও পরিবেশের, গ্রন্থাগার ও তথ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতির, গ্রন্থাগার আইনের, গ্রন্থ উপকরণ উৎপাদন ও প্রকাশনার, গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থার। এছাড়া সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও ইত্যাদি বিষয়গুলি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। এ সবই আবার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কত ব্যাপক।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে স্বাধীনতার পূর্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অগ্রন্থাগারিকেরা। স্বাধীনতা লাভের পরে এই নেতৃত্ব দিচ্ছেন গ্রন্থাগার কর্মীরা। এঁদের দুটি সত্তা; এরা যেমন কর্মক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সেবা করেন তেমনি কর্মীদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে আন্দোলন করেন। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এর ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলনে কিছু জটিলতারও সৃষ্টি হয়েছে। সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংস্থা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেও এ জটিলতার ফলে কখনও কখনও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আমাদের উচিত এ বিভ্রান্তি যথাসাধ্য দূর করার চেষ্টা করা। গ্রন্থাগার সম্মেলনের কথাই ধরা যাক। গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য প্রবন্ধাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই সব সম্মেলনে শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাবলী, তাঁদের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত সমস্যাই আলোচিত হয় নাই, গ্রন্থাগার কর্মীদের আচরণ বিধি, শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের পরিষেবা, শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের সমস্যা শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা, নিঃশুল্কতা দূরীকরণে সাধারণ গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগারের মান, প্রয়োজন ভিত্তিক নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা. শিশু গ্রন্থাগার, অল্প শিক্ষিত বয়স্কদের যোগ্য বই, গ্রন্থাগারে পত্র-পত্রিকার স্থান ও তার পরিসংখ্যান প্রভৃতিঃ—গ্রন্থাগার সহযোগিতা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুঁথিপত্রের সংরক্ষণ, সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, পাশ্চমবঙ্গের বর্তমান সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়ন, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সমস্যা, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা, অবারিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, পশ্চিমবাংলায় গ্রন্থ উৎপাদনের মান, সুচীকরণে বাংলা নাম, বিশ্বা শিরোনাম, কেরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার ইত্যাদি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বহু বিষয়েই আলোচনা হয়।

গ্রন্থাগার সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও গ্রন্থাগারের সমস্যাবলী জনচিত্তে জাগ্রত করা ও জনসাধারণকে গ্রন্থাগার মুখী করা। গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে কেউ যদি মনে করেন গ্রন্থাগার আন্দোলন হল কেবলমাত্র গ্রন্থাগার আন্দোলনে কর্মীদের জীবন ও জীবিকার আন্দোলন তবে তাঁরা ভ্রান্ত। তবে এই হিসেবে তাঁরা সঠিক যে, গ্রন্থাগার আন্দোলন তথা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উজ্জীবন হলে তাঁরাও উপকৃত হবেন। আসলে গ্রন্থাগার আন্দোলন একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এটি একটি শিক্ষা আন্দোলনও বটে। এই রাজ্যে সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংস্থা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও তেমনি একটি সামাজিক ভূমিকা আছে। সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি বা ১৩০১ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতই ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও একটি প্রতিষ্ঠিত বিষৎ পরিষৎ।

পরিষদের সদস্যদের তথা গ্রন্থাগার কর্মীদের মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মী। পরিষদের কেন্দ্রীয় সংস্থা ও তার শাখা সংস্থাগুলি শক্তিশালী হলে গ্রন্থাগার আন্দোলন শক্তিশালী হবে। এজন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের উচিত নিজের পরিষদের সদস্য হওয়া ও অপরকে সদস্য করা। কর্মস্থলে যথাসাধ্য নিজের প্রতিষ্ঠানের সেবা করা ও আচরণ বিধি মেনে চলা। যদিও নির্দিষ্ট কোন আচরণ বিধি এ পর্যন্ত তাঁদের কাছে পাঠানো হয়েছে কিনা জানা নেই। তবু প্রতিষ্ঠানের ভালোর জন্য সাধারণ বুদ্ধি থেকে যে আচরণ বিধি মানা উচিত তা বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। এ সম্বন্ধে সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে এবং সম্মলনের কয়েকটি প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হবার পর গ্রন্থাগার আন্দোলনের আর প্রয়োজন আছে কিনা অথবা গ্রন্থাগার সম্মেলনে আমরা এতকাল যেসব কথা বলে এসেছি তার প্রয়োজন আছে কিনা এসম্পর্কে কারো কারো মনে সংশয় দেখা দিতে পারে। কিন্তু এসব সংশয় অমূলক। গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হলেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে এখনও সিদ্ধ হয়নি একথা বলা বাহুল্য। এইরূপ গ্রন্থাগার আইন কি আমরা চেয়েছি? আর গ্রন্থাগার আইনে যতটুকু সুবিধে দেওয়া হয়েছে তার কতটুকু আমরা বর্তমানে পাচ্ছি। এটা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার যে, গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার কতটুকু সুযোগ ব্যবহার করা হয়েছে।

নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা তো আমরা সম্মেলনে, জনসভায় কতবারই না বলেছি। কিন্তু এখন আর নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা উচ্চারিত হয় না। হয়তো সীমিত আর্থিক বরাদ্দের মধ্যে এ ধরণের নিঃশুল্ক ব্যবস্থা করার কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু তার জন্য জনকল্যাণের আদর্শ বিসর্জন দেওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, সাধারণ গ্রন্থাগার গুলির সংখ্যা কেবল না বাড়িয়ে এ গুলির গুণ গত পরিবর্তন করা হোক। পরিষেবার দিক দিয়ে এ গুলি আদর্শ হোক। যে গ্রন্থাগারে পাঠক আসে না সে গুলি তো বোঝা স্বরূপ। যেখানে সাধারণ গ্রন্থাগার নেই গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়াবার সময় সেই জায়গাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারের জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে সেটা বলা বোধ হয় আমাদের দায়িত্ব নয়। তবে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার যাঁরা করেছেন তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যেতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয়, দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীকে কিন্তু নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। এ রাজ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও মেট্রোপলিটান লাইব্রেরীতে নিঃশুল্ক ব্যবস্থা রয়েছে। ঐরূপ জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে যদি অন্ততঃ নিঃশুল্ক করা হয় তবে গ্রামীণ জনসাধারণ উপকৃত হবেন।

তথ্য পরিষেবার মূল্যায়নে গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবস্থাপনা

মাধবচন্দ্র চ্যাটার্জী
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

● ভূমিকা :

গুণগত ও পরিমাণগত বিচারে পর্যাপ্ত গ্রন্থাগার সম্পদ আছে। এই অবস্থায় সন্তোষজনক তথ্য পরিষেবা গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া যাচ্ছে কিনা কিংবা কতটুকু পাওয়া যাচ্ছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগার থেকে দেয় তথ্য পরিষেবা এবং গ্রন্থাগারের সম্পদ সংগ্রহকে পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষাপটে তথ্য পরিষেবার মূল্যায়ন সঠিক ও প্রাসঙ্গিক হবে। গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবস্থাপনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল কিভাবে সীমিত গ্রন্থাগার সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ঘটিয়ে সর্বাধিক তথ্য পরিষেবা পাওয়া যেতে পারে। শুধু গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী কেন, গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও বিশ্লেষণী আলোচনার সাহায্যে তথ্য পরিষেবার সার্মগ্রিক চিত্রটি স্পষ্ট হতে পারে। গ্রন্থাগার তো শুধু পুস্তক সাজিয়ে রাখা এবং পুস্তক ইস্যু-রিটার্ন করার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে প্রতিটি গ্রন্থাগারের ভূমিকা তো অনেক বেশি ব্যাপক, জটিল ও সূক্ষ্ম। শুধুমাত্র পুস্তক নয়, অন্যান্য ডকুমেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করে এনে সেই তথ্য ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব আজকের দিনে গ্রন্থাগারের উপর বর্তায়। এই পরিস্থিতিতে মূলতঃ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির বিষয়টি মাথায় রেখে গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবস্থাপনার মাপকাঠিতে গ্রন্থাগার পরিষেবা তথা তথ্য পরিষেবার সার্বিক মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

১· গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান :

গ্রন্থাগারের সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে তিনটি মূল বিষয় জড়িত—অর্থ সরবরাহকারী (Funder), গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবহারকারী এবং পরিষেবার ব্যবস্থাপক। তথ্য পরিষেবার প্রয়োজনে এবং বিশেষত্ব সম্পদ-এর মূল ব্যবস্থাপনায় এই তিনটি উপাদানের প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। যেমন ধরা যাক, অর্থ সরবরাহকারী বা বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশা থাকে তথ্য পরিষেবার কাজে যে বিনিয়োগ তিনি করেছেন তার থেকে কিছু লাভের মুখ দেখা। এই রকম ব্যবসায়িক চিন্তা-ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দুনাফার অনুকূলে তথ্য পরিষেবা-সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করেন।

একইভাবে পরিষেবার প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যবহারকারীরও নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা আছে; আছে পরিষেবার গুণগত মান সম্পর্কে কিছু প্রত্যাশাও। গুণগত মান সম্পর্কে ব্যবহারকারীর বিশেষ অভিমত হল—তথ্য পরিষেবা স্বল্পপায়াসে ব্যবহার করা যাবে, তথ্যানুসন্ধানে সময়-সংক্ষেপ ঘটাবে এবং ব্যবহারকারীর তথ্যসংক্রান্ত চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। এই অভিমত ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য সর্বপ্রথমে সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে ব্যবহারকারীর প্রকৃত প্রয়োজনটুকু এবং তারপর সেই মোতাবেক পরিষেবা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যা অনেকটাই User Orientation কর্মসূচীর সাহায্যে বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

পরিষেবার ব্যবস্থাপকের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রত্যাশা একটু ভিন্ন ধরনের। ব্যবস্থাপক বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সবকটি বা বিশেষ কিছুর প্রয়োজনবোধ করে থাকেন।

(ক) তথ্য পরিষেবার কাজে ব্যবহারকারীদের কি কি করণীয় আছে সে বিষয়ে অগ্রিম জানিয়ে দিতে হবে;

(খ) বিভিন্ন খাতের মধ্যে কোন্ খাতে কি পরিমাণ অর্থ বণ্টন করতে হবে তাও পূর্ব নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক ;

(গ) বর্তমান বা ভবিষ্যতের প্রয়োজনে যে গ্রন্থাগার সম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য অর্থ সরবরাহকারীর কাছে বুঝিয়ে বলতে হবে যাতে তথ্য পরিষেবায় বিনিয়োগ করতে তিনি কোন রকম দ্বিধাবোধ না করেন ;

(ঘ) তথ্য পরিষেবা প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কার্যকারী পদ্ধতি নির্বাচনে সহায়তা করা ;

(ঙ) শ্রম এবং অন্যান্য সম্পদগুলির যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা ; এবং

(চ) সবশেষে, পরিষেবার গুণগত উৎকর্ষ সর্বতোভাবে বজায় রাখতে হবে।

এই আলোচনা থেকে বলা যায়, তথ্য পরিষেবার মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবস্থাপনার ভাগ্য নির্ধারিত হয় উপরোক্ত তিনটি উপাদান (অর্থসরবরাহকারী, সম্পদের ব্যবহারকারী, ব্যবস্থাপক)-এর সক্রিয় ভূমিকার পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিধান (Co-ordination)-এর উপর। সুতরাং, এই তিনটি উপাদানের নিজ নিজ ভূমিকাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

২. তথ্য পরিষেবা ও তথ্য ব্যবস্থাপক :

তথ্য পরিষেবার মূল হাতিয়ার গ্রন্থাগারের সম্পদসংগ্রহ। সম্পদসংগ্রহের মাপকাঠিতে যে গ্রন্থাগার যত বেশি উন্নত সেই গ্রন্থাগারের পক্ষে তত উন্নত তথ্য পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। আর এই সম্পদ সংগ্রহের মানোন্নয়ন নির্দেশিত ও নির্ধারিত হয় শুধুমাত্র সম্পদের পরিমাণগত দিক থেকে নয়, সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা দিয়ে। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যাঁর ভূমিকা মুখ্য তিনি হলেন তথ্য ব্যবস্থাপক (Information Manager)। বিশিষ্ট তথ্যবিজ্ঞানী হল (Hall) এই ব্যবস্থাপকের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন যে একজন তথ্য ব্যবস্থাপক তাঁর ব্যবহারকারীদের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং প্রচলিত পরিষেবার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিষেবাই বেছে নেবেন। সেই সঙ্গে পরিষেবার ব্যয় এবং সঠিক সময়ে সঠিক পরিষেবা পাওয়ার বিষয়টিও ব্যবস্থাপকের বিবেচনায় থাকবে। তথ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও কার্য স্তরে তথ্যের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা। কোম্পানীর ব্যবস্থাপককে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ব্যাখ্যামূলক শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। তথ্য ব্যবস্থাপক এর ক্ষেত্রে এই শিক্ষাগ্রহণ এখনও পর্যন্ত ব্যাখ্যামূলক নয়। কিন্তু নীতি ও দর্শন যেগুলি তথ্য ব্যবস্থাপককে পরিচালিত করে সেগুলিও এক অর্থে ব্যবস্থাপনা তথা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ।

৩. সম্পদ ব্যবহারের যৌক্তিকতা :

গ্রন্থাগারে তথ্য পরিষেবার কাজে গ্রন্থাগার সম্পদ-এর সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হয় ; উদ্দেশ্য একটাই—পরিষেবার বিস্তৃতিকে কাম্য স্তরে পৌঁছে দেওয়া। কতদূর পর্যন্ত প্রচলিত পরিষেবাকে প্রসারিত করা সমীচীন হবে ? অর্থনৈতিক তত্ত্ব এ প্রসঙ্গে বলে থাকে, যে পর্যন্ত প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost) এবং প্রান্তিক উপযোগ (Marginal utility) পরস্পর সমান হয় সেই সীমান্তটুকু পর্যন্ত প্রচলিত পরিষেবাকে প্রসারিত করা উচিত এবং লাভজনক। এতদ্ সত্ত্বেও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ (Library Management) এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাপকের মধ্যে একটা credibility gap থেকেই যাচ্ছে ; গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের দৃঢ় ধারণা—তথ্য পরিষেবা লাভজনক তো নয়ই, বরং ব্যয়বহুল ও নিছক বিলাসিতা। অন্যদিকে, গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাপকের বিশ্বাস—তথ্য পরিষেবা অপরিহার্য। এখন একটাই মৌল প্রশ্ন, তথ্য পরিষেবার স্বার্থে গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবহার কি সত্যিই বিলাসিতা ? যদি তাই হয় তবে আরও একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করতে হয়। কেনই বা তথ্য পরিষেবাকে অত্যাবশ্যক পরিষেবার আওতায় ফেলা যায় না ? সাংগঠনিক / প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর মোট ব্যয়ের (overhead charges) প্রেক্ষাপটে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। এমন অনেক

সংগঠন আছে যেখানে তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত ব্যয় মোট ব্যয়ের একটি অংশ যেহেতু তথ্য পরিষেবার ব্যয় উক্ত সংগঠনের সমস্ত বিভাগের মধ্যে বন্টন হয়ে যায়। বিপর্যয়টা ঘটে সেক্ষেত্রে যখন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্কটের মোকাবিলায় বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানের কাছ থেকে উচ্চ ব্যবস্থাপনার কাছে overhead charge হ্রাস করার একটা চাপ আসে যাতে সংগঠনের মোট আয়ের একটি বৃহৎ অংশ বিভিন্ন বিভাগের কাজ চালাতে ব্যবহার করা যায়। এহেন পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারের আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর মারাত্মক আঘাত আসে। আর এই আঘাত নিঃসন্দেহে তথ্য পরিষেবার উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে।

গ্রন্থাগারের বিশেষতঃ তথ্য পরিষেবার বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে যে ধারণা বা মানসিকতাটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করছে সেটি হল ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষতঃ মুনাফা অর্জনের প্রবণতা। যে কোন কোম্পানী মূলতঃ আর্থিক আয় (Financial output) ও আর্থিক ব্যয় (Financial input)-এর মাপকাঠিতে উক্ত কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কর্মসম্পাদন সমীক্ষা করে থাকেন। এইভাবে মুনাফার ধারণার সাহায্যে কোন কোম্পানীর তথ্য পরিষেবার সাফল্য নিরূপিত হয় ঠিক যেমন বাজারীকরণ (Marketing), বিক্রয় বা উৎপাদন বিভাগের সাফল্যের হিসাব করা হয়। এবার ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব (Management Theory)-এ মুনাফার ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। MBO (Management by Objectives) থেকে পরিষ্কার বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে মুনাফা অর্জনের ধারণাটি সমস্ত বিভাগে সমান সাফল্যের সাথে প্রযোজ্য হতে পারে না বিশেষতঃ ব্যয় বিশ্লেষণের ধারণাটির যখন সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা যায় তখন অ-মুনাফা অর্জনকারী সংস্থার অবস্থা দিয়ে বিষয়টির যাথার্থ্য নির্নীত হয়। ওল্ডম্যান (Oldman) ঠিক এই কারণে তথ্যের অপরিহার্যতাকে আর্থিক সংকটের পরিস্থিতিতে খাটো করে দেখেছেন।

তথ্যবিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা অবশ্য অন্যরকম। অন্যান্য বিভাগ যদি গ্রন্থাগার বিভাগের কাছ থেকে তথ্য পরিষেবা গ্রহণ করে তবে ঐ বিভাগগুলিকেও পরিষেবা লাভের জন্য মূল্য দিতে হবে। এই রকম পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারকে সাধারণ ওভারহেড (General Overhead)-এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

এছাড়া, সম্পদ ব্যবহারের সমর্থনে আরও পাঁচটি তত্ত্বের উপস্থাপন নিম্নে করা হল।

(ক) তথ্য পরিষেবা প্রদানের পরিমাপ ;

(খ) নগদ অর্থে সম্পদ ব্যবহারের সার্থকতা প্রদর্শন ;

(গ) তথ্য পরিষেবা পাওয়ার জন্য পরিষেবা-গ্রহীতা বা ব্যবহারকারীর মোট সময় ব্যয় ;

(ঘ) পরিষেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে মূল্য আদায় (charging) ;

(ঙ) আরও দেখাতে হবে—একমাত্র পরিষেবার গ্রাহকদের কাছে তথ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতেই বিনিয়োজিত অর্থের সদ্ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিশেষে, তথ্য পরিষেবার মূল্যায়নে শুধুমাত্র চাহিদা নির্দ্ধারণই যথেষ্ট নয়, চাহিদার পরিতৃপ্তি বিধানও একই সাথে বিবেচ্য। গ্রন্থাগারে ডকুমেন্ট-এর পরিমাণ যদি অসীম হয় কিংবা ডকুমেন্ট সংখ্যা যদি দ্রুত বৃদ্ধি পায় তবে তথ্য সংক্রান্ত চাহিদার তৃপ্তিবিধান করা সহজ। পক্ষান্তরে, সীমিত ব্যয় বা সীমিত ডকুমেন্ট-সংগ্রহ দ্বারা চাহিদার তৃপ্তিবিধান তুলনামূলক কঠিন কাজ। কারণ ডকুমেন্ট হল তথ্যের উৎস ও আধার। অতএব, গ্রন্থাগারের ডকুমেন্ট সম্পদ, চাহিদার পরিতৃপ্তিবিধান ও তথ্য পরিষেবার মূল্যায়ন—এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি দৃঢ়সংবদ্ধ আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে।

৩১. তথ্য পরিষেবা সম্পাদন—

কাঠামোগত বিচারে তথ্য পরিষেবাকে দু'ভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে : এক, পরিষেবা গঠনের মূল উপাদান বা পূর্বশর্ত বা ইনপুট (Input) এবং দুই, এই উপাদানকে কাজে লাগিয়ে এবং / অথবা রূপান্তরের

মাধ্যমে যে পরিষেবা ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়া যায় সেই পরিষেবাটুকু অর্থাৎ আউটপুট (output)। এছাড়া, তথ্য পরিষেবার আরও একটি উপাদান আছে। উপাদানটি হল আউটকাম (outcome) যা মূলতঃ তথ্য পরিষেবার ব্যবহারকারীর উপর পরিষেবার সামগ্রিক প্রভাব। বস্তুতঃপক্ষে, তথ্য পরিষেবা সম্পাদনে এই তিনটি উপাদানের নিজস্ব কিছু কার্যগত বৈশিষ্ট্য থাকার দরুণ তিনটি উপাদানের মধ্যে মূলগত প্রভেদটুকু বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। Productivity analysis-এ তিনটি উপাদানই যথোচিত বিবেচনা করতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণাটিও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যথাযথভাবে তথ্য পরিষেবা প্রদান হল আউটপুট এবং তথ্য পরিষেবাপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী (Informed patron) হল আউটকাম। অন্যদিক থেকে ইনপুট এবং আউটপুট-এর মধ্যেও একটা কার্যকারণ সম্পর্ক জড়িয়ে আছে অর্থাৎ ইনপুট নিয়ন্ত্রণ করে আউটপুট-এর পরিমাণ প্রয়োজনমত হ্রাস করা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই পরিস্থিতি (অর্থাৎ ইনপুট-আউটপুট কার্যকারণ সম্পর্ক) উৎপাদনশীলতা (Productivity)র কোন বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি হতে পারে না ; ব্যয়সংকোচনের নীতি হিসাবেই একমাত্র বিবেচিত হতে পারে।

তথ্য পরিষেবার সাথে জড়িত এই তিনটি উপাদানের পরিমাপ উন্নয়নের জন্য অনেক উৎপাদনশীলতা পদ্ধতি (Productivity techniques) আছে যার মধ্যে অন্যতম চাহিদা বিশ্লেষণ (Demand analysis)। চাহিদা বিশ্লেষণ এমনই এক আর্থিক কার্যক্রম যার দ্বারা তথ্য ব্যবহারকারীর চাহিদার প্রকৃতি (Demand pattern) নির্দ্ধারিত হয় এবং গ্রন্থাগার সম্পদকে সেই মত কাজে লাগিয়ে চাহিদার পরিতৃপ্তিবিধান করা হয় ; অর্থাৎ চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবস্থাপনা কেমন হবে সে বিষয়ে চাহিদা বিশ্লেষণ-এর সক্রিয় ভূমিকা আছে। প্রতিটি তথ্যের কম-বেশি কিছু চাহিদা তো থাকেই। হতে পারে কোন চাহিদা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন, তবুও প্রতিটি চাহিদারই আসলে বাস্তব ভিত্তি আছে। আর এজন্যই চাহিদার সাড়া পাওয়া যায়। প্রতিটি চাহিদা বিবরণীর (Demand profile) একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল চাহিদাই নির্দ্ধারণ করে দেবে কেমনভাবে সেই চাহিদায় গ্রন্থাগার সম্পদ বিশেষতঃ সম্পদের ব্যবস্থাপনা সাড়া দেবে ? চাহিদার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে অনেক সময় প্রয়োজন হয় সরল রেখাচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে চাহিদার বিভিন্ন পরিবর্তনের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা।

তথ্য পরিষেবার কার্যক্রমে ইনপুট হিসাবে বিবেচ্য বিষয় মূলতঃ তিনটি—শ্রম, নগদ অর্থ এবং অন্যান্য সামগ্রী। অপরদিকে, আউটপুট মূলতঃ সময় ও স্তর-বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দু'ভাবে আলোচিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন পরিষেবা (Intermediate outputs) এবং চূড়ান্ত পরিষেবা (Final outputs)। গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা থেকে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষেবার মূল উৎপত্তি। অর্থাৎ ফটোকপি, এস. ডি. আই., ইত্যাদি পরিষেবাকে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। চূড়ান্ত পরিষেবার চেহারাটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষেবার গ্রাহকের উপর প্রভাবকে এক কথায় চূড়ান্ত পরিষেবা বলা হয়। এই অর্থে চূড়ান্ত পরিষেবা অদৃশ্য ও বিমূর্ত (Abstract)। তথ্য পরিষেবা সম্পাদনের পরিমাপ বলতে মূলতঃ অন্তর্বর্তী-কালীন তথ্য পরিষেবার মূল্যায়নকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। বিষয়টিকে একটি চিত্রের সাহায্যে আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে।

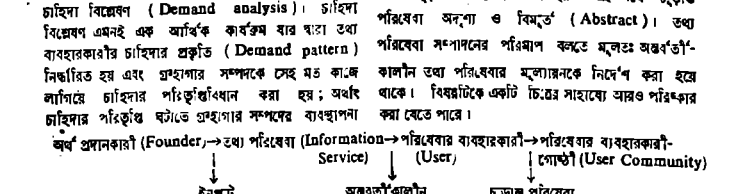

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মূলতঃ দুটি বিষয় বুঝতে পারা যায়—এক, অন্তর্বর্তীকালীন পরিষেবার ধারণাটি কি এবং দুই, ইনপুট (Input) ও চূড়ান্ত পরিষেবার সাথে এর কার্যগত সম্পর্কের তারতম্যই বা কতটুকু? এখন আরও জানা প্রয়োজন যে, অন্তর্বর্তীকালীন পরিষেবার মূল্যায়নে আর্থিক তত্ত্বের কি নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত? তাহলে দেখা যাক, কি কি পদক্ষেপ অন্তর্বর্তীকালীন পরিষেবার মূল্যায়নে কাজে লাগানো যেতে পারে? নিম্নোক্ত সারণীর সাহায্য নিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট হওয়া ভাল।

পরিষেবার ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যা

ফটোকপির জন্য অনুরোধ কিংবা সরবরাহ

তথ্যানুসন্ধান করা হয়েছে এবং উত্তর দেওয়া হয়েছে

ধার দেওয়া হয়েছে এমন ডকুমেন্টের সংখ্যা

পড়ার জন্য সংরক্ষিত স্থানের কতটা ব্যবহার করা হয়েছে

তথ্যসংক্রান্ত চাহিদার কতটুকুই বা পূরণ করা হয়েছে

ব্যবহারকারীর হাতে ডকুমেন্ট তুলে দিতে কত সময় ব্যয় হয়েছে

ব্যবহারকারীর জানা ডকুমেন্টের মোট সংখ্যা

সারণী—১ঃ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবায় ব্যবহৃত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষেবার পরিমাপ

অন্তর্বর্তীকালীন পরিষেবার পরিমাপ দুইদিক থেকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। প্রথমতঃ, পরিষেবার মাধ্যমে যে বিষয়গুলি উপাদিত হয় সেগুলি প্রমাণ করে পরিষেবার একটি সুফল আছে। দ্বিতীয়তঃ, মূল্যের পরিমাপ হিসাবে পরিষেবার ব্যবহারের বিস্তৃতি বা পরিমাণ কিংবাসংযোগ্য নয় কারণ কোন অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না যে গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থ ধার নিলে বা ফটোকপি পেয়ে থাকলে ব্যবহারকারীর মূল্যবান কিছু লাভ হল। যাইহোক, ক্লিনটো (Clinton) কিন্তু দেখেছিলেন যে অর্থ সরবরাহকারীর কাছে ব্যয় বিশ্লেষণ এবং অন্তর্বর্তীকালীন পরিষেবা পেশ করা হল কার্যকরী বিচার্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতি তিনি Danish Technical Information Service-এ প্রয়োগ করেছিলেন।

৩২ নগদ অর্থ—

একদিক থেকে তথ্য পরিষেবা যেমন ব্যয়সাপেক্ষ, অপর দিক থেকে তথ্য পরিষেবা তেমনি পর্যাপ্ত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভেরও উৎস। এই যৌক্তিকতায় এবং আশায় গ্রন্থাগারের সম্পদ ব্যবহারে বিশেষতঃ তথ্য পরিষেবার কাজে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিত করা উচিত। আর্থিক সুবিধা লাভের প্রেক্ষাপটে তথ্য পরিষেবার কার্যকারিতা সম্পর্কিত ধারণাগুলি এখন অবশ্যই বিচার্য।

(ক) তথ্য পরিষেবা থেকে আর্থিক লাভ দেখানো যেতে পারে সন্দেহের অবকাশ। কোন সন্দেহ নেই যে গ্রন্থাগারগুলির স্বল্প বা শূন্য আয়ের জন্যই তাদের সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক। আবার এটাও ঠিক, তথ্য পরিষেবাকে অর্থ বহির্ভূত ক্ষেত্র (Non-monetised sector) হিসাবে চিহ্নিত করা হয় কারণ মুনাফা অর্জন এই পরিষেবার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তথাপি অস্বীকার করা যায় না যে তথ্য পরিষেবার মধ্যে যথেষ্ট সঞ্চয় সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র আয়ের সাথেই সঞ্চয়ের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ নয়, বিনিয়োগের সাথেও সঞ্চয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। এক কথায় সঞ্চয়, আয় ও বিনিয়োগ-এর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার একটা আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সম্পর্কের চিত্রটি আর একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। ধরা যাক, তথ্য পরিষেবার বাজব অবস্থাটা এই রকম—কোন গ্রন্থাগার কিংবা তথ্য পরিষেবা কেন্দ্রে তথ্য পরিষেবা থেকে আয় কম, অতএব সঞ্চয় কম; সঞ্চয় কম, অতএব তথ্য পরিষেবা খাতে বিনিয়োগ কম; আর যেহেতু বিনিয়োগ কম; অতএব নতুন আয়ও স্বাভাবিকভাবে কম। পরিষেবার সামগ্রিক কার্যক্রমে যদি এই পাপচক্র নিয়ন্ত্রণছিন্নভাবে চলতে থাকে তাহলে তথ্য পরিষেবার মত গুরুত্বপূর্ণ অথচ ব্যয়বহুল কার্যক্রম খুব বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, আর পরিষেবার উন্নতি তো সুদূরপরাহত। অতএব বলা যেতে

পারে তথ্য পরিষেবার কাজে বিনিয়োগ, আয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে এমনই এক কার্যকারণ সম্পর্কের সক্রিয় অস্তিত্ব রয়েছে যার জন্য একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কার্যকারিতা ও অস্তিত্ব অকল্পনীয়। তথ্য পরিষেবার এই তিনটি উপাদান একে অপরের বিকল্প নয়, কিন্তু পরিপূরক।

এখন, এই সম্পর্ককে দুই পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এক, বিনিয়োগ তহবিল থেকে বিনিয়োগ বাঁচানো; আর দুই, গবেষণার সময় হ্রাস। তথ্যবিজ্ঞানীদের মধ্যে মার্টিন (Martin) এবং স্ট্রাবেল (Strable) ঠিক এরকম দৃষ্টান্তই দেখিয়েছেন। এমনকি মইসে (Moisse)-ও ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন কিভাবে উপযুক্ত তথ্যের অভাব আর্থিক ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয়। হ্যানসন (Hanson) এবং স্ল্যাটার (Slater) অবশ্য এই দুই রকমের আর্থিক বিষয়কে এক সাথে বিবেচনা করেছেন। নিম্নে প্রদর্শিত সারণীর সাহায্যে দেখানো যেতে পারে কিভাবে পরিষেবা থেকে আর্থিক সুবিধালাভ সম্ভব।

আর্থিক সুবিধা

(ক) পরিষেবার মাধ্যমে প্রেরিত তথ্য থেকে আর্থিক সংকোচন করা;

(খ) তথ্য ব্যবহারের সম্ভাব্য সুবিধার ভগ্নাংশ হিসাবে তথ্য সরবরাহের ব্যয়কে দেখানো;

(গ) ব্যবহারকারীর সময়ের সাশ্রয় করা;

(ঘ) তথ্যের যোগান অব্যাহত রাখার জন্য কোন্ কোন্ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী সে সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা।

সারণী ২ : তথ্য পরিষেবা থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা।

হেস (Hess) নির্দেশ দিয়েছেন যে, ডকুমেন্ট ব্যবহার করার পর ব্যবহারকারী যখন ডকুমেন্টটি গ্রন্থাগারে ফেরত আনেন সেই সময়ে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে জানা প্রয়োজন যে উক্ত ডকুমেন্টটি কতটা তাঁর কাজে লেগেছে এবং এ প্রসঙ্গে আরও সুনির্দিষ্ট করে জানা প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে কোন্ উদ্দেশ্যে ডকুমেন্টটি তিনি ব্যবহার করেছেন? আর একজন বিশিষ্ট তথ্যবিজ্ঞানী হল (Hall) দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে ব্যবহারকারীর নাগালের মধ্যে তথ্য পরিষেবা থাকলে কিভাবে সেই পরিষেবাকে তথ্যের সন্ধান লাভে এবং ব্যবহারকারীর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(খ) তথ্য পাওয়ার ব্যয়ের পশ্চাতে আর একটি যুক্তি হল কোন প্রকল্পের সাফল্যকে নিশ্চিত করা যায় একটি শর্তে—মুনাফার আশা করে কিংবা লোকসানকে যতদূর সম্ভব অবজ্ঞা করে; অর্থাৎ প্রত্যাশিত মুনাফা বা লোকসানের সামান্য ভগ্নাংশ হিসাবে এই ব্যয় বিবেচিত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে যে বিষয়টি পূর্বেই নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন সেটি হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে কোম্পানীর ব্যয় করার সামর্থ্য এবং ইচ্ছা। আর এই জন্য তথ্য সংগ্রহের পূর্বেই কোম্পানীকে মোটামুটি একটা হিসেব করে নিতে হবে নতুন বাজারের কতটা অংশ দখল করার সম্ভাবনা রয়েছে। কোম্পানীর সম্ভাব্য ন্যূনতম লাভ (কিংবা সর্বাধিক ক্ষতি) এটাই প্রমাণ করে যে প্রতিকূল ফলাফল এড়াতে মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদান করতে হবে।

(গ) সম্ভবতঃ সবচেয়ে সাধারণ যৌক্তিকতার ধারণাটি হল পরিষেবা মূল্যের সাথে ব্যবহারকারীর বাঁচানো সময়ের সামঞ্জস্যবিধান করা। বলাবাহুল্য, ব্যক্তিগত উদ্যোগের পরিবর্তে তথ্য পরিষেবার ন্যায় সামগ্রিক প্রয়াসের মাধ্যমে কর্মসম্পাদনেই সময় বাঁচানো সম্ভব। এই তত্ত্বের সমর্থনে নাইটিঙ্গেল (Nightingale)-এর একটা প্রত্যক্ষ ধারণা এ প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা যায়। তিনি লক্ষ্য করেছেন, যদি কোন CAS (Current Awareness Service) বুলেটিন না থাকে তবে বেশ কিছু সামগ্রিকপত্র ব্যবহারকারীদের খুঁজতে হয়। এই খোঁজার পিছনে যে বার্ষিক ব্যয় করতে হয় তার পরিমাণ ২৯,৬০০ পাউন্ড। অথচ CAS বুলেটিন তৈরীর বার্ষিক ব্যয় মাত্র ২,৫০০ পাউন্ড। অতএব, উপরোক্ত তথ্যের

ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, সমস্ত সামগ্রিকপত্র না খুঁজে কেবলমাত্র বুলেটিন তৈরীর জন্য যদি সীমাবদ্ধ রেখে ব্যয়সংক্ষেপ বা অর্থের সাশ্রয় হয় ২৭,০০০ পাউন্ড।

CAS বুলেটিন-এর মত এবার দেখা যাক SDI পরিষেবার মাধ্যমে তথ্যানুসন্ধানের সময় সংক্ষেপ কতটুকু হয়। ফার্ণ (Fearn) এবং কোভালিক (Kovalik)-এর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্ববাহী। তাঁরা SDI পরিষেবার ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন সার (abstract), কারেন্ট কনটেন্টস্ (Current Contents), ইত্যাদি খোঁজাখুঁজি না করে কতটা সময় প্রতি সপ্তাহে বাঁচানো সম্ভব। বিষয়টিকে নিম্নোক্ত সারণীর সাহায্যে আরও স্পষ্ট ও বোধগম্য করা হল।

পরিষেবার ব্যবহারকারী (মোট সংখ্যা)	সময় সাশ্রয় (প্রতি সপ্তাহে)
১	½
৩	¼
১২	১
২৯	২
৭	৩
৮	৪
৫	৫
১	৬
১	৭
১	

সারণী ৩: এস. ডি. আই. (SDI) পরিষেবার মাধ্যমে তথ্যানুসন্ধানের সময় সংকোচন—

সময়ের সাশ্রয় সম্পর্কে একটি বিষয় প্রায়ই সমালোচিত হয়ে থাকে। তথ্য পরিষেবার সুফলের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহারকারীর সময়ের সাশ্রয়ের মূল্যই বা কতটুকু? এ প্রসঙ্গে বাওয়ারম্যান (Bowerman)-এর বক্তব্য অবশ্যই উল্লেখ্য। তাঁর মতে—যতক্ষণ পর্যন্ত কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে এই সাশ্রয়ীকৃত সময়টুকুর সংযোগ ঘটানো যাচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত সাশ্রয়ীকৃত সময় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করতে পারে না। উল্ফ (Wolfe)—ও এই ব্যাপারে সহমত পোষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল—মনে করার কোন কারণ নেই যে তথ্যানুসন্ধানে এক ঘন্টা সময় বাঁচিয়ে সেই সময়টুকু অন্য কোন গঠনমূলক কাজে নিশ্চিত ব্যবহার করা হয়। সার ও নির্বন্ট সেবা (Abstracting and indexing services)-এর ব্যবহারকারীর কাছে এই ধরনের পরিষেবার তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি গবেষকদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন তথা সরবরাহের জন্য কোন গৌণ পরিষেবা (Secondary Services)-র ব্যবস্থা যদি না থাকে তবে গবেষকরা গবেষণার ফল পেতে কতটা অতিরিক্ত সময় কাজ করতে পারে।

(খ) তথ্য পরিষেবার ব্যবহারকারীর কাছে এই পরিষেবার বিক্রয় গুরুত্ব আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নির্ণয়িত হতে পারে। পরিষেবা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ব্যবহারকারীদের অর্থপ্রদানের প্রস্তুতি ও ইচ্ছার মাপকাঠিতে এই পরিষেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

৩০. ব্যবহারকারীর সময়ের সাশ্রয়—

বাজারমুখী অর্থনীতির সুস্পষ্ট প্রবণতা হল একটা নির্দিষ্ট মূল্যে উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করে সেই উৎপাদিত সম্পূর্ণ দ্রব্যটি (Finished goods) বাজারে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভোক্তার কাছে বিক্রয় করে থাকে। অতএব, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছেই এই উৎপাদিত সম্পূর্ণ দ্রব্যটির চাহিদা—যোগানের কার্যকারণ সম্পর্কে বিশেষ মূল্য (Value) আছে। এ প্রসঙ্গে মাচলাপ (Machlup)-এর ধারণাটি স্মরণযোগ্য। সকল মূল্য সমান অর্থবহ না হওয়ার দরুণ বিনিময় মূল্য (exchange value) এবং ব্যবহারিক মূল্য (use value)-র মধ্যে তিনি পার্থক্যের সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনেছেন। অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর উপর যখন শূন্য মূল্য কিংবা স্পর্শ মূল্য ধার্য করা হয় তখন বুঝে নিতে

হবে বস্তুটির ব্যবহারিক মূল্য আছে কিন্তু বস্তুটি বিনিময় মূল্যহীন। যেমন, জল, বাতাস, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, তুলনামূলকভাবে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে সেই বস্তুর বাজার দর অথবা বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি করা হয় অথচ আদপে বস্তুটির ব্যবহারিক মূল্য বর্জিত হয়। যেমন, মুক্তো ইত্যাদি মূল্যবান রত্নবিশেষ। সুতরাং, এই দুটি সংজ্ঞা থেকে বুঝতে পারা যায় বিনিময় মূল্য এবং ব্যবহারিক মূল্যের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক (inverse relationship) আছে। গ্রন্থাগার ও তথ্য-বিজ্ঞানেও সেইরকম পরিষেবা তৈরীর জন্য কম / বেশি কিছু-না-কিছু ব্যয় করতেই হয়, কিন্তু পরিষেবার ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে যেহেতু সব সময় পরিষেবা প্রদানের বিনিময়ে কোন আর্থিক মূল্য আদায় করা হয় না সেহেতু বিক্রীত মূল্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে বিশেষ একটা সচেতনতা দেখা যায় না। অতএব, ম্যাচলাপ-কে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে উক্ত তথ্য পরিষেবার ব্যবহারিক মূল্য আছে কিন্তু বিনিময় মূল্য নেই। অথচ ব্যক্তিগত-ভাবে ব্যবহারকারী পরিষেবা লাভের জন্য যে সময় ব্যয় করেন প্রকৃত অর্থে সেই ব্যয়িত সময়টুকুর জন্য তাঁকে মূল্য দিতেই হয়।

নিম্নমানের গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীকে তথ্যের সন্ধান ও তথ্য হাতে পাওয়ার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু আজকের দিনে সময়—সচেতন ব্যবহারকারীরা এ রকমভাবে সময় ব্যয় না করে তথ্য / ডকুমেন্টের সন্ধানে অন্য কোন ভালো গ্রন্থাগারে গিয়ে থাকেন। ভালো গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীদের স্বল্প সময় ব্যয় করলেই চলে কারণ তাঁদের তথ্যসংক্রান্ত চাহিদা খুব সহজেই এমন গ্রন্থাগার থেকে পূরণ হয়। যে গ্রন্থাগারের সম্পদসংগ্রহ গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই বেশ সমৃদ্ধ সেই গ্রন্থাগারের পক্ষে ব্যবহারকারীর পরিষেবাসংক্রান্ত চাহিদার অধিকতর দ্রুত সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়। স্বাভাবিকভাবে, সম্পদ সংগ্রহের সাথে তথ্যের চাহিদায় সাড়া দেওয়ার এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটিকে সম্পদের ব্যবস্থাপনা তথা অন্যান্য বিচার করতে হয়। যাই হোক, তাঁরা এই গ্রন্থাগারে বারে বারে আসেন যেহেতু তথ্যের অন্যান্য প্রতিযোগী ও বিকল্প উৎসের তুলনায় একমাত্র এই ধরণের গ্রন্থাগার থেকে পরিষেবা অল্প সময়ে ও স্বল্পায়াসেই পাওয়া যায়। এইভাবে সময়ের মূল্য স্বীকৃতি পেয়েছে ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্রের চতুর্থ সূত্রটিতে—পাঠকের সময় বাঁচাতে হবে (Save the time of the reader)। এখন এই আলোচনা থেকে একটি ভালো গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য নয়। প্রয়োজনীয় তথ্য ন্যূনতম সম্ভাব্য সময় ব্যয় করে ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দিতে সক্ষম যে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সেটাই হল 'ভালো গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা'। সরাসরি কোন আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, তথ্যানুসন্ধানে যে সময় ব্যয়িত হয় একমাত্র সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই ন্যূনতম সম্ভাব্য ব্যয় বিষয়টি এক্ষেত্রে বিবেচিত হয়।

তথ্য পরিষেবার সময়—সম্পর্কিত ধারণাটি কোচেন (Kochen)-এর মতে অন্যরকম। তিনি মনে করেন—কোন তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র থেকে একবার তথ্য পরিষেবা পাওয়ার আশা নিয়ে ঐ পরিষেবা কেন্দ্রে আসেন তাঁদের মোট সংখ্যা দিয়ে তথ্য পরিষেবার প্রকৃত কার্যকারিতা পরিমাপ করা বাঞ্ছনীয়।

৩৪. তথ্য পরিষেবার মূল্য আদায়ের যৌক্তিকতা—

তথ্য পরিষেবার আর্থিক দিকটিকে অস্বীকার করে ভিজ (Veazie)-র অভিমত হল যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চার্জ গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছেন তথ্য পরিষেবার উপর কোন মূল্য ধার্য করা হলে ৮ থেকে ১৫ শতাংশ ব্যবহারকারী পরিষেবা গ্রহণ করা পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে এবং ১৬ থেকে ২৮ শতাংশ ব্যবহারকারী পূর্বের তুলনায় কম গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যবহার করবে। শুধুমাত্র এই পরিসংখ্যানটুকুর ভিত্তিতে কি বলা যেতে পারে যে তথ্য পরিষেবার উপর চার্জিং-এর ব্যবস্থা থাকবে

না? বস্তুতঃ, চার্জিং-এর পক্ষে ব্যবহারিক যুক্তির ধার ও সংখ্যা খুব একটা কম নয়। এখন দেখা যাক, তথ্য পরিষেবার বিনিময়ে মূল্য আদায়ের যুক্তিগুলি কি ও কেমন?

(ক) তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র পরিচালনার কাজে পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতির প্রয়োজন। চার্জিং ছাড়া অন্য কোনভাবে এই আর্থিক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়।

(খ) গ্রন্থাগার / তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র যদি বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদান করে থাকে তবে কোনভাবেই সেই পরিষেবা খুব বেশীদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; কারণ পরিষেবা ব্যয়সাপেক্ষ। অতএব, তথ্য পরিষেবাকে কোন অবস্থাতেই মূল্য—নিরপেক্ষ (Value free) হতে দেওয়া যায় না।

(গ) গ্রন্থাগারের পক্ষে আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব যদি পরিষেবার বিনিময়ে গ্রন্থাগার মূল্য আদায় করে থাকে কারণ পরিষেবা তৈরীর জন্য গ্রন্থাগারকেও ব্যয় করতে হয়।

(ঘ) যে পরিষেবার মূল্য দিতে হয় তথা ব্যবহারকারীরা তুলনামূলকভাবে বিনামূল্যের পরিষেবার থেকে সেই পরিষেবার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন কারণ এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

(ঙ) বিশেষতঃ, যে পরিষেবা ব্যয়বহুল বা যার জন্য বহু মূল্য দিতেই হয় সেই পরিষেবাও তথ্যের ব্যবহারকারীর কাছে স্বল্পায়াসে পৌঁছে দেওয়া যায় যদি পরিষেবার সঠিক মূল্য ধার্য করা হয়।

(চ) যেহেতু পরিষেবার ব্যবহারকারীর কাছ থেকে পরিষেবার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মূল্য আদায় করা হয়ে থাকে সেহেতু ব্যবহারকারীর তথ্যগত চাহিদা পরিতৃপ্ত করার বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থাপককে অধিকতর যত্নশীল ও সচেতন হতে হয়।

(ছ) তথ্য পরিষেবার ব্যবহারকারীদের মধ্যে আর একটি ধারণা এবং বিশ্বাস আছে যে বিনামূল্যের পরিষেবা গুণগত বিচারে মূল্যভিত্তিক (Fee-based) পরিষেবার তুলনায় নিকৃষ্ট হবে। এই ধারণা কাজ করে বলে ব্যবহারকারীদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে মূল্যের বিনিময়ে তথ্য পরিষেবা লাভে।

অতএব, তথ্য পরিষেবার মূল্য আদায়ের স্বপক্ষে তিনটি প্রাথমিক ধারণা (Basic approach) সক্রিয়—

(ক) নামমাত্র মূল্য ধার্য (Nominal or Token Charge) করে দেখান যে পরিষেবারও ন্যূনতম আর্থিক মূল্য আছে;

(খ) পরিষেবার ব্যয় মেটানোর জন্য মূল্য ধার্য অবশ্যই প্রয়োজন;

(গ) লাভের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার পরিষেবা বিক্রয় করা।

উপরোক্ত তিনটি ধারণার বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট বলা যেতে পারে যে পরিষেবার মূল্য আদায়ের বিষয়টি যে কোন গ্রন্থাগার / তথ্য পরিষেবা কেন্দ্রেই একটি আর্থ সামাজিক রূপ (Socio-economic dimension) গ্রহণ করেছে এবং মূল্যভিত্তিক তথ্য পরিষেবা (Fee-based Information Services)-র ধারণাটি সৃষ্টি হয়েছে।

৪ নির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহের কাজে আর্থিক বিনিয়োগ এর যৌক্তিকতা—

তথ্য পরিষেবার কাজে আর্থিক বিনিয়োগ-এর যৌক্তিকতা বিচার করা প্রকৃত অর্থে গুরুত্ব কারণ তথ্যের বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে ব্যবহারকারী পর্যন্ত অনেকেই 'তথ্য'কে সম্পদের স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। বিনিয়োগ বিশেষতঃ নতুন এবং অতিরিক্ত বিনিয়োগ এর যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে বলা যায় যে একমাত্র এই ধরনের বিনিয়োগ-ই নিশ্চিত করতে পারে তথ্য পরিষেবা গঠনের বিশেষতঃ গ্রন্থাগারের সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বোত্তম প্রয়োগ। এ ছাড়া বিনিয়োগ-এর সমর্থনে আরও একটি জোরালো বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে; বক্তব্যটি হল—ব্যবহারকারীর স্বার্থে যে সমস্ত তথ্যের প্রয়োজন সেই তথ্য সমূহের নিরন্তর যোগান অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই পর্যায়ক্রমিক বিনিয়োগের যথার্থ গুরুত্ব থাকবে। আবার, মৌলিক

গবেষণা (Basic Research)-র কর্ম বিশ্লেষণ (Task analysis) পদ্ধতির দ্বারাও বিনিয়োগের পর্যাপ্ত যোগান বিচার্য হতে পারে। সুস্পষ্টভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য সর্বদা যে সমস্ত তথ্যের অবশ্যই প্রয়োজন হয় এমন কিছু তথ্য উপকরণ (Information inputs) নিম্নে প্রদর্শিত হল।

১। কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যে সমস্ত কাজ ইতিপূর্বেই হয়েছে সেগুলির বিশদ বিবরণ।

২। পদ্ধতি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তত্ত্বসমূহ—

৩। যে ভাবে কোন বিষয়কে আমরা ভাবছি তার প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করতে পারে এমন তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান—

৪। আমাদের ধারণাকে সমর্থ কিংবা সমর্থন করে এমন তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান—

৫। প্রচলিত মডেল—

৬। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যালব্ধ ধারণা—

৭। পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য—

৮। পদ্ধতি ও পরিষেবা—

১। তথ্য বিশ্লেষণ থেকে যেটুকু সাহায্য পাওয়া যায়—

১০। তথ্যের ব্যাখ্যা থেকে যেটুকু সাহায্য পাওয়া যায়—

১১। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজের বিশদ বর্ণনা—

১২। গবেষণার বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাবিধি ;

১৩। রেফারেন্স-এর বিশদ বর্ণনা।

সারণী ৪ঃ তথ্য-উপকরণ সম্বলিত মৌলিক গবেষণার কর্মবিশ্লেষণ।

কর্মবিশ্লেষণ পদ্ধতিটি আর এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যায়—উৎপন্ন দ্রব্যের মানোন্নয়নের কর্ম বিশ্লেষণ। তথ্য উপকরণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা যাই থাকুক না কেন এ কথা স্বীকৃত এবং প্রমাণিত যে, তথ্য, উপকরণ যে ধরনের তথ্য সরবরাহ করে থাকে তথ্য বিভাগ মূলতঃ উৎপন্ন দ্রব্যের মানোন্নয়নের জন্য সেই তথ্য সংগ্রহ এবং বণ্টন করে। তথ্য বলতে সামগ্রিকভাবে ব্যাপারীক এবং প্রযুক্তিগত উভয় ধরনের তথ্যকেই নির্দেশ করা হয়ে থাকে। বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত, ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও বাজারীকরণ (Marketing)-এর জন্য যে তথ্য উপকরণ-এর প্রয়োজন রয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন যথাক্রমে এ্যাগুইলার (Aguilar), স্কোনার (Schoner) এবং জোনস্ (Jones)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল তথ্য সরবরাহের স্বার্থে বিনিয়োগের যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা অপরিহার্য। এখন স্থির করা যেতে পারে, তথ্য পরিষেবার কাজে অন্যান্য গ্রন্থাগার সম্পদের ন্যায় পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থাপনা কেমন হবে? এই প্রসঙ্গে প্রথমেই নির্ণয় করা প্রয়োজন পুঁজি বিনিয়োগের চূড়ান্ত পরিমাণ বা স্তর (absolute level of capital investment) কি হবে? পাশাপাশি এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে কেবল বিনিয়োগের হার নির্ণয় কিংবা বিনিয়োগের সেই পরিমাণ স্থির করাই যথেষ্ট নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল বিনিয়োগের ধাঁচটি কি হবে তা স্থির করা এবং বিভিন্ন তথ্য পরিষেবার মধ্যে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলটি আনুপাতিক হারে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া। আর এই বিনিয়োগ বণ্টনের মৌল সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন অলাভজনক (আপাত দৃষ্টিতে) পরিষেবাগুলিতে বিনিয়োগ না করে শুধুমাত্র নীট মুনাফা অর্জনকারী পরিষেবাগুলির মধ্যেই কি বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা হবে? অর্থাৎ পরিকল্পিত বিনিয়োগের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা কি করা হবে এবং cost benefit analysis কি তথ্য পরিষেবার কাজে আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে? এ প্রশ্নের জবাবে আরনল্ড (Arnold) এর উত্তর হল—গ্রন্থাগার পরিকল্পনার বিষয়ে যদি অতিমাত্রায় Cost-benefit analysis-এর উপর নির্ভর করতে হয় তবে একমাত্র মুনাফা অর্জনকারী পরিষেবা-গুলিতে বিনিয়োগ হবে, পক্ষান্তরে, ব্যবহারকারীর কাছে জরুরী অথচ পরিষেবা কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে অলাভজনক পরিষেবায় বিনিয়োগ উপেক্ষিত হবে।

৫. উপসংহার :

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, যতটা সম্ভব সচেতনভাবে গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবস্থাপনা করতে হবে। অন্যথায় তথ্য পরিষেবার সার্বিক মূল্যায়ন জটিল, অসম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হবে। পরিষেবার মূল্যায়নে ব্যবহারকারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য কারণ পরিষেবার একমাত্র সম্ভোগকারী তো এই ব্যবহারকারী বা client। কিন্তু এখানেও কিছু জটিল সমস্যা আছে। ব্যবহারকারীর কাছ থেকে পরিষেবা সংক্রান্ত যে সাড়া বা মতামত পাওয়া যায় তা সর্বদা নির্ভরযোগ্য ও সঠিক এমন দাবী ও আশা করা যায় না। ব্যবহারকারীর তথ্যসংক্রান্ত চাহিদা অনেক সময় ডকুমেন্ট-এর চাহিদার নামান্তর মাত্র। এছাড়া, তথ্যসংক্রান্ত চাহিদা অনেক সময় অপ্রকাশিত থেকে যায় কারণ ব্যবহারকারীরা নিজেদের তথ্যগত প্রয়োজনটুকু নিজেরাই সঠিকভাবে সনাক্ত বা প্রকাশ করতে পারেন না। আবার কখনো কখনো ব্যবহারকারীদের তরফ থেকে ধরে নেওয়া হয় যে গ্রন্থাগার তাঁদের তথ্যসংক্রান্ত চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম। যাইহোক, এত অসুবিধা সত্ত্বেও তথ্য পরিষেবার যথার্থ মূল্যায়নে ব্যবহারকারীদের বিবেচনা করতেই হয়। আরও একটা কথা বলা দরকার, তথ্য পরিষেবার উৎপাদনবৃদ্ধি, পরিষেবার বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিভিন্ন পরিষেবার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও পরিষেবার গুণগত মানোন্নয়ন বিষয়ে উপযুক্ত নেতৃত্ব, সুদক্ষ পরিচালনা ও কার্যসূচীর রূপায়ণ—এর সবগুলিই গ্রন্থাগার সম্পদের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে এসে যায়। স্বাভাবিকভাবেই তথ্য পরিষেবার মূল্যায়নে এই বিষয়গুলি এক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

1. GRIFFITHS (Jase Maric). The value of information and related systems, products, and services. *In* Annual review of information science and technology. Vol. 17. P. 269—83.

2. SILLS (David L), *Ed.* International encyclopedia of the social sciences. Vol. 16. P. 510.

3. KENT and others. Encyclopedia of library and information science. Vol. 52. P. 64—72.

4. ROBERTS (Stephen A), *Ed.* Costing and the economics of library and information services. P. 273—91.

5. WHITTAKER (Kenneth). The Basics of library - based user services. London : Library Association, 1993.

উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন

বিগত ৩০।৯।৯৬ তারিখে পরিষদের পক্ষ থেকে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন দাবী সম্পর্কে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তীর নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

অবসর প্রাপ্ত কলেজ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল পেনসন ও অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা, বেসরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বকেয়া বেতন ও কলেজ গ্রন্থাগারিকদের অন্তবর্তীকালীন ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মন্ত্রী মহোদয় দাবীগুলি পূরণ করার আশ্বাস দেন। পরিষদের পক্ষ থেকে ডেপুটেশনে অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী ও কৃষ্ণপদ মজুমদার।

সাধারণ গ্রন্থাগার ও কর্মচর্চা

পমি সেন

গ্রন্থাগারিক, বাপুজীনগর গ্রন্থাগার, কলিকাতা

আধুনিক বিশ্বসমাজে শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগার হল এক অন্যতম অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠান। UNESCO'-র menifesto-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে সাধারণ গ্রন্থাগার হল এমনই এক প্রতিষ্ঠান যা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ও বৃদ্ধির এক অন্যতম সামাজিক প্রক্রিয়া এবং আরো বলা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষো শিক্ষাদিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসূত সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুক্রম একমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সফল হয়ে উঠতে পারে।

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পটভূমি :—

ভারতবর্ষের মতন পিছিয়ে পড়া আর্থ-সামাজিক নিরিখে তৃতীয় বিশ্বে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিহার্য্য। কেন না স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও আধুনিক ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার স্তরেই রয়েছে। এই সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কখনই দেশের ব্যাপক মানুষের জন্য শিক্ষা বিস্তারের সহায়ক হতে পারে না।

এই পটভূমিকার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের আরো চারটি অঙ্গরাজ্যে গণশিক্ষার প্রসার ও জীবনমুখী সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংহত ও সুগঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে সারা রাজ্যে কমবেশী আড়াই হাজারের উপর সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য পাশাপাশি প্রথাবহির্ভূত নৈশ ও বয়স্কশিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :—

সাধারণ গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই হল রাজ্যের তথা সমগ্র দেশের সর্বস্তরের মানুষকে পরিষেবার মাধ্যমে গ্রন্থাগার প্রেমী, গ্রন্থাগার মুখী এবং গ্রন্থাগারের উপর তাঁদের যাবতীয় জীবনধর্মী ও জীবন জিজ্ঞাসার নির্ভরশীলতা গড়ে তোলাও সেই সঙ্গে বাস্তব ও বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতা—গড়ে তুলতে সাহায্য করে দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা। এই দৃষ্টিভঙ্গির নিরীখে আশু কর্তব্য হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মূল যে কর্মসূচি তা হল :—

(ক) সাধারণ গণশিক্ষার প্রসার ও প্রচার

(খ) জীবনধর্মী ও জীবন জিজ্ঞাসার নিরীখে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ।

(গ) অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ও সুস্থসংস্কৃতির পক্ষে লাগাতার প্রচার।

(ঘ) সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

(ঙ) বাস্তব ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনের প্রয়াস।

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নিরীখে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে রাজ্যের তৃণমূলস্তরে নিয়ে যাওয়ার তাগিদে রাজ্যের প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকরী করার মধ্য দিয়ে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগীতাকে জনমানসে গ্রথিত করতে সক্ষম হন।

১৯৮০ সালকে সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারে কার্যকরি কাল হিসাবে ভিত্তি বছর ধরলে প্রায় পনের বৎসর অতিক্রান্ত হল। স্বভাবতই মনে জিজ্ঞাসা আসে আজ ১৯৯৫/৯৬ সালে অর্থাৎ প্রায় ১৪/১৫ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সত্যিই কি জনসাধারণের মনে পরিষেবার মাধ্যমে সামান্যতম দাগ

কাটতে পেরেছে কিনা। এও প্রশ্ন আসে যে, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা কোন খাতে বইছে যা সমাজের বুকে সে তার ভূমিকা অপরিহার্য্য করে তুলতে পেরেছে কিনা। এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের আরো কিছুটা পিছন দিকে তাকাতে হবে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অর্থাৎ পঞ্চাশ—ষাট দশকে সর্বস্তরে যে গঠনমূলক কর্মযজ্ঞের সূচনা হয়েছিল সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে, সেই ধারা মোটামুটিভাবে সত্তরদশকের প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত নিষ্ঠা, সুস্থ চেতনা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তা অব্যাহত ছিল। এই কর্মযোগের প্রতিশ্রুতি হিসাবে ফল স্বরূপ জনসাধারণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্ম। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই যে বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর আগমন ঘটে, ফলে পশ্চিমবাংলায় শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্র (অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও) একটা বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। সর্বহারা উদ্বাস্তু মানুষ জনেরই তাঁদের জীবন জীবিকার জন্য এবং সুস্থ-সংস্কৃতির মানসিকতার তাগিদে এলাকায় এলাকায় গড়ে তুললেন স্কুল, কলেজ, ব্যায়ামাগার ও গ্রন্থাগার। আজ যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের ফলে, তা ক্রমশ উত্তরোত্তর উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে চলেছে, তার পিছনে এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের অবদান অনস্বীকার্য্য। তবে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু ব্যতিত স্থায়ী বসবাসকারী সাধারণ মানুষের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার মূলে যে কোন ভূমিকা ছিল না, তা কিন্তু নয়। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে, পঞ্চাশ দশক থেকে যে কর্মধারা বিভিন্ন স্তরে শুরু হয়েছিল—তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা অব্যাহত ছিল—মূলমাত্র গঠনমূলক কাজের প্রেরণা হিসাবে সেই সঙ্গে ছিল আন্তরিক গ্রন্থপ্রেম আর সুস্থ শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখার তাগিদ। এই মানসিকতা ও ঐতিহ্য বজায় ছিল মোটামুটিভাবে ষাট দশকের শেষাশেষি কাল পর্যন্ত। তার পরেই পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নানান রাজনৈতিক জটিলতা ও সামাজিক-অস্থিরতার মধ্যে চিরস্থায়ী কালো দাগ নিয়ে সত্তর দশকের আবির্ভাব। একদিকে অতি বামপন্থীদের সত্তর দশককে মুক্তির দশক হিসাবে চিহ্নিত করে বিপ্লবের নামে যথেচ্ছ হত্যা, লুঠতরাজ ও ধান্দাবাজদের অবাধ বিচরণ, আবার অন্যদিকে দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি যারা কায়েমীস্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে "জরুরী অবস্থা" ঘোষণার মধ্য দিয়ে নির্বিচারে নির্লজ্জ ভাবে বামপন্থী আন্দোলনকে নির্মূল করার ব্রত নিয়ে যথেচ্ছভাবে সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার, খুন, গুপ্ত হত্যা বাস্তুহিটা থেকে উচ্ছেদ, নাশবন্দী ইত্যাদি সংগঠিত হয়। এক কথায় পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র ভারতবর্ষে এক বিভৎস সন্ত্রাসের রাজত্ব চলে। স্বভাবিক ভাবেই এই সময়কালে কোন সুস্থ ও গঠনমূলক কাজের পরিবেশও পরিস্থিতি ছিল না। এই পরিস্থিতির সুযোগে তৎকালীন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্রয়ে ও পৃষ্ঠ পোষকতার চোর, ঘুষখোর, ফাকীবাজ শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হয়। এবং এই শ্রেণীর মানুষরাই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসলেন। এঁদের না ছিল কোন আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি না ছিল কোন নৈতিকমান ও মূল্যবোধ, না ছিল দেশপ্রেম। যেন-তেন-প্রকারেণ দেশের সম্পদ লুটেপুটে খাওয়া ও নিজের স্বার্থ দেখাই এঁদের কাজ হয়ে দাঁড়াল। কালক্রমে এই আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিরাই দেশের কর্ণধার ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তার ফলে যা হবার তাই হল। দেশের সর্বত্র অসাধু ও ধান্দাবাজদের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি ও সরকার পরিচালিত হতে শুরু করল। ক্রমে ক্রমে তার প্রভাব সরকারী, বেসরকারী, ক্ষেত্রে সর্বত্র পরিলক্ষিত হতে দেখা গেল। ন্যায়, নীতি, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য সবই আস্তে আস্তে দুঃশাসনে পড়ল।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সমগ্র দেশের রাজনৈতিক,

সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রের চির এত রূপ তখনও কিন্তু পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ তাঁদের বোধবুদ্ধি, সুস্থচেতনা ও ভাবনা চিন্তার বিসর্জন দেন নি। সুযোগ পাওয়া মাত্রই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার কায়েম করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। অসন্তুষ্টি ও জেহাদ ঘোষণা করেছেন এই সব ধান্দাবাজ রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে —রায় দিয়েছেন সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির পক্ষে। সুরু হল বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে রাজ্যে সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজের সুস্থ পরিবেশ ও পরিস্থিতি। সমগ্র রাজ্যে যাতে সুস্থ শিক্ষা ও সংস্কৃতি অপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ ও তা যাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সেই প্রতিশ্রুতিতেই প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে তা কার্য্য করি করার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়বদ্ধতা গ্রহণ করতে রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হলেন।

সুরু হল সরকার ঘোষিত ও নির্দেশিত সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধ্যায়। অর্থাৎ গ্রন্থাগার পরিচালনা ও পরিষেবার ভার উত্তরসূরি হিসাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেতনভুক্ত কর্মীদের হস্তে অধিকাংশেই দায়িত্ব বহুল। ফলস্বরূপ একালে যাঁরা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজেদের অর্থ, পরিশ্রম, ঘাম চিন্তাভাবনা ব্যয় করেছেন, সেই গ্রন্থাগার থেকেই তাঁরা স্বেচ্ছায়, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ক্রমশঃ প্রস্থান করলেন ও করছেন। পাঠকগণ এই প্রবেশ ও প্রস্থান সন্ধিক্ষণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন। এই প্রস্থান ও প্রবেশের অন্যতম ও মুখ্য পার্থক্য হল—যাঁরা কোন কিছুরই প্রত্যাশা না রেখেই শুধুমাত্র শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখার দৃঢ়-সংকল্প গ্রন্থাগার পরিচালনার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে না মানিয়ে নিতে পারার মানসিক গ্লানি নিয়ে তাঁদের প্রভাব এবং সেই সঙ্গে শুধুমাত্র চাকুরীজীবি হিসাবে বেতনভুক্ত কর্মীদের প্রবেশ। কালের নিয়মেই এই দুই প্রজন্মের মানসিকতা, চিন্তাভাবনা ও আন্তরিকতার মধ্যে বিস্তর ফারাক প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হতে দেখা গেল।

বর্তমানে পশ্চিমবাংলা ও বাঙালীর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মহল থেকে "ওয়ার্ক কালচার" কথাটি খুব ঘনঘন শোনা যাচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে সমগ্র পশ্চিমবাংলার যে কোন "ওয়ার্ক কালচার"-এর পরিবেশ নেই অর্থাৎ রাজ্যের অধিকাংশ লোকেরাই (বিশেষ করে সরকারী কর্মচারীরা) কর্ম বিমুখতায় ভুগছেন, তা প্রমাণ করার জন্য রাজনৈতিকগত ভাবে ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রমাণের চেষ্টা চালান হচ্ছে, (কালচার কথাটি অর্থ, সংস্কৃতি, তবে এক্ষেত্রে কথাটির মানে বুঝতে হবে "চর্চা" হিসাবে) বাংলা এবং বাঙালীদের মধ্যে ওয়ার্ক কালচারের অভাব অর্থাৎ বাঙালীরা কর্মবিমুখ—এই কল্পিত অপবাদ অত্যন্ত সুকৌশলে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী মহল ও রাজনৈতিক দলগুলি জনমানসে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে প্রচার করে তাঁদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় রত হয়েছেন, এ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার সুযোগ থাকলেও, আমি এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মচর্চা বিষয়ে সামান্য দু'চার কথা বলার চেষ্টা করব।

সাধারণ গ্রন্থাগার ও তার কর্মীদের কর্মচর্চা নিয়ে আলোচনা করতে হলে, তাকে সংশ্লিষ্ট তিনটি পর্যায়ে মূলত ভাগ করা যেতে পারে।

ক—সরকারী পরিকাঠামোগত পর্যায়।

খ—গ্রন্থাগার পরিচালক মন্ডলীর দৃষ্টি ভঙ্গি ও কর্মীবৃন্দ।

গ—গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা।

(ক) সরকারী পরিকাঠামো পর্যায় :—

সরকারী পর্যায়ে যে কোন কাজ বা পরিকল্পনা সংগঠিত হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মারফত। যে দপ্তর পরিকাঠামোগত (infrustructure) যত বেশী মজবুত ও আধুনিক এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, সেই দপ্তরে পরিকাঠামোয় যে ব্যবস্থাক্রম বর্তমানে চালু আছে, তা তিনটি স্তরবিন্যাসের দ্বারা

গঠিত। শীর্ষে আছে Directorate of Library Service তার নীচে State Library Council এবং সর্ব নিম্ন নৈমিত্তিক কাজকর্মের তদারকির জন্য আছে Local Library Authorities. সরাসরি সাহায্য, এই তিন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনা নিয়মিত ও নিবীড় হওয়া একান্তই দরকার। কিন্তু অভিজ্ঞতায় বলে বাস্তব ক্ষেত্রে বর্তমানে (অবশ্যই ক্রমকাল থেকেই) তার অভাব ভীষণ ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ কর্মীদের অবথা হয়রানি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে হচ্ছে। এতে কর্মীদের সুষ্ঠ ও আন্তরিক কাজের অবনতি বাহুত হওয়াটাই স্বাভাবিক। হচ্ছেও তাই। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রন্থাগারের পরিষেবা।

সর্বস্তরে কর্মচর্চায় ধারাবাহিকতা ও পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাই হল আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা। দেশের / রাজ্যের অধীন কানুন নিয়মনীতি অনুযায়ী এই আমলাতন্ত্রের গড়িমসি ও দীর্ঘসূত্রিতার অবসানের কোন যাদু আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। অতএব যেমন চলছে তেমনই চলবে। বদনাম এবং দোষের ভাগী নিম্নস্তরের কর্মীদেরই বহন করতে হবে, এটাই স্বাভাবিক—এটাই গণতন্ত্র।

(খ) গ্রন্থাগার পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মীবৃন্দ

এই প্রবন্ধের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা এমন এক সময়ে গ্রন্থাগার কর্মী পরিচালক হিসাবে নিয়োজিত হয়েছেন, যখন তার আগেই রাজ্যসহ সমগ্র দেশের নৈতিকমূল্য ও সুষ্ঠচিন্তা ভাবনার আর অবশিষ্ট কিছুই নেই। সত্তর দশকের শুরু থেকে যে অরাজকতা ও অকর্মণ্যতার পত্তন হয়—সেই ধারা আজও দেশের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান। ফাঁকিবাজের এবং ধান্দাবাজের সেই মানসিকতার প্রভাব এই নব নিযুক্ত সমাজ-সেবীদের (?) মধ্যে কিছুটা ছোঁয়াচ তো লাগবেই।

সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ইদানিং যে কর্মচর্চায় যথাযথ মহড়া চলছে না বলে একশ্রেণীর মানুষের যে অভিযোগ, তা যেমন সঠিক মূল্যায়ন নয় আবার একেবারেই তাঁদের করা উড়িয়ে দেবার মতনও নয়।

কর্মী ও পরিচালকমণ্ডলী সদস্যদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে, গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্র যাই দৃষ্টিভঙ্গি থাকুক না কেন, প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল গ্রন্থাগার পরিষেবার মাধ্যমে সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা। এও দেখা গেছে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যদি অভিন্ন হয়, তবে সুষ্ঠ ও নৈতিক বোঝাপড়ায় আসতে বিশেষ অসুবিধা হবার নয়। তার জন্যে চাই পারস্পরিক সহযোগীতা, সম্মান ও মূল্যবোধ। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের যেমন মনে রাখতে হবে কার্যক্ষেত্রে কর্মীদের কাজে অযথা—অহেতুক হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় নয়, সেই সঙ্গে কর্মীদের ও উচিত পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের সেন্টিমেন্টকে যথাযথ মূল্য ও সম্মান প্রদর্শন করা। এই পারস্পরিক সুষ্ঠ বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই গ্রন্থাগারের পরিষেবার কর্মচর্চা বিরাজ করবে। প্রসঙ্গতঃ বলতে এটুকু দ্বিধা নেই যে, সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার গুলিতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল, আজ অনেকাংশেই তার নিরসন হয়েছে বর্তমানে উভয়পক্ষই যে যাঁর ভূমিকা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে চলেছেন। দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া প্রায় সব গ্রন্থাগারেই আজ কাজের পরিবেশ ও কর্মচর্চা উল্লেখযোগ্যভাবে উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকবে ও উত্তরোত্তর উৎকর্ষতার বৃদ্ধি পাবে যদি সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা ও আমলাতান্ত্রিক বাধা এবং লাল ফিতের ফাঁস কিছুটা শিথিল হয়।

(গ) গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ঃ—

সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মচর্চা যথাযথ ও নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখার দায়িত্ব শুধুমাত্র কর্মীদের সদিচ্ছার উপরই নির্ভরশীল নয়, পরিচালকমণ্ডলী ও সরকারীস্তরের সহযোগিতা যেমন অপরিহার্য তেমনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ও কিছু দায় দায়িত্ব রয়েছে।

সমগ্র রাজ্যে তৃণমূলস্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলন পৌঁছে দেওয়ার জন্য আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের যে

প্রণিধানযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এক সময় দেখা গিয়েছিল গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের পর সেই কার্যকরী ভূমিকা থেকে নেতৃবৃন্দ হঠাৎই যেন কিছুটা সরে এসেছেন। মনে হয় যেন রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ও তা সরকারী স্তরে কার্যকরী করাই যেন তাঁদের শেষ অভিষ্ট লক্ষ্য ছিল। এর পরে যেন তাঁদের আর কিছু করার নেই। মনে রাখতে হবে আন্দোলনের মধ্যমে কোন কোন কিছু হয়তো আদায় করা যায়, কিন্তু সেই আদায়ীকৃত বস্তুকে যথাযথ ধরে রাখা ও সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে তা প্রয়োগ ও অগ্রগতির পথে চালিত করা মোটেই সহজ সাধ্য নয়। এখন গ্রন্থাগার আন্দোলন বলতে বাৎসরিক গ্রন্থাগার দিবস পালন এবং নতুন সংযোজিত গ্রন্থাগারিক দিবস পালন আর বাৎসরিক / দ্বিবাৎসরিক সম্মেলনের মধ্যেই তা সীমিত। হ্যাঁ এ সবের অবশ্যই দরকার আছে, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃবৃন্দেরও মনে রাখতে হবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির যাতে সুষ্ঠ কর্মচর্চার পরিবেশ বজায় থাকে, সেই দিকে যেন মধ্যে মধ্যে নজর দেন। শুধুমাত্র কর্মীদের চাকুরী, চাকুরী সংক্রান্ত কিছু সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া বা সরকারের সঙ্গে কর্মীস্বার্থে দর কষাকষি করাটাই যেন একমাত্র বা মুখ্য ভূমিকা না হয়।

গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মচর্চা বজায় রাখা এবং তার মান যাতে—উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়—সে বিষয়েও নেতৃমণ্ডলীকে পরিকল্পনা মাফিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিত ভাবে গ্রন্থাগারকর্মীদের নিয়ে কর্মশালা (আর্থিক দাবী দাওয়া ব্যতীত। শুধুমাত্র পরিষেবা এবং কর্মীদের দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি মাথায় রেখে। এবং Refresher course-এর মাধ্যমেই তা সম্ভব। সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে পরিষদের উদ্যোগেই তা সংগঠিত করতে হবে। সেই সঙ্গে সকল গ্রন্থাগার কর্মী—গ্রন্থাগার শ্রেণী ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিবীড় যোগাযোগ এবং ভাবের আদান-প্রদানের মানসিকতা ও পরিবেশ যাতে সহজ ও সরল হয়—কাম্য এটাও।

যে কোন সংগঠন বা সংস্থার মুখ্য ভূমিকাই হল অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান। তা সরকারী বা বেসরকারী যে স্তরেই হোক না কেন, সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হল সাধারণ গণশিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার এবং সেই সঙ্গে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে—লাগাতার সংগ্রামের দ্বারা রাজ্যের দেশের সাধারণ মানুষের মনে যুক্তি ও বিজ্ঞান-মনস্ক মানসিকতা গ্রথিত করে আধুনিক সমাজ গঠনের সহায়তা করা। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক নিরীখে কাজটা মোটেই সহজ না হলেও, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কিছুটা কাছাকাছি যাওয়া যেতে পারে যদি অভিষ্ট কাজের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের সদিচ্ছা থাকে। বস্তুঃ এই ধরনের সামাজিক গঠনমূলক কাজ করতে গেলে নানান বাধা-বিপত্তি ও বিরুদ্ধ সমালোচনা আসাটাই স্বাভাবিক এবং আসবেও। পারস্পরিক দোষারোপ না করে যার যা সর্বনিম্ন সামর্থ প্রয়োগ ও সদিচ্ছাটাই বড় কথা। যে কোন কাজ সংগঠিত করতে গেলে কিছু ভুল-ত্রান্তি হতেই পারে, সেইসব ভুল-ত্রুটি ও সমালোচনা উপেক্ষা করেই আমাদের কর্মচর্চা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ENGLISH ABSTRACTS

by Ratna Banerjee

Of articles, editorials etc. published in Granthagar Vol. 45, No. 11—12 1996

Vol. 45, No. 11, February—March 1996

Recent Govt. Circular regarding promotion of employees of West Bengal Govt. Sponsored Public Libraries – Editorial (PP. 1—5)

The public library system expanded after the left front government came into power in 1977. Gradually the West Bengal public library act was introduced and many public libraries were established. Recently the State Government has published the rules and regulations regarding the promotion of the librarian, assistant librarian and library assistant of sponsored libraries. Also the Career Advancement programme in this state gives public library workers an opportunity to get higher scale after some years. These programmes are to be implemented. The qualified professional can also apply for a direct post. The State Government should be congratulated for this programme. There are certain limitations and inconsistencies in the programme. The Government should rectify it by discussing the matter with B.L.A. and West Bengal Public Libraries Workers Association.

Role of Bibliography and Printing Press in preservation of old published books—by Anil Kumar Dutta (PP. 6—8)

It discusses the role of bibliography and printing press in preserving published books. It also gives a list of early printing presses which used to print in Bengali script.

Returned from Vijayawada : Brief report on the 41st All India Library Conference – by Amit Kumar Bandyopadhyay and Ruma Bandyopadhyay (PP. 9—15)

The 41st All India Library Conference was held in Vijaywada and was hosted by the Andhra Pradesh Library Association during 7th—10th January, 1996. The topic of discussion was Human Relations in Librarianship.

The important recommendations of the Conference are as follows :

- System should be more user friendly.
- Human relation based user education programmes are to be developed.
- Library training centres should include human relations in libraries in their syllabi.
- The changes due to computerization should be properly taken care of.

Vol. 45, No. 12, March—April, 1996

EDITORIAL (PP. 1—2)

There are some valuable books in different government, government sponsored public libraries and in libraries under various organisations. The condition of a major portion of these collections is gradually

becoming bad. In India we do not have a centralised system to preserve the educational and cultural heritage. In some special and academic libraries special effort is being made to conserve documents. Conservation is quite costly. We must have one centralised conservation centre and regionwise conservation units. There are some indigenous methods to conserve documents like scattering of turmeric powder, neem leaves, tobacco leavs, dry chillies etc. But one should try to find out the scientific basis of it. The state as well as the central government should step forward to solve the problem.

Calcutta University Library Science Department Golden Jubliee Lecture by Prabir RoyChowdhury (PP. 3—7)

This is the text of the Golden Jubliee Lecture delivered by the author on the occasion of the Golden Jubliee Celebration of the Department of Library Science, University of Calcutta.

In 1945, University of Calcutta introduced the Diploma Course in Library Science. Gradually, the Bachelor Degree in Library Science (B. Lib. Sc.) and Master Degree in Library Science (M. Lib. Sc.) courses were introduced. The library science trained professionals from this university have contributed much to the development of the libraries in various parts of India. Thus the Department of Library Science played a very important role in establishing library science in society.

Library and information science is a professional course. The syllabus of a professional course changes keeping pace with the needs of society. Now after the era of librarianship we have crossed the threshold of library and information science, information science and information studies ; from the world of printed books we have entered the world of electronic books Now library automation, information technology, information storage and retrieval, information processing and organisation, information analysis and consolidation, information sources and services are the major topics in library and information science. The scientific theories enunciated by Dr. S. R. Ranganathan, one of the pioneers in library and information science, should also be included in the syllabus. The syllabus of library and information science in India should include modern technological studies as well as traditional theories needed to organise small and medium sized libraries.

To formulate the syllabus of library and information science the following four points should be taken care of :

1. Should include the fundamental theories of the social role of libraries and use of library materials.

2. Should cover the professional and technical skills required.

3. Should show that the library and

information science is a specialized field.

4. The syllabus and methods of education and evaluation should be so organised that the trainees can develop skill and experience during the course.

After so many years the Library Science Department of University of Calcutta has taken the initiative to revise the syllabus. This work should be hastened.

The Department has started research programmes. It should try to get grants from UGC, ICSSR, DST, NISSAT etc.

It should take care of the Continuing Education Programme by organising Refreshers Course, Workshop, Seminar etc.

Few recommendations are placed before the authorities for consideration.

The Department should change its name from Department of Library Science to Department of Library and Information Science. Subsequently the names of degrees are to be changed.

The Department should have a workshop cum library where students can have practical training and a computer laboratory.

B. Lib. Science Degree course of this University was started as an evening course to accommodate deputed candidates. Unfortunately these candidates are being deprived of this opportunity. So this should be reconsidered.

The Department of Library Science of University of Calcutta does not have any post of Professor. This post should be created considering the importance of the Department.

Problems of School Librarian by Swadesh Ranjan Bhattacharjee (PP. 8—10)

The scale of the school librarians is not at par with that of the school teachers. The College and University librarians are enjoying the pay scales of the college and university teachers. The school librarians are not sure of the Fourth Pay Commission report. Let all school librarians jointly organise a movement under B. L. A.

Selection of computer System in a Library : an idea by Anita Bhattacharjee (PP. 11—12)

To select a computer system for providing qualitative services to the users the following points are to be taken care of : usefulness, cost effectiveness study of the system ; selection of hardware, software after conducting feasibility study and requirement analysis and proper training of the existing staff, etc.

শশাঙ্ককুমার বাগচীর জীবনাবসান

বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ প্রবীণ গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক শশাঙ্ককুমার বাগচী নীলরতন সরকার হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়েক মাস আগে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র শশাঙ্কবাবু দীর্ঘ কর্মজীবনে এস. সি. ই. আর. টি, হুগলী ট্রেনিং কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পরিষদের সহ-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতির আহ্বায়ক ছিলেন। বিভিন্ন জেলায় পরিষদের জেলা কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে শশাঙ্কবাবুর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

পরিষদের সব সভা সমিতিতে তিনি হাজির থাকতেন এবং গঠনমূলক আলোচনা করতেন। আগামীদিনে তাঁর অভাব সর্বদাই অনুভূত হবে। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

বিগত ১১ই অক্টোবর ১৯৯৬ সন্ধ্যায় পরিষদ ভবনে প্রয়াত শশাঙ্কবাবুর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্মরণসভায় ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, শ্রী সত্যব্রত সেন, রামকৃষ্ণ সাহা, অরুণকুমার রায় এবং কৃষ্ণপদ মজুমদার তাঁর স্মৃতিচারণা করেন।

আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়দের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রতিটি গ্রন্থাগারে অপরিহার্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশিত পুস্তক

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪) ৩৫·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) (১৯১৫-১৯৩০) ২০০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ ৪০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা ২৫·০০
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোন ২৫·০০
- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫·০০
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodology ১২৫·০০

Annual Subscription : Rs. 48·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 4·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 46 : No. 8 November-December 1996

CONTENTS

	PAGE
Editorial	1—3
Madhabchandra Chatterjee	
Management of Library Resources for Evaluating Information Services	4—14
Pomi Sen	
Work Culture in Public Libraries	15—19
Dr. Ratna Banerjee	
English Abstracts	20—22
Sasank Kumar Bagchi is no more	23

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014 Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005.
Editor : Arun Ray, Associate Editor : Nirmalya Ray

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৯ সম্পাদক : অরুণ রায়, সহযোগী সম্পাদক : নির্মালা রায় [পৌষ, ১৪০৩

সূচী

পৃষ্ঠা

[illegible]

হিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রমীলচন্দ্র বসু স্মরণে

[illegible]রিপদ মুখোপাধ্যায় ও মিহিরলী চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুঁথির সূচীকরণ (Cataloguing) সমস্যা

বনী চক্রবর্তী

পড়ুয়া সমাজ গঠনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

Dr. Ratna Banerjee

English Abstracts

জেলা সংবাদ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৯, সম্পাদক : অরুণ রায় / সহযোগী সম্পাদক : নিবারণ রায়। পৌষ, ১৪০৩

সম্পাদকীয়

এবারের গ্রন্থাগার দিবস

অন্যান্য বারের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রন্থাগার দিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। গত বছর থেকেই সভাসমিতির মাধ্যমে রুটিন মাফিক গ্রন্থাগার দিবস পালনের বদলে বইয়ের জন্য মিছিল করা শুরু হয়েছে। কলকাতা সহ কয়েকটি স্থানে বই মিছিলে অংশ গ্রহণ ভালই হয়েছে। গত বছর থেকেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্রোতধারার সঙ্গে ও বিজ্ঞান আন্দোলন ও সাক্ষরতা আন্দোলন সংযুক্ত হয়েছে। এই দিনটিতে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক সভা, আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী, মিছিল ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গ্রন্থাগার-গুলিকে গ্রন্থাগার দিবসের কর্মসূচী পালনের জন্য আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্য হলো অপামর জনসাধারণের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস জাগিয়ে রাখা। জ্ঞান সঞ্চালনের মাধ্যমে সমাজে যাতে সুস্থ সংস্কৃতি, বিচারবোধ বাড়িয়ে তোলা যায়, মানুষ যাতে পাঠের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে তার জন্য বই পড়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। দেশের উন্নয়নে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থার দাবী গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম দাবী।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৪৯ বছর পরেও আমাদের দেশের সমস্ত মানুষের বই পড়ার ক্ষমতা নেই। সংবিধানের মাধ্যমে সরকারকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১০ বছরের মধ্যে সমস্ত মানুষকে সাক্ষর করার যে নির্দেশ দেওয়া, হয়েছিল সে কাজ বিগত কোন সরকারই পূরণ করে যান নি। পশ্চ বঙ্গে নিরক্ষর মানুষ কম নয়। এমন কি রাজ্য বাজেটে ২৬% শিক্ষার জন্য ব্যয় করলেও সমস্ত রাজ্যবাসীকে স্বাক্ষর করা যায় নি। তাই প্রয়োজন হয়েছে স্বাক্ষরতা আন্দোলনের। কিন্তু কয়েক বছরে সাক্ষরতা ও বিজ্ঞান আন্দোলনের অগ্রগতির ফলে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ সাক্ষরতা আন্দোলনের জোয়ারে হাজার হাজার মানুষের অক্ষর পরিচয় হলেও তাদের আজীবন শিক্ষার ব্যবস্থাপনা অতি দুর্বল। বিশেষ করে সদ্য লব্ধ শিক্ষাকে ধরে রাখা এবং জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করতে না পারলে বিষয়টি মরুভূমিতে গাছ লাগানোর মতো ব্যাপারটা হতে থাকবে। সেখানে চাই প্রতিনিয়ত জলের ধারা—এখানে জ্ঞানের ধারা। তাই সাক্ষরোত্তর প্রবহমান ও নিরন্তর শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির যথাযথ ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ সদ্য সাক্ষরদের হাতের কাছে বইয়ের যোগান না থাকলে, জ্ঞানের উপযোগিতা অনুধাবন করতে না পারলে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। আর গ্রামীণ মানুষের দুঃখ দুর্দশাও লাঘব হবে না। এজন্যই সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার বিস্তৃতি প্রয়োজন। সাক্ষরতা কেন্দ্রের সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংযোগ এবং

ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী না থাকলে সাক্ষরতা আন্দোলন পথ হারাতে বাধ্য। বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ সঞ্চার না করাতে পারলে বিজ্ঞান আন্দোলনেরও পোলিও রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যে থাকবে এ আশংকা রয়েছে। তাই নব সাক্ষরদের গ্রন্থাগার পরিষেবার মধ্যে আনা, এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করা গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বর্তমানে সমাজে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকাঠামো বেশ দুর্বল। ২৫০০ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সংখ্যা ও কর্মধারা উভয় ক্ষেত্রেই দুর্বল।

গ্রন্থাগারিকদের মনে রাখা প্রয়োজন যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত হয়—সুতরাং জনসাধারণের চেতনার মান, সংস্কৃতির মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। এখানে গ্রন্থাগার কর্মী অক্রিয় হয়ে পড়লে তার গ্রন্থাগার জনসমর্থন হারাবে। তাই বই পড়া ও বই সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার কাজটি, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রন্থাগার তার যোগ্য ভূমিকা পালন করলে জনসাধারণও সেইভাবে গ্রন্থাগারকে পরিপুষ্ট করবে। বিশেষত আজকের টেলিকমিউনিকেশনের যুগে মুদ্রিত পুস্তকের বদলে ইলেকট্রনিক মাধ্যম মানুষের মধ্যে পাঠস্পৃহা পাঠাভ্যাস কমছে—ফলতঃ জ্ঞানের সঞ্চালনও কমছে। তাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের দায়িত্ব এসে পড়েছে মানুষকে পাঠাভ্যাসের উপযোগিতা বোঝানো। স্লোগান তুলতে হচ্ছে বই পড়ুন, বই পড়ান, গ্রন্থাগারে আসুন। বই উপহার দিন।

তাই পরিষদ ছাত্র-ছাত্রী, শিশু-কিশোর সহ সাক্ষর নিরক্ষর সকলকেই গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার জন্য ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসে সর্বত্র বই মিছিলের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছে। এই বই মিছিলের বক্তব্য হলো বই পড়ুন, বই পড়ান, বই উপহার দিন, গ্রন্থাগারে আসুন। কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীরা যদি নিজ নিজ গ্রন্থাগারে এই স্লোগানকে বাস্তবে রূপায়িত করার বিষয়ে সচেষ্ট না হন তবে স্লোগান শুধু স্লোগানই থেকে যাবে।

এই সম্পাদকীয় যখন আপনাদের হাতে পৌঁছবে হয়ত তখন 'গ্রন্থাগার দিবস' তারিখ অতিক্রম করেছে। কিন্তু মূল বক্তব্যের তাৎপর্য থেকেই যাচ্ছে। সুতরাং বইয়ের জন্য মিছিলের, পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য সমিতির আলোচনাচক্রের প্রয়োজন থাকবে। সুতরাং গ্রন্থাগার সংগঠক গ্রন্থাগার কর্মী প্রত্যেকেই এ সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

প্রমীলচন্দ্র বসু স্মরণে

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিগত ২৬শে অক্টোবর, ১৯৯৬ প্রমীলচন্দ্র বসু [মধ্যমগ্রামে অবস্থিত তাঁর নিজ বাসভবন 'সুরধামে' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রমীলচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে গ্রন্থাগার জগতের এমন এক দিক্‌পালের জীবনাবসান হল যিনি সুদীর্ঘ অর্ধ

প্রমীলচন্দ্র বসু

শতাব্দীরও ওপর এক প্রবাদ প্রতিম পুরুষ বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। বলা যায় তাঁর মৃত্যুতে গ্রন্থাগার জগতের এক ইন্দ্রপতন হয়ে গেল।

প্রমীলচন্দ্র ১৯০৭ সালের ১৩ই মার্চ টাকিতে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন। তাঁদের বাসস্থান ছিল টাকি শহরের সৈয়দপুরে এলাকায়। তিনি ১৯২৫ সালে টাকি গবর্ণমেন্ট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি সিটি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এস সি পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ইতিহাস ও অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে বি এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। অর্থনীতিতে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি অর্থনীতি ছেড়ে কমার্স নিয়েছিলেন ১৯৩০ সালে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় পরীক্ষার মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে পড়া ছেড়ে দেন।

প্রমীলচন্দ্র কলেজে পড়ার সময় থেকেই সেবামূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে আসছিলেন। এ ছাড়া স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি গ্রন্থাগারের কাজকর্মে আগ্রহী ছিলেন। পাড়ার পল্লী মিলন সমিতির গ্রন্থাগারটির ছোটদের গ্রন্থাগার বিভাগ তিনি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কলেজে পড়ার সময়ে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁর এক মামাতুতো ভাইয়ের সহযোগে তিনি টাকি কংগ্রেসের একটি শাখা স্থাপন করেন। ঐ সময়ে চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির কার্যকরী সমিতি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শেও এসেছিলেন এবং বিপ্লবীনেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। শোনা যায় পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি একবার জেলেও গিয়েছিলেন অথবা তাঁকে গ্রেপ্তার করেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য কোথাও এর কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। পুলিশের খাতায়ও তাঁর নামে কিছু পাওয়া যায় নি।

প্রমীলচন্দ্র ১৯০৩ সালে গ্রন্থাগার বিদ্যা অধ্যয়ন করতে বরোদা যান। এর কিছুকাল পূর্বে তিনি বেঙ্গলে বেড়াতে যান এবং রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগারে কোন সংবাদপত্রে বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি দেখেন। তদনুসারে তিনি ওখানকার কিউরেটর নিউটনমোহন দত্তকে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা জানান। শ্রীদত্ত তাঁকে বরোদা যেতে বলেন। গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের ব্যাপারটা তাঁর হঠাৎই হয়ে যায়। তিনি ব্যবসা করবেন বলেই স্থির ছিল। তার আগে তিনি একটি বেসরকারী সংস্থায় কারিকের চাকুরীও করেছেন। এমনকি জীবন বীমার দালালিও করেছেন। বেকার অবস্থায় অনেকদিন কাটিয়ে তিনি খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। তিনি দুবার বেঙ্গল ভ্রমণ করেন। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই তিনি এক সময়ে ঘুরেছিলেন এবং সেসব জায়গার জনজীবন ও অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন। রাজনীতি করার ফলে তিনি সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং পরবর্তীকালেও আমরা তাঁকে নানা ঘটনা ও বিষয় অর্থনৈতিক সামাজিক পটভূমিতে বিচার করতে দেখি।

বরোদায় তিনি তিন মাস শিক্ষানবীশী করেন। সেখানকার সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর বাংলা বিভাগটি তিনি সংগঠিত করেন। পরে তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯০৩ এর সেপ্টেম্বর মাসে লাহোর যান। এই শিক্ষাক্রমটি ছিল ছয় মাসের। এক বৎসর অন্তর ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করা হত। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কলিকাতায় ফিরে এলে ১৯০৪ সালে বাঁশবেড়িয়ার গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে ১৯০৭ সালে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ কোর্স শুরু হলে তিনি তার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্সেরও শিক্ষক ও বিভাগের প্রধান হয়েছিলেন।

প্রমীলচন্দ্র ১৯০৫ সালের ১লা এপ্রিল ৭৫ টাকা বেতনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সহকারী হিসেবে যোগ দেন। তাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করার সুপারিশ করেছিলেন স্বয়ং উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এর কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন বসন্ত বিহারী চন্দ। শীঘ্রই ঐ গ্রন্থাগারে দু'জন সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি হয়। ১৯৩৫ এর ১ আগস্ট থেকে এর একটি পদে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর পদটিতে প্রমীলচন্দ্র বসু নিযুক্ত হন। এই পদের বেতনক্রম ছিল ১০০—২০০ টাকা। ১৯৩৭ সালে বসন্ত বিহারীর জায়গায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় গ্রন্থাগারিক হন। নীহাররঞ্জনের সঙ্গে তিনি যেমন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কাজ করেছেন তেমনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেও তাঁরা একযোগে কাজ করেছেন।

প্রমীলচন্দ্র ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ছিলেন। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত তিনি পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি তখন ত্রৈমাসিক ছিল এবং তিনিই ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৬ সালে কাঁথিতে অনুষ্ঠিত দশম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের তিনি মূল সভাপতি ছিলেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় যখন পরিষদের কর্মসচিব ছিলেন তখন প্রমীলচন্দ্র ছিলেন এর সহকারী কর্মসচিব। প্রমীলচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে সেই ১৯৩৩ সাল থেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হন। অবসর গ্রহণের পরেও তিনি অনেকদিন পর্যন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি পরিষদে এসেছেন। বহুদিন পর্যন্ত তিনি পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রমীলচন্দ্র দীর্ঘদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মরত ছিলেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের পরে বিশ্বনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় লাইব্রেরীয়ান হন ১৯৪৪ সালে এবং প্রমীলচন্দ্র ঐ সময়ে ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান হন। ১৯১২ সালে তিনি বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে লাইব্রেরীয়ান হন। অবশ্য তার পূর্বে কিছুকাল তিনি অস্থায়ী ভাবে ঐ পদে কাজ করেন। ১৯৬৭ সালে ৩১শে ডিসেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

প্রমীলচন্দ্র যে সময়ে বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগার বৃত্তি গ্রহণ করেন সে সময়ে এ দেশে এই বৃত্তির আদৌ স্বীকৃতি ছিল না। এমন কি গ্রন্থাগারিককে একজন করণিকের চেয়েও কম বেতন দেওয়া হত। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বরোদা রাজ্যে ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মাদ্রাজে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের সামান্য আয়োজন ছিল। তেমন প্রয়োজন ছিল না বলে পঞ্জাবের শিক্ষক্রমটি দু বৎসরে একবার হত।

অবসর গ্রহণের প্রায় দুই বৎসর পর মধ্যম গ্রামে নিজ বাসভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক সাক্ষাৎকারী প্রতিনিধিদলের কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে তিনি তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা জানান। তাঁর এই জবাব থেকে তাঁর জীবনের অনেক কথা জানা যায়। এটি গ্রন্থাগার-এ ১৩৭৫ সালে আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাছাড়া 'ইস্তফা' নামে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ১৩১২ থেকে ১৩১৬ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত রচনায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা জানা যায়। যোগেশচন্দ্র বাগল ও অন্যান্যের আগ্রহে এগুলি মধ্যমগ্রামের সাহিত্য সংস্থা 'সাহিত্যিকা'র অনেকদিন ধরে পঠিত হয়েছিল।

প্রমীলচন্দ্র ১৯৩১ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি বই লেখেন এবং এটি প্রকাশ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এই 'গ্রন্থকার-নামা বইটি' (যেটি 'প্রমীল নামা' বলেই সমধিক প্রসিদ্ধ) বাংলা বইয়ের সূচীকরণে গ্রন্থকার নামের ক্ষেত্রে একটি বিজ্ঞান সম্মত পথ-নির্দেশ করেছে। এটি কাটার-মাফ' অনুসরণে বাংলা গ্রন্থকারদের নাম নিয়ে করা হয়েছে। সম্প্রতি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে। প্রমীলচন্দ্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। অন্যত্রও লিখেছেন। সেসবের হদিশ করা অল্প সময়ে সম্ভব নয়। তিনি গ্রন্থাগার পত্রিকায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে অথবা গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্ম করতে গিয়ে যেসব মনীষী ও সজ্জনের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের অনেকের কথাই যেমন, অনাথনাথ বসু, কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়, তিনকড়ি দত্ত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ সম্বন্ধে লিখেছেন। কর্মজীবনেও তিনি বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক, পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কেও লিখেছেন। এ ছাড়া বিপিনচন্দ্র পাল, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ গোড়ার যুগের গ্রন্থাগারিকদের কথাও লিখেছেন। কর্মজীবনে তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সহ বারোজন উপাচার্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এঁদের সম্পর্কেও তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন। অবশ্য গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী হিসেবে সম্পর্কের কথা। এ সকল কথা তিনি লিখেছেন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় 'ইস্তফা' নামে তাঁর ধারাবাহিক রচনায়। এ ছাড়া গ্রন্থাগার বিদ্যা ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে 'বাংলা সাময়িকপত্রে গ্রন্থাগারের কথা', 'সর্বজনীন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আইন' 'প্রাচীন এক সরকারী গ্রন্থাগারের কথা', 'মুদ্রিত গ্রন্থে বাংলা অক্ষর', 'লিখন পদ্ধতির উৎপত্তি' শতবর্ষের প্রাচীন এক গ্রন্থাগার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার), বোর্জোটা পাথরের কাহিনী ইত্যাদি নানা বিষয়ে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় লেখেন। তিনি বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত 'পাঠাগার', সে যুগের খ্যাতনামা পত্রিকা 'নবশক্তি' ও 'প্রবাসী'তেও গ্রন্থাগার বিষয়ে লিখেছেন। 'পাঠাগার' প্রকাশের প্রথম দিকে তিনি এর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

যোগেশচন্দ্র বাগল জীবনের শেষ পর্বে এসে নববারাকপুর উদ্বাস্তু পল্লীর অধিবাসী হয়েছিলেন। প্রমীলচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুবই প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি প্রায়ই দেখা করতে যেতেন। যোগেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতি রক্ষা কমিটি' উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও 'যোগেশচন্দ্র বাগল' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। প্রমীলচন্দ্র এতে 'পাদরী লঙ্ ও লঙ্ সাহেবের ক্যাটালগ' এই প্রবন্ধটি লেখেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতা প্রবর্তিত হলে তিনি এর প্রথম বক্তা ছিলেন। ১৯৭০ সালের ১৭ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে এই বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। এই বক্তৃতার শিরোনাম ছিল, 'বিংশ শতকের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বাঙালী গ্রন্থাগারিক'। বক্তৃতাটি ১৩৮১-৮২ সালের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়।

গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার পরিষদ সম্পর্কিত তাঁর লেখাগুলি খুবই মূল্যবান। তিনি এমনই এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁর সঙ্গে পরিষদের গোড়ারযুগের এবং তাঁর পরবর্তীযুগের সঙ্গে তিনি ছিলেন সেতুবন্ধ স্বরূপ। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর নিরপেক্ষ এবং বিশ্লেষণাত্মক বিচার এই আন্দোলনের সঠিক স্বরূপ জানতে সাহায্য করে। এ বিষয়ে তিনি আরও লিখবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু বয়সের ভারে ইদানিং তিনি আর বিশেষ কিছু লিখতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও কিছুদিন আগে রজনীকান্ত শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'গ্রন্থাগার'-এর রজনীকান্ত সংখ্যায় তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এলেও তিনি 'গ্রন্থাগার'-এর প্রতিটি সংখ্যা পড়তেন। চৈত্র ১৪০১ সংখ্যার 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশিত 'কথা প্রসঙ্গে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে' তাঁর সম্পর্কে কিছু মন্তব্য ছিল। ঐ লেখা পড়ে তিনি 'গ্রন্থাগার' সম্পাদককে একটি চিঠি লেখেন। 'একটি প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক ঐ চিঠিটি শ্রাবণ ১৪০২ সংখ্যায় ছাপা হয়। এই চিঠিই তাঁর জীবিতকালে 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশিত শেষ লেখা।

কর্মরত অবস্থায় তিনি একবার বিদেশেও গিয়েছিলেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এবং ভারত সরকারের শিক্ষাজগতের বিনিময়ের এক পরিকল্পনায় (Wheat Loan Programme) ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে তিনি আমেরিকা যান। সেখানে আধুনিক গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার বিবরণ পাওয়া যায় 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত আমেরিকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির মূল কারণ কি ?—এই প্রবন্ধে (ভাদ্র, ১৩৬২)। ১৯৫৫ সালে দেশে ফিরে আসার পথে তিনি লন্ডন, প্যারিস, জেনেভা, রোম, এথেন্স প্রভৃতি শহরে কয়েকদিন করে থাকেন। কলকাতায় ফিরে এলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। আর একবার ১৯৮৭ সালে কলকাতা বই মেলায়ও তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। এছাড়াও আরও কয়েকবার তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

শুধু লেখা লেখিতেই নয়, জীবনচর্যায়ও প্রমীলচন্দ্র ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। তিনি যেমন নম্র ও বিনয়ী ছিলেন, তেমনি ছিলেন সংকল্পে দৃঢ়চেতা। তিনি যেটা সঠিক বলে বুঝতেন তা থেকে তাঁকে নড়ানো যেত না। তিনি ছিলেন সৎ, নির্লোভি, আদর্শবাদী ও সমাজ-সচেতন। কোনরকম গোড়ামি তাঁর মধ্যে ছিলনা। নিজেকে জাহির করার কোন প্রচেষ্টাই তাঁর ছিল না। নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে সর্বদাই তিনি ছিলেন কুণ্ঠিত। প্রায় চার দশক ধরে তিনি গ্রন্থাগার পরিষদে যাওয়া-আসা করেছেন। কিন্তু তিনি যে কয়েক প্রজন্ম আগের মানুষ তা তাঁকে দেখে বা কথাবার্তায় বোঝার উপায় ছিল না।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী এবং মিতাহারী এবং অসাধারণ ছিল তাঁর বাক্ সংযম। তিনি অত্যন্ত অল্প কথার মানুষ ছিলেন এবং একজন নীরব কর্মী ছিলেন। তাঁর স্বল্পাহার দেখে অনেকে তাঁকে কৃপণ মনে করতেন। কিন্তু তিনি যে কৃপণ ছিলেন না তা অন্যদের খাওয়ানোর সময় বোঝা যেত। সম্ভবতঃ তাঁর দীর্ঘ জীবন লাভের মূলে রহস্যই ছিল তাঁর মিতাহার। তিনি বলতেন, 'কম করে খাও, তবে অনেকদিন খেতে পারবে।' তিনি নিয়মিত সকালে-বিকেলে ভ্রমণ করতেন। গ্রন্থাগার সম্মেলন যখন কলকাতার বাইরে যেতেন তখনো তাঁর এই অভ্যাস বজায় থাকত। ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত যে

অমায়িক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের তিনি প্রতিভূ ছিলেন, এ প্রজন্মে তাঁরা বিরল হয়ে এসেছেন।

প্রমীলচন্দ্র স্নেহ প্রবণ পিতা ছিলেন। বাইরে থেকে দেখতে তাকে খুব গম্ভীর মনে হত। তাঁর মুখে সাধারণত কখনো হাসি দেখা যেত না। কিন্তু যারা তাঁর অন্তরের পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁরা জানেন, তাঁর ছিল সংবেদনশীল একটি কোমল অন্তঃকরণ। রসবোধও তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাঁর লেখাও বেশ সাহিত্য গুণান্বিত ছিল।

পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী ছিলেন কিনা এটা জানার উপায় নেই। কিন্তু অসন্তোষের কোন ছাপ অবশ্য তাঁর মুখে কখনো দেখা যায় নি। তাঁর স্ত্রী দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। কয়েক বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কখনো-সখনো সভা-সমিতিতে উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্য উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে তাঁকে নিয়ে গেলেই তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হত। বয়স হয়ে গেলেও তাঁর ধীশক্তি অটুট ছিল। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কেউ তাঁর কাছে গেলে তিনি তাঁকে গ্রন্থাগার পরিষদের কথা পরিচিত লোকজনদের কথা জিজ্ঞেস করতেন। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ঐ বিভাগের অন্যান্য প্রাক্তন শিক্ষকদের সঙ্গে তিনিও এই উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা পান।

প্রমীলচন্দ্র তাঁর গৌরবোজ্জ্বল দীর্ঘ জীবন সমাপ্ত করে চলে গেলেন। তিনি পিছনে ফেলে রেখে গেছেন দুই পুত্র পুত্রবধূ ও পাঁচ কন্যা আর তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে। আর রেখে গেছেন তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ জনকে। তাঁরা কেউ ছিল তাঁর ছাত্র কেউ পরিষদের কর্মী কেউ বা বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মী। এই জগতের বাইরেও তাঁর গুণগ্রাহীর সংখ্যা কম ছিল না। মধ্যগ্রামের নিভৃত পরিবেশে পুত্র-পুত্রবধূ কন্যাদের সেবায় তাঁর বৃদ্ধ বয়স কাটছিল। যাঁরা প্রমীলচন্দ্রকে জানেন বা দেখেছেন এমনকি যাঁরা কেবলমাত্র তাঁর নাম শুনেছেন তাঁর স্মৃতি বহুদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে তাঁদের মনে। কেননা, প্রমীলচন্দ্র শুধুমাত্র একজন গ্রন্থাগারিকই ছিলেনা, তাঁর জীবন বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি অধ্যায়বিশেষ, একে ভুলে যাওয়া তো গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসকেই ভুলে যাওয়া হবে। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

সংস্কৃত পুঁথির সূচীকরণ (Cataloguing) সমস্যা

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও মিতালী চট্টোপাধ্যায়

রিডার, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭০০ ০৩২

সহ গ্রন্থাগারিক, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, পার্কস্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৬

প্রতিটি পুঁথি (হস্ত লিখিত গ্রন্থ) রহস্যে ভরা

পুঁথির সম্বন্ধে বলা যায় যে প্রত্যেকটি পুঁথি রহস্যে ভরা। অর্থাৎ আধুনিককালে পুঁথি যখন ছাপাখানার আনুকূল্যে মুদ্রিত গ্রন্থের রূপ নেয় তখন তা গ্রন্থাগারিকদের কাছে খুব একটা সমস্যা সৃষ্টি করে না। একটি গ্রন্থের আখ্যাপত্র থেকে মুদ্রিত গ্রন্থটির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এক একটি পুঁথি ভিন্ন ভিন্ন লিপিকারের লিখিত হওয়ায় আর প্রত্যেক লিপিকারের হস্তলিখনভঙ্গী ভিন্ন হওয়ায় প্রত্যেকটি পুঁথি (একই গ্রন্থের হলেও তা) সমান মনোযোগ ও সতর্কতা সহকারে সূচীকরণ করা উচিত।

কলকাতার পুঁথি সংগ্রহ

কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ, সাহিত্য পরিষদে ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে বহু সংস্কৃত পুঁথি সংরক্ষিত আছে। বিশ্বভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি সংরক্ষিত আছে। এই সব বিদ্যাংকেন্দ্রে পুঁথির সূচীকরণ করা হয়েছে।

সংলেখে পুঁথির বিবরণ অংশ : নির্দিষ্ট মানের অভাব

এশিয়াটিক সোসাইটীতে পুঁথির (হাতে লেখা গ্রন্থের) সূচীকরণের সময় (১) ক্রমিক সংখ্যা ; (২) ডাকসংখ্যা (Call No) ; (৩) বিষয় ; (৪) আখ্যা ; (৫) গ্রন্থকার (৬) টীকাকার ; (৭) উপাদান অর্থাৎ কিসের উপর লেখা হয়েছে (material) ; (৮) লিপি (script) ; (৯) (ক) সেন্টিমিটারে আয়তন (খ) পৃষ্ঠা (গ) পংক্তি সংখ্যা (number of line) ; (ঘ) বর্ণসংখ্যা (letter) ; (১০) বিবরণ (সমাপ্ত / অসমাপ্ত) ; (১১) অবস্থা (condition) ; (১২) তারিখ ; (১৩) আনুষঙ্গিক বিবরণ / মন্তব্য ইত্যাদি পুঁথির বিবরণ সংলেখে লেখা হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পুঁথিশালায় হাতে লেখা গ্রন্থের পরিগ্রহণ সংখ্যা (Accession No) ; (২) গ্রন্থকার ; (৩) আখ্যা ; (৪) মাপ ; (৫) উপাদান ; (৬) বিষয় ; (৭) টীকা ; (৮) পুষ্পিকা সূচীকরণের সময় লেখা হয়।

নির্দিষ্ট মানের প্রয়োজন

নানা গ্রন্থাগারে বা পুঁথিশালায় গবেষকদের সুবিধার্থে নানাভাবে সূচীকরণ করা হয়। কিন্তু অধুনা বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সূচীর নির্দিষ্ট মানের (standard) প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। গবেষকদের কাজের সুবিধার জন্য ক্রমশঃ গ্রন্থাগারে computer এর ব্যবহারও বাড়ছে। computer এর সহায়তায় এক গ্রন্থাগারের পুঁথি সংগ্রহের কথা গবেষকগণ অন্য গ্রন্থাগারে বসেই খোঁজ পেতে পারেন। কিন্তু তার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারে একটি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী তথ্যের সূচী দরকার। পূর্বে দেখা গেছে যে পণ্ডিত গবেষকরাই পুঁথির সূচীকরণ করতেন। পুঁথির সূচীকরণ করার জন্য অবশ্যই লিপি ও ভাষার ওপর দখল আবশ্যিক।

AACR 1988 ও পুঁথির সূচীকরণ

সূচীকরণের জন্য এ্যাংলো এমেরিকান ক্যাটালগিং রুলস বা এমেরিকান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ লাইব্রেরী, ক্যানডিয়ান কমিটি অন ক্যাটালগিং এর সম্মতি

ক্রমে লেখা হয়েছে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই AACR প্রদর্শিত নিয়মাবলীর সহায়তায় সূচীকরণ করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবহার করা সম্ভব।

AACR II, ISBD-এর (International Standard Bibliographic Description) হুবহু অনুসরণ।

AACR II কোডে যে নির্দিষ্ট মান অনুসারে বিবরণ করার কথা বলা হয়েছে সেই নিয়মগুলি এখানে আলোচিত হয়েছে। নির্দিষ্ট নিয়মের সংখ্যাও বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

সূচী তথ্য সংগ্রহ (4.0BI)

একটি পুঁথি থেকেই সেই পুঁথির প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। যদি কোনো তথ্য পুঁথি থেকে না পাওয়া যায় তাহলে ঐ পুঁথির কোনো অনুলিপি থাকলে বা মুদ্রিত গ্রন্থ থাকলে তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। নতুবা আকর গ্রন্থ (reference source) থেকে বা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

পুঁথির আখ্যা ও লেখক (4.1BI, 4.1F)

পুঁথির যদি আখ্যা না পাওয়া যায় তাহলে যে নামে পুঁথিটি সমধিক পরিচিত সেই আখ্যাটি লিখতে হবে। নতুবা বিষয় অনুযায়ী একটি নামকরণ করা যেতে পারে। পুঁথির আখ্যা অনেক সময় মঙ্গলাচরণের শেষে লেখা হয় আর সেখানেই পুঁথির লেখকের নাম ও থাকে আবার কোনো কোনো পুঁথিতে অধ্যায়ের শেষে পুষ্পিকায় লেখক ও আখ্যার উল্লেখ থাকে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে কোনো পুঁথিতে লেখক রহস্যের সাহায্যে তাঁর নাম উপস্থাপনা করেছেন। কোনো কোনো পুঁথিতে লেখকের নাম পাওয়া যায় না, যদি অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে লেখকের নাম পাওয়া যায়, তা সচীতে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পুঁথির লেখকের ও লিপিকারের লিখন সময় (4. 4B)

পুঁথির লেখকের লিখন সময় ও লিপিকারের লিখন সময় দুই-ই উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। এই লিখন সময় সংস্কৃত পুঁথিতে এক বিশেষ ঙঙ্গে, অননুকরণীয় ভঙ্গিমায় উল্লম্ফাপিত করা হয়েছে। সংখ্যাগুলি এইভাবে উল্লম্ফাপিত করা হয়েছে। ১=চন্দ্র বা পৃথিবী; ২=পক্ষ; ৩=নেত্র ৪=বেদ; ৫=বাণ; ৬=ঋতু; ৭=সমুদ্র; ৮=বসু; ৯=গ্রহ; ১০=দিক; ১১=রুদ্র; ১২=আদিত্য। আরও লক্ষণীয় সংখ্যাগুলি ডান থেকেই লেখা হয়। এর প্রমাণ 'অংকস্য বামা গতি'। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায়।

ন্যায়সূত্রবৃত্তিতে পাই 'বাণবেদসিতে শাকে সমুদ্রে চন্দ্রসংবৃতে' অর্থাৎ ১৭৪৫ শকাব্দ।

কৃষ্ণদাসতে "শাকে বহ্নিঋণবড়্বিধুসিতে=১৬৩১ শকাব্দ।

বাক্যতত্ত্বে 'ষড়ঙ্কবাণভূপাঙ্কে=১৫১৬ শকাব্দ।

আরও লক্ষণীয় যে সংস্কৃত লেখায় শকাব্দ ও কোনো কোনো জায়গায় বিক্রমাব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

যদিও কোন কোন পুঁথিতে এইভাবে লিখন সময় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অনেক পুঁথিতে কিন্তু যথাযথ সময়ই সাধারণভাবে লেখা হয়েছে। তিব্বত থেকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন দ্বারা সংগৃহীত পুঁথিতে পাল রাজাদের শাসনকালীন বংসর লিখিত আছে।

সময় অনুল্লিখিত হলে গবেষণার প্রয়োজন

যখন পুঁথিতে সময় উল্লিখিত না থাকে তখন পুঁথির আভ্যন্তরীন লিখনভঙ্গী বা বিষয়বস্তুতে উল্লিখিত কোনো কোনো ঘটনার বিশ্লেষণ দ্বারা সময় নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। এইভাবে সময় স্থির করা না গেলে অন্য পুঁথির আলোচিত পুঁথির উল্লেখ থাকলে সেই পুঁথির সময় দ্বারা এই পুঁথির সম্ভাব্য তারিখ স্থির করা যেতে পারে। পুঁথিতে উল্লিখিত ঘটনা দ্বারাও সম্ভাব্য তারিখ স্থির করা যেতে পারে। পুঁথিতে উল্লিখিত ঘটনা দ্বারাও সম্ভাব্য ন্যূনতম তারিখ স্থির করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারিখবিহীন পুঁথির লিখনকাল স্থির করার জন্য গবেষক পণ্ডিতদের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হয়।

পুঁথির পাতা (folio) ও পংক্তি সংখ্যা (4.5B)

পুঁথির পাতার (folio) সঙ্গে সঙ্গে পংক্তি সংখ্যা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেহেতু পুঁথির পাতার এক দিকে সংখ্যার উল্লেখ থাকে তাই (২) পৃঃ ১ পাতার বা (৫) পৃষ্ঠা ৩ পাতায় এইভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পুঁথির উপাদান (4. 5C)

পাতার সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পুঁথির উপাদান উল্লেখ করা হয়; ৩০ পাতাঃ তালপাতা / তুলট কাগজ / পুঁথিতে চিত্র থাকলে এই সঙ্গে উল্লেখ করা যায়; চিত্র (রঙীন)।

পুঁথির উচ্চতা, প্রস্থ ও চিত্রিত পাটার বিবরণ (4. 5D)

পুঁথির উচ্চতার উল্লেখের সময় প্রস্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ সাধারণতঃ পুঁথির উচ্চতার থেকে প্রস্থের মাপ বেশী হয়। পুঁথির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তা যদি চিত্রিত পাটার দ্বারা গ্রন্থিত হয় তা-ও বর্ণনা করা যেতে পারে।

টীকা (4. 7B)

টীকার (Note) পুঁথির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

প্রতিলিপির মূল লেখার পুঁথিশালার নাম (4. 7B1)

আলোচ্য পুঁথিটি যদি প্রতিলিপি হয় এবং এই পুঁথির মূল লেখার সংরক্ষণ স্থান বা পুঁথিশালার নাম জানা থাকে তাহলে তা সচীতে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উদাহরণঃ

পুঁথির (প্রতিলিপি) মূল লিপি ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট রক্ষিত।

ভাষা (4.7B2)

পুঁথির ভাষা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পুঁথির আখ্যার উৎস (4. 7B3)

যদি পুঁথিতে আখ্যা না পাওয়া যায় ও অন্য কোনো স্থান থেকে আখ্যা সচীতে লেখা হয় তবে তা টীকাতে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উদাহরণঃ

আখ্যাঃ গাইড টু ম্যানুস্ক্রিপ্ট কালেকসনস্ ইন দি এসিয়াটিক সোসাইটী লাইব্রেরী হইতে সংগৃহীত।

ভিন্ন আখ্যা (4. 7B4)

যদি পুঁথির আখ্যা ছাড়া অন্য কোনো আখ্যা জ্ঞাত থাকে তা সংলেখে উল্লেখ করা যায়। উদাহরণঃ

এই আখ্যাতেও পরিচিতঃ গাবাধরী।

দায়িত্বের বর্ণনা (4.7B6)

পুঁথিটি সনাক্তকরণ করার জন্য যদি কোনো ব্যক্তি বিশেষের অবদানের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় তবে সেই ব্যক্তির নামোল্লেখ করা প্রয়োজন। উদাহরণঃ

সংগ্রাহক রাজেন্দ্র লাল মিত্র।

দাতা, প্রাক্তন স্বত্বাধিকারীর নাম ও দানের সময় (4. 7B7)

পুঁথির দাতা বা প্রাক্তন স্বত্বাধিকারীর উল্লেখ করা যেতে পারে। পুঁথির দাতার নামোল্লেখের সঙ্গে পরিগ্রহণ সময় (year of accession) উল্লেখ করা যায়, স্বত্বাধিকারীর নামের সঙ্গেও সময় উল্লেখ করা যায়। যথাঃ

সচ্চিদানন্দের দান, ১৯৭৩।

'সরকার সংগ্রহ, থেকে ক্রীত হয়েছে, ১৯০১।

পুঁথি লেখার স্থান (4. 7B8)

পুঁথিতে যদি লেখার স্থানের কথা উল্লেখ থাকে তা উল্লেখ করা উচিত। পুঁথির কোন জায়গায় এই উল্লেখ পাওয়া যায়; তা-ও সচীতে লেখা যায়; যথাঃ পুঁথির শেষে উল্লেখিতঃ বর্ধমান।

প্রকাশিত পুঁথির তথ্য (4.7B9)

যদি পুঁথিটি প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে প্রকাশনার বিস্তৃত বিবরণ অর্থাৎ প্রকাশিত গ্রন্থের আখ্যা (title), প্রকাশনার স্থান, প্রকাশক ও প্রকাশনার সময় উল্লেখ করা উচিত। যদি পুঁথির বিষয়বস্তু অন্য কোনো গ্রন্থ বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার বিশদ বিবরণ দেওয়া উচিত। যথাঃ—প্রকাশিতঃ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রিকা, ৫৯ খণ্ড (১৯৪২), পৃঃ ২১৫-৩০৮।

পুঁথির বাহ্যিক বর্ণনা (4. 7B10)

পুঁথির আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যায়, যেমন : লাল কালিতে হলুদ পাতায় লেখা হয়েছে। ডান দিকের কোনার অংশ নেই। পুঁথিটি দু'ভাগে বিভক্ত ও জোড়া দেওয়া হয়েছে।

বিধিনিষেধ (4. 7B14)

গ্রন্থাগারে কোনো ব্যবহারের বিধিনিষেধ থাকলে টীকায় উল্লেখ করা যায়। যদি কোনো পুঁথির পাতা না পাওয়া যায় বা ছিন্ন বা খালি থাকে তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পুঁথি সম্পর্কিত প্রকাশিত তথ্য (4. 7B15)

পুঁথির পূর্ণ বিবরণ যদি কোনো জায়গায় প্রকাশিত হয়ে থাকে সূচীতে সেই প্রকাশিত তথ্যের হদিশ দেওয়া উচিত। যথা : বর্ণিত : ডেস্‌ক্রিপটিভ ক্যাটালগ অফ্ স্মৃতি ম্যানস্‌ক্রিপ্টস্, কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটী, ১৯৮৬।

সারাংশ (4. 7B17)

পুঁথির বিষয়কস্তুর সারাংশ সম্ভব হলে সূচীতে দেওয়া উচিত।

মঙ্গলাচরণ ও মূল গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশ (4. 7B23)

যদি পুঁথির আখ্যা না থাকে তাহলে যথাসম্ভব মঙ্গলাচরণ ও মূলগ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে—এইরূপ কোডে বলা হয়েছে, কিন্তু যেহেতু একই আখ্যার বিভিন্ন পুঁথি পাওয়া যায় সেহেতু সব পুঁথির ক্ষেত্রেই এই প্রারম্ভিক বর্ণনাবলীর বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক।

লিখনভঙ্গী/লিপি (4. 7B23)

পুঁথির লিপি সূচীতে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যথা :

দেবনাগরী লিপিতে লিখিত। সারদা লিপিতে লিখিত।

চিত্র (4. 7B23)

পুঁথির অলংকরণ, চিত্রন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা সূচীতে দেওয়া উচিত। যথা : পুঁথির পাতার মধ্যস্থলে তারাদেবীর রঙিন চিত্রন।

পুঁথিতে যদি উপাত্তে (margin) প্রাক্তন স্বত্বাধিকারীর টীকা, মন্তব্যাদি থাকে বা বাঁধাই সম্পর্কে কিছু মন্তব্য থাকে তা লেখা প্রয়োজন।

পুঁথির মাত্র একটি বা দুটি পাতার সূচীকরণ (4. 7B23)

কখনো যদি পুঁথির একটি বা দুটি মাত্র পাতা পাওয়া যায় তা-ও গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয়। তাই তারও সূচীকরণ করা কর্তব্য। সে সময় যদি আখ্যা চিহ্নিত করা না যায় তাহলে অচিহ্নিত (unidentified) এইরূপ লেখা হয় ও বিষয় উল্লেখ করা হয়। পুঁথির একটি পাতাও গবেষণার কাজে রহস্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ তাই পুঁথির রহস্যভেদ করে গবেষকের কাছে যথাযথ ও সম্পূর্ণ সূচীকরণের মাধ্যমে পুঁথি উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

পুঁথির সূচীকরণ ও আন্তর্জাতিক মান

এই লেখার মূল বক্তব্য হল যে বিভিন্ন পুঁথিশালায় যে বিভিন্নভাবে সূচীকরণ করা হচ্ছে তা বন্ধ করা উচিত ও আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সর্বত্র-ই একইভাবে সূচীকরনের নিয়মাবলী AACR II প্রকাশিত হওয়ায় এই code অনুযায়ী সূচীকরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পুঁথির ডাকসংখ্যা নির্মাণ

পুঁথির ক্ষেত্রে ডাকসংখ্যা (Call No) অবশ্যই অভিনব (unique) হওয়া প্রয়োজন কারণ মুদ্রিত গ্রন্থের যে কোনো একটি পেলেই গবেষকের কাজ সম্পন্ন হতে পারে কিন্তু পুঁথির বিশেষ অনুলিপি-ই গবেষকের প্রয়োজন হতে পারে। তাই মনে হয় পুঁথির ডাকসংখ্যা বিশিষ্ট করার জন্য প্রথমে তাকে বিষয় অনুযায়ী সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো প্রচলিত বর্গীকরণ রীতি অনুযায়ী ভাগ করা যেতে পারে, এছাড়া ভাষা ও লিপি-ও এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এর পরে আখ্যা যোগ করা যায়, কারণ অনেক সময় পুঁথির লেখক অজ্ঞাতপরিচয় হয়। এর পরে একই

আখ্যার একাধিক পুঁথির প্রতিলিপি থাকলে তা সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা প্রয়োজন।

যথা অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর একটি পুঁথির এইভাবে ডাকসংখ্যা করা যায়ঃ—

S 891·22 d a1

S = Sanskrit language = সংস্কৃত ভাষা

891·2 = সংস্কৃত সাহিত্য

891·22 = সংস্কৃত নাটক

d = দেবনাগরী লিপি

a = অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (আখ্যা)

1 = ১ নং পুঁথি।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

পুঁথি পরিচয়/পঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত—কলিকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৮-১৩৬৬-৪ খণ্ড

বাংলা একাডেমী পুঁথি পরিচয়-১/সংকলন ও সম্পাদনা সুকুমার বিশ্বাস—ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

নিবন্ধ

মৌসুমী দে

পুঁথির বর্ণনামূলক সূচীকরণের সমস্যাবলী ও তার সমাধানের উপায়। গবেষণা নি ন্ধ (এম· এল· আই· এস্) ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৯৪-৯৫ (অপ্রকাশিত)

রত্না বসু

পুঁথির বিবরণ কেন কি ভাবে— (দেখুন গ্রন্থাগার খণ্ড ৪৪, সংখ্যা ৭-১০, ১৪০১·

English

Asiatic Society, Calcutta

Descriptive catalogue of the Sanskrit manuscripts in the Government collection under the care of Royal Asiatic Society of Bengal prepared by Haraprasad Sastri—Calcutta : Asiatic Society, 1928-48.—10v.

Anglo-American Cataloguing Rules.-2nd ed, 1988 revision.—London : Library Association Publishing, 1988.

Bhattacharya, Asoke kumar

A corpus of dedicatory inscriptions from temples of West Bengal : ca, 1500 A. D. to ca. 1800 A. D.—Calcutta : Navana, 1982.

Mukhopadhyay, Bijayanath

Administration of manuscript libraries with special reference to Sanskrit—Calcutta. Firma K. L. M., 1985.

Seminar and Courses

Asiatic Society

Course on Manuscriptology—1st : 1995, 2nd : 1996

International Seminar on Manuscriptology (1994 3rd Jan.—9th Feb. Cairo) / organised by the Al—Furqah Islamic Heritage Foundation and Central Library Building of Cairo University.

Seminar on Management of Manuscripts (1st : 1996 Mar. 18 : Calcutta) / organised by the Golden Jubliee Celebration Committee, Department of Library Science, Calcutta University.

Seminar on Problems of Handling and Editing Manuscripts (1st : 1996 Apr. 23-24 : Calcutta) / organised by the Department of Sanskrit, Jadavpur University.

পড়ুয়া সমাজগঠনে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

বাণী চক্রবর্তী

গ্রন্থাগারিক, রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল

কোন দেশের জনগণের শিক্ষার উপরই প্রধানতঃ দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে। শিক্ষা বলতে সাধারণত দুরকমের শিক্ষা বোঝায়—(১) প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত।

পূর্বে শিক্ষা কেবলমাত্র পাঠ্য বই নির্ভর ছিল। কিন্তু এখন শিক্ষার পরিধি বিস্তার হয়ে প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাও অঙ্গীভূত হয়েছে। কারণ একটি অন্যের পরিপূরক।

একজন বিদ্যালয়ের ছাত্র বা ছাত্রী-প্রথাগতভাবে শিক্ষা পায় বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষের মাধ্যমে। কিন্তু সেই ছাত্র বা ছাত্রীটি আরও অনেক বেশী শিক্ষা পায় অন্যান্য বই বা অডিও ভিস্যুয়েলের সাহায্যে। সেজন্য বই পড়ার অভ্যাস যদি ছোটবেলা থেকে জাগিয়ে তোলা যায় তবে সেই অভ্যাস সুদৃঢ় হয়। কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন ঘটে। আর সেজন্য বড় বয়সে কোন কিছুর অভ্যাস করা কষ্টকর। স্বাভাবিক ভাবে এই বই পড়ার অভ্যাসকে বাড়াবার সুযোগ দিলে ক্রমে পড়ার নেশা জন্মায় এবং নিজেরা লিখতে পড়তে ও চিন্তা করতে শেখে। নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তুলতে পারে। সেজন্য এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হোল বিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র। ছাত্র ছাত্রীরা এখানে আসে কিছু তথ্য জানতে। আনন্দ পেতে বা উদ্বুদ্ধ হবার জন্য। সাধারণতঃ তিন ধরণের পাঠক আছে বিদ্যালয়ে (১) প্রাক প্রাথমিক থেকে ৩য় শ্রেণী, (২) নিম্নমাধ্যমিক (৪র্থ—৭ম) ও উচ্চ মাধ্যমিক (৮ম—১২শ) শ্রেণী।

প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুরা সাধারণত গ্রন্থাগারে বই পড়ে না। তারা পছন্দ করে ছবির বই, রঙীন পোস্টার ইত্যাদি। এদের থেকে একটু বড় হয়েছে অর্থাৎ নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠকেরা বই পড়ে আনন্দ পেতে শিখেছে তারা প্রধানত কমিকস্, পুরাণের গল্প, রূপকথা, ভূতের গল্প, এ্যাডভেঞ্চার, ছোট গোয়েন্দা গল্প পছন্দ করে।

আর এদের থেকে আরও বড় বিদ্যালয়ের উঁচু শ্রেণীতে যারা পড়ে তারা গোয়েন্দা, ভ্রমণ কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, জীবনী প্রভৃতি নানা ধরণের বই পছন্দ করে।

আমি একটি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদে দীর্ঘদিন আছি। সেজন্য পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের পঠন পাঠনের অভ্যাস ও তাদের মানসিক চাহিদার ব্যাপারে আমার যে ধরণের অভিজ্ঞতা ও ধারণা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই আজকের আলোচ্য বিষয়ে কিছু বলতে চাই।

আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পঠন পাঠনের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে (১) ৫ম—৭ম শ্রেণী (২) ৮ম ১০ শ্রেণী ও (৩) ১১শ—১২শ শ্রেণী এই তিন ভাগে পাঠককে ভাগ করেছি।

(১) ৫ম—৭ম শ্রেণীতে শতকরা ৭৫ ভাগ পাঠকেরা প্রধানত ছোট ছোট মজার গল্প, ভূতের, রূপকথা, খেলাধূলা, শিকার, বিপ্লবীদের জীবনী, অভিযান, গোয়েন্দা, তথ্য মূলক বই, ছোটদের পত্র-পত্রিকা পড়তে চায়। শতকরা ২০ ভাগ ছাত্রী বছরের শুরু থেকেই

সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত রেফারেন্স পাঠ্যবই অর্থাৎ যে গুলো নমুনা কপি হিসাবে পাবলিশার্স বিদ্যালয়ে পাঠায় সেগুলো চায়। মাঝে মধ্যে ২।৪ টে অন্যান্য বই পড়তে চায়। বাকী শতকরা ৫ ভাগ পাঠ্য বই ব্যতীত কিছুই পড়তে চায় না। পাঠাভ্যাস বাড়ানোর জন্য গ্রন্থাগারিক হিসাবে বাড়ীতে জোর করে বই দিলেও সম্পূর্ণ বইটি পড়তে ধৈর্য রাখতে পারে না। হয়ত পাঠ্যবইও খুব অনিচ্ছায় পড়ে।

(২) (৮—১০) শ্রেণীর ছাত্রীরা গল্প, উপন্যাস, গোয়েন্দা, এ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান, খেলা ধূলা বিষয়ক, অনুবাদ সাহিত্য, শিকার কাহিনী, জীবনী মূলক বই পড়ে আনন্দ পায়। এদের মধ্যে কিছু ছাত্রী রেফারেন্স পাঠ্য বই ও বিভিন্ন তথ্যমূলক বই মাঝে মাঝে চায়। কিন্তু কিছু ছাত্রী রেফারেন্স পাঠ্য ছাড়া গল্পের বই পড়তেই চায় না। বিশেষ করে যারা পাঠক্রমের পড়া শুনায় ঠিক তাল মিলিয়ে চলতে পারে না।

(৩) (১১শ—১২শ) অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রীরা লেখাপড়ার ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। কেবলমাত্র পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত রেফারেন্স পাঠ্য বই। কিছু যুক্তি নির্ভর, বিজ্ঞান বা পরিবেশ বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় উৎসাহী—যেগুলো তাদের পাঠক্রমে সহায়ক।

শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্রীরা উপন্যাস, গল্প, সমালোচনা, কবিতা, বিজ্ঞাননির্ভর, জীবনীমূলক, ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় (মরণের পারে, কথামৃত, ভারতের সাধক, স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিপত্র ও লেখা অন্য বই), সাময়িক আলোড়নকারী বই। সাহিত্য, যুক্তি নির্ভর সব ধরণের বই পছন্দ করে। আবার প্রয়োজনমত রেফারেন্স পাঠ্য বই নেয়। শতকরা ৫ ভাগ ছাত্রী গ্রন্থাগারে আসার প্রয়োজন অনুভব করে না কারণ এদের মধ্যে বেশীরভাগ সচ্ছল অভিভাবক সিলেবাসের প্রয়োজনীয় প্রচুর বই কিনে দেন। লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রীরা পাঠ্য বইটিকেই ভালভাবে অধীত করা ব্যতীত অন্য বই পড়ার কথা চিন্তা করে না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা এবং ছাত্রীরা দৈনন্দিন প্রয়োজনে অভিধান, বিভিন্ন বিষয়ে ইয়ার বুক, বিভিন্ন বিষয়ক পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি রেফারেন্স বুক ব্যবহার করে। এছাড়া বিভিন্ন বাৎসরিক অনুষ্ঠান—শিক্ষক দিবস, প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিবসে বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা বিষয়ক প্রদর্শনীর জন্য মহাপুরুষ, বিপ্লবীদের জীবনী, বিপ্লবের ইতিহাসের উপর সাময়িক প্রচুর চাহিদা থাকে। বন মহোৎসব, রবীন্দ্রজয়ন্তী, পুরুস্কার বিতরণী ইত্যাদি নানাবিধ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারীরা তাদের প্রয়োজন মত বই চায়। আবৃত্তি, প্রবন্ধ, কুইজ প্রতিযোগীতার বিদ্যালয়ে বা বিদ্যালয়ের বাইরে অংশ গ্রহণকালীন কিছু সাময়িক চাহিদা থাকে।

যে সকল ছাত্রীরা শুধুমাত্র সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত সহায়ক বইএর জন্য গ্রন্থাগারে আসে এবং যারা আসতে একেবারেই ইচ্ছুক নয়, তাদের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে এর কিছু কারণ জানতে পারি।

প্রধান কারণ সিলেবাসের বিরাট বোঝা। সেজন্য পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানোর ইঁদুর দৌড়ে ছাত্রীরা দিশাহারা হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক কর্মশিক্ষা বিষয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা স্তর থেকে অপসারিত হলেও ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যমান। এর জন্য সময় ব্যয় হয়। বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষকের কাছে পাঠ। বিভিন্ন কোচিং ক্লাসে পড়ার জন্য যাতায়াত। নানারকম বিশেষ গুণে যেমন—নাচ, গান, খেলা, আবৃত্তি ইত্যাদিতে শিক্ষিত হবার জন্য নানাবিধ চর্চা করার পর বই পড়ার জন্য অবসর পায় না। উপরন্তু শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মনে আর উৎসাহ থাকে না।

এই ব্যাপারে অনেক অভিভাবকের ভূমিকা কম নয় বলে জেনেছি। কিছু অভিভাবকেরা পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত কোন কিছু পড়ার অভ্যাসকে সময় নষ্ট বলে মনে করেন এবং সন্তানদের পাঠস্পৃহাকে অবদমিত করেন। অনেকে আবার আধুনিক গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি পড়া নৈতিক চরিত্র গঠনের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ধারণা পোষণ করেন।

শেষে আসি অডিওভিসুয়াল মাধ্যমের ব্যাপারে।

টিভি একটি আকর্ষণীয় বহু প্রচারিত জনপ্রিয় গণমাধ্যম। এর আকর্ষণ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক সময় পাঠাভ্যাসের ইচ্ছাকে বিরত করে। পড়াশুনা বাদে যেটুকু অবসর পায় সে সময়টুকু টিভি, টেপরেকর্ডার অধিকার করে, টিভিতে বেশীর ভাগ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হয়। টিভির মাধ্যমে তারা স্বদেশ-বিদেশের বহু ঘটনা তৎক্ষণাৎ দেখতে পায়। যেগুলো তারা তখনই বইয়ের সাহায্যে পাচ্ছে না। ফলে তাদের কাছে টিভির আকর্ষণ থাকেই। টিভিতে কোন বিখ্যাত গল্প উপন্যাসের চিত্ররূপ দেখা হয়ে গেলে বিদ্যালয়ের অনেক পড়ুয়া সে বইগুলো পড়তে আর আকর্ষণ বোধ করে না। তারা তাদের চাহিদা এভাবে টিভির মাধ্যমে অনায়াসে মিটিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। যদিও এটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে এর উল্টোটা অর্থাৎ আকর্ষণ বর্ধিত হয়।

এবারে আমি ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠস্পৃহা বাড়াতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে আসছি।

বিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র গ্রন্থাগারটিকে গ্রন্থাগারিকের সহায়তায় যথাযথভাবে ব্যবহারের উপযোগী ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তবে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যসব আকর্ষণ বাদ দিয়ে গ্রন্থাগারে আসবেই। মৌমাছি যেমন ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ফুলের কাছে আসে—

১) গ্রন্থাগারটি হওয়া চাই বড় এবং প্রচুর আলো-বাতাস যুক্ত।

২) আসবাবপত্রে রুচি থাকবে, যথেষ্ট সংখ্যায় থাকবে ও যথাযথ প্রয়োজন মেটাবে।

৩) খবরের কাগজের ক্লীপিং, বিভিন্ন পত্র পত্রিকা সাজিয়ে রাখার জন্য display বোর্ড।

৪) Open access পদ্ধতি। যেখানে পাঠকেরা পছন্দ মত বই নেড়ে চেড়ে দেখে বেছে নিতে পারবে। চুরি প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবজাত। তার ভয়ে ভীত হয়ে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে এই পদ্ধতির সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

৫) ক্যাটালগ দেখতে শেখানো, আভিধান, ম্যাপ, টাইমটেবিল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বই-এর ব্যবহার শেখানো। বিদ্যালয়ে কর্মীর অভাবের জন্য নতুন বইয়ের স্ট্যাম্পমারা, লেবেল লাগানো, পুরানো বই ছোটখাটো মেরামত করা, নানাভাবে বই-এর যত্ন করা প্রভৃতি বিষয়ে যথাযথ গাইডেন্স শেখানো গেলে তারা উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দেয়। প্রধান কারণ হোল প্রচুর বইয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগের আকাঙ্ক্ষা।

৬) বইএর আলমারীগুলোতে বিষয় অনুসারে বইপত্র সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা।

৭) সপ্তাহে একটি করে পিরিয়ড গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট রাখা।

কমপক্ষে এই ন্যূনতম ব্যবস্থাগুলি বেশীর ভাগ সরকারী, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত, সরকার পোষিত ও ছোট বেসরকারী, বিদ্যালয়ে থাকে না।

এই অবস্থার জন্য বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার দায় কম নয়।

১) সরকারের বার্ষিক কোন রকমের আর্থিক অনুদান নেই ২) সরকার বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনা মাহিনায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে সমাজে সকল শ্রেণীর ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। খুবই ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু বাস্তবিক ন্যূনতম যে ফি নেওয়া হয় খেলা, ম্যাগাজিন, আলো ও গ্রন্থাগারের জন্য তা খুব কম। যেমন ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত গ্রন্থাগার ফি ৩ ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ৬ হিসাবে। এত সামান্য অর্থের সাহায্যে কোন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা যায় বলে আমি মনে করিনা।

উপরন্তু আমার বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ফান্ড থেকে শিক্ষিকাদের শিক্ষাদানের সাহায্যের জন্য সরকারী পুস্তকগুলি কিনে দিতে হয়। খবরের কাগজ ও এই ফান্ড থেকে কেনা হয়।

বিদ্যালয়ে ছোটদের জন্য ভাল ছাপায় চিত্তাকর্ষক বই

চাঁদা মত সরবরাহ করা যায় না তার দামের জন্য। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ঘন ঘন পাঠ্য সূচীর পরিবর্তন এক বিরাট সমস্যা। বইএর দাম যে হারে বাড়ছে সরকারী বাৎসরিক অনুদানের ব্যবস্থা না থাকলে ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকবে কিন্তু গ্রন্থ থাকবে না। কিছু ছাত্রকে বই দানে উৎসাহিত করে গ্রন্থাগারে বই পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু দানের উপর ভরসা করে গ্রন্থাগার চলে না। ভাল ম্যাপ, বিভিন্ন বিষয়ের চার্টের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ না করাই ভাল।

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বই বিমুখতার অন্যতম কারণ গ্রন্থাগারগুলির হতশ্রী অবস্থা কর্মীর অভাবে। ডঃ রঙ্গনাথনের পঞ্চম সূত্রে গ্রন্থাগার ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সূত্রটি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ক্রমেই অচল হয়ে পড়বে মনে করি।

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও পোষিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার-গুলিতে আছে একমাত্র কর্মী—গ্রন্থাগারিক। অথচ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। কর্মীর অভাবে আলমারী, সেলফ, বইপত্র সবকিছুই ধুলোয় মলিন। একমাত্র গ্রন্থাগারিককেই সব কাজ করতে হয়। এই অবস্থায় বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা আর কি ভাবে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট হবে।

এতদসত্ত্বেও আমার অভিজ্ঞতায় ছাত্রদের কাছে গ্রন্থাগার খুবই প্রিয়। তারা গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট পিরিয়ড ছাড়া একটু অবসর পেলেই বিশেষ করে ছোটরা বিভিন্ন প্রয়োজনে গ্রন্থাগারে চলে আসে। উঁচু শ্রেণীর ছাত্রীরা তাদের পড়াশোনার ব্যাপারে দুটো পিরিয়ডের ফাঁকে বা একটু অবসর সময়ে যে সংখ্যায় আগে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে তাদের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় না। আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের নিজ শ্রেণীতে ফিরে যেতে বলতে বাধ্য হতে হয়। এরমধ্যেই শিক্ষিকারাও বই ইস্যু করতে বা নানা বিষয়ের রেফারেন্সের জন্য গ্রন্থাগারে আসেন।

আমার সাহায্যকারীর অভাব দেখে কিছু উৎসাহী ছাত্রীরা বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতে চায় কিন্তু তাদের যথাযথ ভাবে গাইড করে কাজ করানোর সময় বা জ্ঞান দুয়েরই অভাব বোধ করি।

গ্রন্থাগারে বাজেটের ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের কোন ভূমিকা থাকে না। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের আয় ব্যয় হিসাব কোন মতেই গ্রন্থাগারিককে জানতে দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিকের কোন জিজ্ঞাসারও পরিষ্কার জবাব দেওয়া হয় না। সেজন্যে গ্রন্থাগারের ফি হিসাবে লক্ষ অপ্রতুল অর্থ যে বিদ্যালয়ের অন্য কোন খাতে ব্যয় হয়ে যায় কিনা তা গ্রন্থাগারিকের জানার কোন উপায় নেই।

এ বিষয়ে আমার সাজেশন হল সরকার এবং ডি· আই· গণের বিদ্যালয়ের উপর দৃঢ় ভাবে চাপ সৃষ্টি করা এবং লক্ষ্য রাখা যাতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা কোনভাবেই গ্রন্থাগার ফান্ডের অর্থ বিদ্যালয়ের অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যয় করতে না পারেন। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের মঙ্গলার্থে Directorate of School Libraries এর পদ সৃষ্টি করা।

আমি পড়ুয়া সমাজ গঠনে শিক্ষক, সরকার ও অভিভাবকের দায়িত্বের কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠদানের সময়ে ঐবিষয় সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক বইপত্তর হাতিল নিতে পারেন। গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মনোরম ভঙ্গিতে লিখিত বই শ্রেণীতে গিয়ে নিয়ে বইগুলোর বিষয় সংক্ষেপে জানাতে পারেন। যে বইগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠনে, ভাষা শিক্ষায়, আনন্দ পেতে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে সে ধরণের বই শ্রেণীতে পাঠ করে কিশোর-কিশোরীদের মনে আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেন।

আমাদের দেশে এখনও library Oriented শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় নি। সরকারী শিক্ষা বিভাগের এদিকে নজর দেওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের এমন পাঠক্রম করা যাতে শ্রেণীকক্ষের মাধ্যমে পাঠ্য বইয়ের পড়াশোনার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবহার আবশ্যিক হয়।

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট যে সময় অতিবাহিত করে তার চেয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে অনেক বেশী সময় ধরে পায়। সেজন্য এখনকার কর্মব্যস্ত অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের উপযুক্ত বইয়ের সঠিক নির্দেশ দান করে বই পড়ার প্রতি যথোচিত আকর্ষণ বাড়াতে সাহায্য করেন তবে ভবিষ্যতে সুন্দর পড়ুয়া সমাজ গড়ে উঠবে। তারা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে বলে আশা করি।

ENGLISH ABSTRACTS

Of Articles, editorials, etc.
Published in Granthagar
by Dr. Ratna Banerjee
Vol. 46, Nos. 3—4; 1996
Vol. 46, No. 3, June—July 1996

Editorial: PP. 1—2

Now UGC has sanctioned money for University libraries to take up the Inflibnet programme. Earlier DSIR sanctioned money for university and research libraries to get computers for information transfer through Calibnet programme. To achieve success in this modernisation programme, authorities should take initiative and library workers should work hard. The main objective of the Calibnet programme was to establish network with different library databases and thus to transfer information. But now they have changed their objective to information centre. Under the Inflibnet programme Jadavpur University has started work. Calcutta University and Burdwan University are on their way to get computers. Calcutta University is planning to Connect Central Library, Rajabazar and Ballygunge Science College through VSAT teleconnection. Jadavpur University is also heading for campus network. But the primary function of any network programme is database compilation which involves hard labour. University library service is a neglected area. The alloted budget for University library will prove it. Computer professionals think computerisation and welcoming the Internet will solve all library problems and any professor can easily take charge of any modern library. The librarian has no role to play in budget allotment or in the selection of workers and resources. Librarians and library workers should be united and work hard to improve library services.

What and why Information Society by Arun Ghosh PP. 3–8

Identifies five characteristics to define information society—technological, economical, professional, geographical and cultural. Modern society is dependent on information technology. Information is also considered as a product of the modern society. Most of the professionals are concerned with information. The concept of globalisation in economy has removed the geographical barrier. Satellite has helped to introduce modern telecommunication system. Television is also playing an important role in bringing about change in society persons connected with information society can be grouped as follows—information generators, information worker / manager, information technologists, information vender and information user. With the passage of time the role of information scientists is changing. Of course, the fundamental tasks of the information workers engaged in library system are remaining the same e.g. information selection, collection, analysis, arrangement, preservation and retrieval. The question may arise whether these fundamental tasks will undergo certain changes in an information society. One will have to wait for some time more to get a proper answer.

Libraries, Information Science and GATT Agreement by Prodosh Bagchi PP. 9—13

General Agreement on Trade and Tariff (GATT) was developed in 1948. Its different round discussions formulated various commercial policies. Its 8th round discussion has created difference of opinions. Inclusions of certain matters like Intellectual Property Rights etc. for which other international organisations like world Industrial Property Organisation (WIPO) are existing have created controversies. Under TRIPS Patent and Copyright Acts have changed certain restriction have been imposed on research work. Thus library activities may be affected.

"Bengali Book Classification" some thoughts By Dr. Kabita Mukhopadhyay PP. 14—17

Discuss the importance of Bangla Grantha Bargikaran developed by Prabhat Kumar Mukhopadhyay to accommodate subjects representing characteristics of India and Eastern countries. Numbers of these subjects were lacking in the most widely used classification schemes like Dewey Decimal Classification system. It also shows certain limitations of this Bangla Grantha Bargikaran and suggests revision and inclusion of certain methods like subject device in the Colon Classification system, Standard Subdivision, Period Subdivision, etc. to make space for complex subjects.

Vol, 46, No. 4 July—August 1996

Editorial PP. 1—2

West Bengal Government has constituted Pay Commission for government employees, school teachers, and others and pay Committee

for State Universities, Higher Secondary Council and Board of Secondary Education. The Bengal Library Association has prepared the memorenda to be Submitted to the Pay Commission and Committee discussing the matter with library workers of different organisations. The Association is trying their best to fulfil the demands of the library workers and the members of the Association should keep faith on the Association.

International Music Library Conference by Sishir Kumar Mukhopadhyay PP. 3—10

The 17th International Conference of Music Libraries and Documentation Centres was held in June 1993 in Denmark. Sri Sisir Kumar Mukhopadhyay the only representative from India attended the Conference and read the paper entitled 'The Source of Indian Music'. In this paper he narrated short history, nature of collection of 14 music libraries—12 Indian and 1 in USA and another in London. The application of computers has led us to the world of CDROM, multimedia, etc. Different types of music and life of musicians can be preserved for a long time on CDROM.

জেলা সংবাদ

মুর্শিদাবাদ

২২শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার চতুর্দশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসচিব কৃষ্ণপদ মজুমদার। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেতা ও গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক অরুণ কুমার রায় সম্মেলন উপলক্ষে "গ্রন্থাগার পরিষেবায় আধুনিক প্রযুক্তি" শীর্ষক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন। আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন নেতা শ্রী সুখেন্দু ধর। দ্বিতীয় পর্বে ডাঃ এস, এন, কুন্ডু, শ্রীমদনমোহন মন্ডল শ্রীব্রজদুলাল গোস্বামী এবং শ্রীমতী সবিতা চক্রবর্তীকে নিয়ে সভাপতি মন্ডলী গঠিত হয় এবং ১৩০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে শ্রীব্রজদুলাল গোস্বামীকে সভাপতি শ্রী মদনমোহন মন্ডলকে সম্পাদক শ্রীতপনকুমার ঘোষকে সহ সম্পাদক শ্রীসত্যব্রত রায়কে সহ সভাপতি এবং রতনকান্ত বিশ্বাসকে কোষাধ্যক্ষ করে সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ১১ জনের কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ডাঃ এস, এন, কুন্ডুকে উপদেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলন শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে নভেম্বর মাসের মধ্যে মহকুমাগুলিতে কনভেনশন করে মহকুমা কনভেনরদের আমন্ত্রিত হিসাবে জেলা কমিটিতে নেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে কান্দি ও বহরমপুর মহকুমার কনভেনশন হয়েছে। গ্রন্থাগার দিবসের আগেই জঙ্গীপুর ও লালবাগ মহকুমার কনভেনশন হবে।

প্রতিবেদক: **মদনমোহন মণ্ডল**

কোচবিহার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জেলা কমিটির উদ্যোগে বিগত ২৯।৭।৯৬ গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীনিমাই মালকে ১৪ দফা দাবী সনদ পেশ করা হয় এবং

পরিষদের জেলা কমিটির সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে জেলার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রী মহোদয়কে জেলার একটি স্পোর্টস গ্রন্থাগার ও সাহিত্য সভাকে সংকারী অনুমোদনের অনুরোধও জানান হয়। এ ছাড়া গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা, ডি. এল. ও অফিস নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করা, দীর্ঘদিন যাবত গ্রন্থাগার কর্মীদের দিয়ে ডি. এল. ও অফিসে কাজ বন্ধ করার দাবী জানান হয়।

• • •

বিগত ৩০।৭।৯৬ তাং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে গ্রন্থাগার পরিষেবা মন্ত্রী শ্রীনিমাই মালকে সম্বর্ধনা জানান হয় উত্তর বঙ্গ রাজ্যীয় গ্রন্থাগারে। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক রঞ্জন বক্সী, কর্মী সমিতির সম্পাদক গোপাল সরকার, দিবিজয় দে সরকার ও মনোজ রায়। সভায় ২৫২ জন গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার দরদী।

মন্ত্রীমহোদয় সভায় Pay Commission-এর বকেয়া অর্থ অতি দ্রুত প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

বর্দ্ধমান

গত ১লা নভেম্বর '৯৬ শুক্রবার বর্ধমানস্থিত কৃষ্ণসেবপুর দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগারের ৫ দিন ব্যাপী রজতজয়ন্তী বর্ষের সূচনা করেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রীনিমাই মাল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীনিমাই মাল। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনশিক্ষা প্রসার মন্ত্রী শ্রীমতি অঞ্জু কর। এন. এল সি সদস্য শ্রীদুলাল মণ্ডল। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রীসুকুমার মল্লিক ও স্থানীয় বিধায়ক শ্রীবীরেন ঘোষ। মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্মারক ব্যাজ ও পুষ্প প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

শুরুতেই প্রধান অতিথি গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল শঙ্খধ্বনি ও ব্যান্ডের বাজনার মধ্যে দিয়ে পাঠাগারের পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত হস্তশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীমতি অঞ্জু কর। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রীসুকুমার মল্লিক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

নাদনঘাট বিধানসভার সদস্য শ্রীবীরেন ঘোষ একটি স্মারক বৃক্ষরোপণ করেন। এরপর শ্রীনিমাই মাল গ্রন্থাগার ভবনের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

শ্রীমাল তাঁর বক্তব্যে গ্রন্থাগারকে টি ভি, ভি ডি ও'র কবল থেকে মুক্ত থাকার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান। জনশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীমতি কর নবসাক্ষরদের আরও বেশী করে গ্রন্থাগারে আনার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রীবীরেন ঘোষ, সুকুমার মল্লিক ও সুনীল মণ্ডল।

সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভা সমাপ্ত করেন গ্রন্থাগার সভাপতি শ্রীরাধাশ্যাম চক্রবর্তী। এরপর পাঠদিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ৫ই নভেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্মদিনে বৈকাল ৫টায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন কালনা মহকুমা শাসক। অবশেষে ৫ই নভেম্বর রাত্রি ১২-৩০ মিনিট আতসবাজী সহকারে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন শ্রীশ্যামাপ্রসাদ পাল চৌধুরী, সহ সভাপতি দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ।

প্রতিবেদক : অমিতাভ চক্রবর্তী

হাওড়া

পল্লীশ্রী পাঠাগারের উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর '৯৬ পাঠাগার কক্ষে পাঠাগারের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত পঞ্চানন বাড়ুই-এর এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র দে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন দিলীপ ঘোষাল, সুনীল ঘোষ, দীপঙ্কর পাত্র, শিবানী কোলে, বন্দনা পাল ও কৃষ্ণা দৈবা, প্রয়াত পঞ্চু বাড়ুই এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন, কালীপদ মণ্ডল, মধুর বাড়ুই, দেবেন সেনাপতি, ফটিকচন্দ্র সাউ ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্মৃতি চারণা করেন গজেন্দ্রনাথ মুখার্জী, বিমল সরকার, ফটিক চন্দ্র সাউ, প্রণবকান্তি মুখার্জী, কানাইলাল জানু, বিপিনবিহারী চ্যাটার্জী, ফটিকচন্দ্র পাল ও কালীপদ মণ্ডল। সকল বক্তা তাঁর সামাজিক কাজকর্ম, সংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা, সংগঠক ও অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারিক অশোককুমার দাস।

প্রতিবেদক : অশোককুমার দাস

Annual Subscription : Rs. 48·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 4·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 46 : No. 9 December 1996 January 1997

CONTENTS

PAGE

Editorial 1

Nirmalendu Mukhopadhyay
In memory of Pramilchandra Basu 3

Bijayapada Mukhopadhyay and Mitali Chattopadhyay
Problems of Cataloguing of Sanskrit Manuscripts 8

Bani Chakraborty
Role of School Libraries in forming Reader's Society 13

Dr. Ratna Banerjee
English Abstracts 17

District News 19

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014 Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005.
Editor : Arun Ray, Associate Editor : Nirmalya Ray

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ১• সম্পাদক : অরুণ রায়, সহযোগী সম্পাদক : নির্মালা রায় মাঘ, ১৪০৩

সূচী

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১

বন্ধুরঞ্জন সাহা

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থারের সমস্যা

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

অতীত ও বর্তমানের আলোয় গোকুলপাড়া সম্মেলন শহর গ্রন্থাগার ১৪

কথা প্রসঙ্গে ১৭

১৯৯৮-এর ইন্টারন্যাশনাল কেটালগিং কন্ফারেন্স ফর লাইব্রেরী

এ্যাসোসিয়েশনস্ এ্যাণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ (ইফ লা) সম্মেলন

English Abstracts

Circular of the University Grants Commission

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ১০, সম্পাদক : অরুণ রায় / সহযোগী সম্পাদক : নির্মাল্য রায়। মাঘ, ১৪০৩

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে কলিকাতা স্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারের নূতন ভবন (যার নাম হওয়ার কথা ভাষা ভবন) নির্মাণের কাজ অতিশয় মন্থর গতিতে চলছে।

প্রায় এক দশক আগে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বেশ কয়েক বৎসর পরে বাড়িটি তৈরী করার কাজ শুরু হলো। যাও বা শুরু হলো, তার অগ্রগতি এত মন্থর যে এই শতাব্দীতে এ শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই।

দেশের বৃহত্তম গ্রন্থাগার, যার বইএর সংখ্যা ২০ লক্ষাধিক, দেশের এবং বিদেশের গবেষকদের যেখানে নিয়মিত পঠন-পাঠনের জন্য আনাগোনা, সেই গ্রন্থাগারের অন্দর মহলে উঁকি দিলে এক নৈরাশ্যজনক অবস্থাই লক্ষ করা যায়।

যে গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যা ৭০০র বেশী থাকার কথা, অর্থাৎ sanctioned post, সেখানে ১৯০টি পদ ফাঁকা। অদূর ভবিষ্যতে আরও ২০/২৫ জন অবসর নেবেন। ২টি Principal Library Information Officer, দুটিই শূন্য, তার ভিতর ১টি প্রায় জন্ম লগ্ন থেকেই, অন্যটিও বৎসরাধিক কাল যাবৎ। পাঁচ জন ডেপুটি লাইব্রেরীয়ানের ভিতর তিনজন অবশিষ্ট, তার মধ্যে একজন আবার অ্যাডহক ভ্যাকান্সিতে। পনেরোটি সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ খালি। এ ছাড়াও তিনজন সহকারী গ্রন্থাগারিক এ মাসেই অবসর নেবেন, তাছাড়া ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন অবসর নিয়েছেন। এর কোন পদই পূরণ হয়নি। গ্রন্থাগারের সর্বস্তরের কর্মীদের পদই অনেক পরিমাণে ফাকা।

গ্রন্থাগারের পুরানো বাড়ি ঠিকভাবে সারাই হয় না। ছাদ চুঁইএ জল পড়ে। বই, আসবাব নষ্ট হয়। এই বাড়িটি ঐতিহাসিক কারণেও যথাযথ সংরক্ষণের দাবী রাখে।

গ্রন্থাগারের এনেক্স ভবন, ৯ তলা বাড়ি, বহু অর্থব্যয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করানো হলো। আজ প্রায় ১ বৎসর যাবত এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে আছে। এই ব্যবস্থা আবার চালু করতে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে যন্ত্রাংশ মেরামত করার জন্য। এই অহেতুক অপব্যয়ের কৈফিয়ত কে দেবে?

কেন্দ্রীয় সরকারী অনেক বরিষ্ঠ মহারথীরা তো হরদম বিদেশ ভ্রমণ করছেন। মনে হয় না তাঁরা কেউ অন্য দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্থা দেখেন। আমরা ২০ লক্ষ বই নিয়েই টালমাটাল, যে সমস্ত গ্রন্থাগার ২/৪ কোটি বইপত্র আছে তারা কিভাবে এগুলি চালান এটা একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ রাখছি সেই কর্তা ব্যক্তিদের কাছে।

আমরা ঠিক জানিনা এর পেছনে কার বা কাদের অদৃশ্য হাত কাজ করছে, অথবা অজ্ঞতা প্রসূত অনীহা, তবু মনে পড়ে ৭০-এর দশকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিল্লী পাঠানোর চেষ্টা চলেছিল আর সেই চেষ্টা বানচাল করা গিয়েছিল পাঠক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমবেত চেষ্টায়। আবার মনে হয় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ও সময় এসেছে জাতীয় গ্রন্থাগারের সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সমস্যা

রামকৃষ্ণ সাহা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

□ অবতরণিকা :

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের পরিষেবায় নিযুক্ত তার মধ্যে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগার হলো এমন একটি সর্বজনীন সংস্থা যেখানে যে কোন জ্ঞান পিপাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির প্রবেশাধিকার রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার যদিও শিক্ষক, ছাত্র, গবেষকদের পরিষেবার জন্য নিযুক্ত তা সত্ত্বেও সমাজের অন্যান্য অংশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করেন। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি সদস্যদের প্রয়োজনানুগ পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। পাঠক গ্রন্থাগার থেকে তার প্রার্থিত বই, পত্র-পত্রিকা পান না, এমন কি কোথায় সেগুলি পাওয়া যেতে পারে তার হদিশও পান না। ব্যর্থতার দায় তাই স্বাভাবিক কারণেই গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর বর্তাচ্ছে। কিন্তু কোন কোন কারণে গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবা আশানুরূপ নয় তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

ইদানীংকালে কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সর্বত্র গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার মূল চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সবে এই নতুন তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের গ্রন্থাগারগুলিতে উন্নত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে অনেক আগেই। তাই অনেকের আশা গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারার ও পরিষেবার উন্নতি ঘটবে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে গ্রন্থাগারের ব্যর্থতার দায় সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগারিকদের উপর বর্তাচ্ছে যদিও তাঁরা আংশিকভাবে দায়ী কিন্তু বিস্তারিত অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে ব্যর্থতার অধিকাংশে কারণই অন্যত্র নিহিত। আগামী দিনে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাফল্যের সঙ্গে তথ্য পরিষেবা দিতে গেলে কয়েকটি শর্ত পালন করা প্রয়োজন নচেৎ সমস্ত পরিশ্রম বিফলে যেতে পারে এ আশংকা রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ ও সেগুলি সংশোধনের পথ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

১ গ্রন্থাগারের সুনির্দিষ্ট নীতি :

গ্রন্থাগার মূলতঃ পরিচালিত হয় কয়েকটি মূলনীতি দ্বারা। মূলনীতি গুলি প্রখ্যাত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ এস আর রঙ্গনাথন ১৯৩৪ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র হিসাবে লিপিবদ্ধ করেন। সূত্রগুলি নিম্নরূপ—

১১ বই পড়ার জন্য—বার পরিষেবাগত কর্মধারা হলো সঠিক তথ্য সঠিক রূপে সঠিক ব্যবহারকারীদের সরবরাহ করা।

১২ প্রত্যেক পাঠকের জন্যই বই—যত ধরণের পাঠক বা তথ্য ব্যবহারকারী রয়েছেন: তাঁরা যাতে তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজন মোতাবেক বই বা তথ্য পান তার ব্যবস্থা করা এবং সেই মত পরিষেবা দেওয়া।

১৩ প্রত্যেক বইয়ের জন্য পাঠক অর্থাৎ প্রত্যেকটি বই যাতে পঠিত হয় তার ব্যবস্থা করা।

১৪ পাঠকের সময় বাঁচাও—অর্থাৎ পাঠক যাতে দ্রুত পরিষেবা পান তার ব্যবস্থা করা।

১৫ গ্রন্থাগার ক্রমবর্দ্ধনশীল জীবন্ত প্রতিষ্ঠান—যার মর্মার্থ হলো গ্রন্থাগার জীবন্ত বস্তুর মতোই আকৃতি ও প্রকৃতিতে বাড়বে সুতরাং ভবিষ্যতের চিন্তা মনে রেখে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

১৬ গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে এরূপ মহৎ উদ্দেশ্য, নীতি ও প্রকরণ থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসু পাঠক তার প্রয়োজনের সময় বই, পত্রাদি পান না। ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা ক্রমশঃ হতাশ হচ্ছেন। একদিকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে অন্যদিকে গ্রন্থাগারগুলি পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় গ্রন্থাগারগুলি যে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত সেই প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টিভঙ্গী, গ্রন্থাগার সম্পর্কিত উদ্দেশ্য, নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা কিছুই কোন স্তরে নির্ধারিত হয় নি। ফলে সেগুলি রূপায়ণের প্রশ্নও ছিল না বা এখনও নেই। আজকের দিনে গ্রন্থাগারগুলো মূলতঃ বাড়ীর রেফ্রিজারেটরের মতো এইদিকে ষ্ট্যাটাস সিম্বল অপরদিকে বস্তুগুলিকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা। এটার দিকে নজর পড়ে তখনই যখন ওটা বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া আরেকটি বিষয় যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো একশ্রেণীর শিক্ষকদের কাছে গ্রন্থাগার হলো অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্র।

২ গ্রন্থাগারের সুনির্দিষ্ট কর্মধারা :

অধিকাংশে মানুষ এমন কি শিক্ষিত মানুষের ধারণা যে গ্রন্থাগার শুধু বই, পত্র-পত্রিকা লেন-দেনের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এর মধ্যে তত্ত্বের বিষয় তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হলো ক্লাসরুমে শিক্ষক সংস্থা-ছাত্র সংবাদ, পরীক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার। স্বভাবতই গ্রন্থাগার কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয় না। কিন্তু আধুনিক যুগে অবস্থান বদলেছে। প্রতিযোগিতার যুগে একটা প্রয়োজনীয় তথ্য সময় মত না পেলে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির অবস্থা প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে। এটা বিশেষ করে দেখা দেয় যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী এমন কি সাময়িকভাবে হলেও তাদের ক্ষেত্রে। তাই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব এসে পড়েছে প্রত্যেক জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুসারে ব্যাপক ও সময়োচিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য তথ্যসামগ্রী ভিত্তিক পরিষেবা দেওয়া। এই পরিষেবার দ্বারাই পাঠকের জ্ঞান ও তথ্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই কাজ দুভাবে করা হয় প্রথমতঃ গ্রন্থাগারে যে বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মধ্যে নিহিত জ্ঞান ও তথ্যের সংগে পাঠকের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়া হলো কোটি কোটি বই, পত্র পত্রিকার মধ্যে কোথায় কি আছে তার হদিশ বলে দেওয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় দুটো কাজই অত্যন্ত কঠিন। কারণ গ্রন্থাগারের পাঠক বিভিন্ন রকম, এদের আচরণ, শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রয়োজন বিভিন্ন এবং ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। আর বইয়ের মধ্যে নিহিত জ্ঞান, তথ্য অসীম তার সঙ্গে পাঠকের মিলিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া কঠিনতম কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশের প্রণাসক, শিক্ষক, গবেষকদের অধিকাংশই পুরোনো সংস্থা নিয়ে বেচাকেনা করার ফলে গ্রন্থাগারের মর্যাদা রক্ষা করা তো দূরের কথা গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে অত্যন্ত খাটো করে দেখেন—ব্যতিক্রম অল্প কিছু ব্যক্তি।

কিন্তু বিশ্বের তথ্য ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে কারণ জ্ঞানের জগতে পরিবর্তন এত দ্রুতগতিতে ঘটছে এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা মুস্কিল। আজকের দিনে গ্রন্থাগার কোন বিচ্ছিন্ন সংস্থা নয়, সে পরিবেশ নির্ভর। বিশ্বের তথ্য পরিবেশে যে সব পরিবর্তনগুলি হয়েছে এবং তার দ্বারা গ্রন্থাগারগুলি কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা জানার ও বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এইসব পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে হলে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিস্তারিত নীতি ও পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। বিগত দিনের পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ—

২১ বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্য মাধ্যম :

মানুষ লিখতে শেখার আগে আঁকতে শিখেছিল। প্রথমে গুহার কন্দরে নিজের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে আঁকার মাধ্যমে। তারপর লিখতে শেখে, বর্ণলিপির

উদ্ভাবক হয়। পাথরের গায়ে ছবি আঁকা ও লেখা, তালের টালি তালপাতা গাছের ছাল, কাপড়, পশুর চামড়া, প্যাপিরাস, কাগজ প্রভৃতির মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে তথ্য সঞ্চালন করেছে। এই নানারূপের তথ্য মাধ্যম যেমন গ্রন্থাগারে আছে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে আবার মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর মুদ্রিত বই পত্র-পত্রিকা, থিসিস, রিপোর্ট, ষ্ট্যান্ডার্ড ও স্পেসিফিকেশন, নিউজলেটার, ম্যাপ ও এ্যাটলাস, চিঠিপত্র, সম্মেলন জাত নথি, চার্ট, ছবি, সারসংক্ষেপ ইত্যাদি আজকের দিনের যে কোন গ্রন্থাগারের মূল তথ্যবস্তু। মুদ্রিত বস্তু ছাড়াও বিশের দশকে ফটোগ্রাফিক প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী যেমন, ফোটোগ্রাফ, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিশ তার সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ড, ক্যাসেট, প্রভৃতির সঙ্গে সম্প্রতি এসে গেছে ভিডিও টেপ, কম্পিউটার টেপ, ডিস্ক, CD-ROM ইত্যাদি গ্রন্থাগারে আজকের অতি পরিচিত ও ব্যবহার্য বস্তু যা গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করতে হয় এবং ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। গ্রন্থাগারকে এই সব তথ্য সামগ্রীই ব্যবহার করে পরিষেবা দিতে হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আমাদের দেশের অধিকাংশ নীতি নির্ধারকরা এ সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করতে প্রস্তুত নন ফলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পোলিও রোগগ্রস্তের মত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্থানাভাব ও উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে হাজার হাজার বই, পত্র-পত্রিকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সে সম্পর্কে প্রশাসকরা নির্বিকার চিত্তে দায় দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কর্তব্যমুক্ত হচ্ছেন।

২.২ গবেষণার ধরণ ও ক্ষেত্রসীমার পরিবর্তন :

গত কয়েক শত বছরের বিজ্ঞান গবেষণার ধরণ যদি লক্ষ করা যায় তাহলে দেখা যাবে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। নিউটন, লাইবনিৎস, দেকার্তে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ছিলেন এবং বিভিন্ন বিদ্যাক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার ধরণও বদলেছে। একজন গবেষক একটা বিষয়ের অন্তর্গত অতি ক্ষুদ্র একটি ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা করেন ফলে তাঁর অন্য দিকে চিন্তা করার অবকাশ ও ক্ষমতা দুইয়েরই অভাব ঘটে থাকে। এর পাশাপাশি প্রয়োজনের তাগিদে Team Research, Multidisciplinary Research ও Mission Oriented Research হচ্ছে। একটা সমস্যা সমাধান করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতদের প্রয়োজন হচ্ছে। এই ধরণের গবেষণার প্রবণতা বাড়ার ফলে গবেষণার বিষয়গুলি একের সঙ্গে অপরে মিশে যাচ্ছে এবং গ্রন্থাগারে চাহিদার ধরণও বদলে যাচ্ছে। ঠিক এই কারণে গ্রন্থাগারে এসে একজন গবেষক যে ধরণের প্রশ্ন করেন বা জানতে চান বা একটা নির্দিষ্ট তথ্যসূত্রে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বিষয় ও তথ্যসূত্র থেকে সেগুলি সংগ্রহ করতে হয়। এইসব তথ্যসূত্র কখনই একটা গ্রন্থাগারে থাকে না থাকা সম্ভবও নয়। গবেষক যদি নিজে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন তাহলে তার গবেষণা দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং বহু তথ্যের সন্ধানই পাবেন না। এ জন্যই তথ্যসূত্র সন্ধান করার কাজ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে—এ বিষয়ে তাঁরাই যোগ্যব্যক্তি। দুঃখের বিষয় গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশই গবেষণাকে সাহায্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—বিশেষ করে এই রাজ্যে এই অবস্থা বেশি করে চোখে পড়ে।

২.৩ প্রযুক্তি পরিবর্তণের ধারা ও গতি :

সভ্যতার অগ্রগতির পিছনে প্রযুক্তি পরিবর্তনের অবদান অনেকটাই। প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও নতুন প্রযুক্তি নির্ভর গবেষণার ফলে নতুন নতুন গবেষণার দিগন্ত উন্মোচিত যেমন হচ্ছে তেমনি তার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে প্রযুক্তি দ্রুত বাতিল হয়ে যাচ্ছে আর নতুন প্রযুক্তির জন্ম ও ব্যবহারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এই সমস্ত গবেষণার ফলাফল পত্র-পত্রিকা, রিপোর্ট প্রকাশিত

হচ্ছে, সম্মেলনে উত্থাপিত হচ্ছে এবং আলোচিত হচ্ছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ গবেষকই এ সম্পর্কে তথ্য পান না।—কারণ সে রকম কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় নি। অনেক গবেষক তথ্য সম্পর্কে অতি উদাসীন এর ফলে আমাদের দেশের গবেষকরা তথ্যগতভাবে দুর্বল থেকে প্রতিযোগিতার অলিম্পিকে ঢুকতেই পারেন না। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এইসব শিক্ষক-গবেষক তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের দায়িত্বে আছেন—কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁরা অসাধারণভাবে নির্লিপ্ত।

২৫ তথ্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী :

'জ্ঞানই শক্তি' এ বক্তব্যের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু ইদানিং কালের অর্থনীতিবিদরা 'মানুষের তথ্য ব্যবহারের ক্ষমতা'কে অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করছেন—এর ফলে 'তথ্যের অর্থনীতি' নামে বিশেষ বিষয়ের জন্ম হয়েছে। সেই সূত্রে 'তথ্য হচ্ছে সম্পদ' এবং 'তথ্য হচ্ছে পণ্য'। সুতরাং বিনামূল্যে তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশঃ কমছে। বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে এগুলি GATT-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তথ্য সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের বাধানিষেধ আরোপিত হচ্ছে।—আগামীদিনে তা আরো বাড়বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলি বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত হলেও তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের যে কিছু করণীয় রয়েছে এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এই উপেক্ষার কারণ কি তা জানা নেই। এ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আশু প্রয়োজন নচেৎ প্রতিযোগিতার বাজারে কোনদিন আমরা ঢুকতেই পারবো না।

২৪ তথ্য বিস্ফোরণ ও গ্রন্থাগারে তার প্রভাব :

ইদানিংকালে Information explosion কথার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। এর অর্থ হলো প্রতিটি বিষয়ের বা discipline-এর প্রচণ্ড অগ্রগতি হচ্ছে এবং পরিমাণে বাড়ছে। কোন কোন বিষয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ ৩—৬ বছরে দ্বিগুণ হচ্ছে। এর পাশাপাশি দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা, বহুজাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা, আজ প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা ফলে গবেষণাগারে গবেষণার পরিমাণ ভয়ংকররকম বেড়ে গেছে—তাগিদ এসেছে হয় 'গবেষণাপত্র প্রকাশ করো নচেৎ উচ্ছন্নে যাও'। এর প্রভাবে দ্রুত গবেষণা হচ্ছে, দ্রুত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হচ্ছে—পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বাড়ছে—সম্মেলনের সংখ্যা বাড়ছে সেখানে নানা গবেষণাপত্র পেশ করা হচ্ছে। মুদ্রণজগৎ এর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ছে—ফলে পত্র-পত্রিকা মুদ্রণের পরিবর্তে প্রবন্ধাদি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সমস্ত মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যই গবেষকরা গ্রন্থাগারে চান—এবং গ্রন্থাগারের কাজের মধ্যে এগুলি সংগ্রহ করার দায়িত্ব এসে পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তথ্য সচেতনতার অভাব থাকার ফলে নীতি নির্ধারণের সময় গ্রন্থাগারের মধ্যে এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল তা উপেক্ষিত হয়েছে। তাই আজ গ্রন্থাগারগুলি যে পরিষেবা দেয় তা হলো বই লেন-দেন কেন্দ্রিক—তথ্য পরিষেবা নয়।

২৬ জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্যনীতি :

তথ্য পরিষেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি তথ্য নীতি নির্ধারণ করেছে কারণ প্রমাণিত হয়েছে প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার প্রধান কারণ হলো উন্নতমানের তথ্য ব্যবস্থা ও তথ্যের সঠিক ব্যবহার। Management Information system, Decision Support system, Business Intelligence প্রভৃতি পন্থা বহুজাতিক সংস্থাগুলি বহু পূর্বে গ্রহণ করেছে এবং এর পাশাপাশি নীতি গড়ে তুলেছে।

ঠিক একই রকম ভাবে তথ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলি জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্যনীতি প্রণয়ন করেছে। এর ফলে সেইসব দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার

ক্ষমতা বেড়েছে অনেক বেশি। আমেরিকার জাতীয় তথ্য নীতির প্রশ্নটি আসে ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্পুটনিক উৎক্ষেপণের পরেই। আমেরিকা দেখলো সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বহুগুণ এগিয়ে গেছে অতি অল্প সময়ে। তাদের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই অগ্রগতির চাবিকাঠি কোথায়। এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য Alvin Weinberg-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৬৩ সালে Science, Government and Information ; the Responsibilities of the Technical Community and the Government in the Transfer of Information বিষয়টিও রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজ্ঞারিতভাবে অনুসন্ধানের পরে দেখা যায় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান গবেষণার সাফল্যের পিছনে রয়েছে ঐ দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা। এর পর থেকেই আমেরিকা গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ঐ দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতির অঙ্গ হিসাবে সারা পৃথিবীতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তকের তা সে যে ভাষাতেই প্রকাশিত হোক না কেন তার একটি কপি আমেরিকায় রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। এই নীতি থেকে তারা আজও সরে আসেন নি। এদিকে ভারতবর্ষে প্রকাশিত বইয়ের কয়খানা জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা পড়ে এবং সেগুলি পাঠকের গোচরে আনার কি ব্যবস্থা রয়েছে তা আমরা সবাই জানি। এর ফলে ভারতবর্ষে প্রকাশিত বইয়ের ফটোকপি পাওয়ার জন্য আমেরিকার দ্বারস্থ হতে হবে।

শুধু আমেরিকা নয়, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশগুলিও জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য-নীতি প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারিকদের বহু আন্দোলন সত্ত্বেও এই কাজ করা যায় নি। আমরা স্ব-নির্ভরতার কথা বলি কিন্তু স্ব-নির্ভরতার এই অতি আবশ্যিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার মানসিকতার প্রমাণ দিতে পারিনি।

২৭ গ্যাট চুক্তির প্রভাব :

তথ্যকে পণ্য হিসাবে গ্রহণ ও জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতির প্রবর্তনের পর উন্নত দেশগুলি আন্তর্জাতিক তথ্য প্রবাহের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে আরম্ভ করে। বর্তমান অবস্থা হলো আমেরিকাসহ পাশ্চাত্য দেশগুলি তথা জগতেও ধনী এবং তথ্যের উপর পুরো আধিপত্য বজায় রেখেছে আর তৃতীয় দুনিয়া তথা জগতেও অতি গরীব যদিও ঐ সব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর কিন্তু যেগুলি ব্যবহার করার প্রযুক্তিগত ক্ষমতা তাদের নেই এবং আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলির উপর নির্ভরশীল। সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতে বিজ্ঞানীদের সংখ্যা বিচারে তৃতীয় হলেও কিন্তু তাঁরা পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত বই, পত্র-পত্রিকার উপর নির্ভরশীল। গ্যাট চুক্তির পরে দেখা গেল বৌদ্ধিক সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ আরো আঁটো হয়ে বসছে। আগামী দিনে আন্তর্জাতিক তথ্য প্রবাহের উপর ধনী দেশগুলির নিয়ন্ত্রণ বাড়তে বাধ্য। কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় রাখার প্রধান অস্ত্র তথ্য সম্পদের উপর আধিপত্য।

২৮ গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার :

১৯২০ সালের পর থেকে আমেরিকা ও ইউরোপের গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি দানা বাঁধতে থাকে। ঐ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মাইক্রোফিল্ম-এর ব্যবহার, তিরিশের দশক থেকে গ্রন্থাগারে মেকানাইজেশনের কাজ শুরু হয়। গ্রন্থাগারিকতা বিষয়ের অনুশীলনের পাশাপাশি ডকুমেন্টেশনের অবতারণা হয় বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে ২০ ও ৩০-এর দশকে এই বিষয়ের বিস্তৃতি লাভ করে। ডকুমেন্টেশনের মূল বিষয় হলো বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশে ডকুমেন্টেশনের কাজ শুরু হয় রাশিয়ার VINITI-র অনুকরণে পঞ্চাশের দশকে INSDOC-এর প্রতিষ্ঠার কাল থেকে। ভারতে ষাট সালে

রজনাথনের প্রচেষ্টায় ডকুমেন্টেশন শিক্ষা ও গবেষণার কাজ শুরু হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কম্পিউটারের জন্ম হয় এবং পঞ্চাশের দশকেই কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রসার লাভ করে এবং ঐ দশকেই গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ষাটের দশকে দেখা যায় কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্ট, বায়োলজিক্যাল এ্যবস্ট্রাক্ট, ইনডেক্স মেডিক্যাস প্রভৃতি আন্তর্জাতিক তথ্য পরিষেবা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়। আমেরিকার লকহীড এয়ার কর্পোরেশন কম্পিউটারে সমস্ত বইয়ের তালিকা প্রস্তুতির কাজে হাত দেয়। তাদের ডেটাবেস-এর নাম DIALOG। এই পরিষেবাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে on-line-এর মাধ্যমে আসে এবং এটিই পৃথিবীর বৃহত্তম বাণিজ্যিক ডেটাবেস। আজ প্রায় ৫০০০ ডেটাবেস তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে টেলি যোগাযোগের মাধ্যমে পরিষেবা দেয় অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে। আমাদের দেশে ডেটাবেস তৈরী করার বিষয়টি কোন স্তরে গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই ডেটাবেসগুলি মূলতঃ বই, পত্র-পত্রিকার তালিকা। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের লেখকের নাম, প্রবন্ধের নাম প্রকাশনার নাম নিয়েও ডেটাবেস বা তালিকা করা হয়। কোন কোন ডেটাবেস-এ সার-সংক্ষেপ থাকে কিন্তু মূল পাঠ্যবস্তু বা টেক্সট-এর জন্য পৃথক ব্যবস্থা—এর কিছু অংশ মুদ্রিত, ফিশ, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিশ, CD-ROM-এর পাওয়া যায়। একারণে আজকের দিনে গ্রন্থাগারের চেহারা ও পরিষেবা বদলাচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় ও গবেষণাগারের নিয়ামকরা এ সম্পর্কে বড়ই উদাসীন এবং পুরাণো ধ্যান ধারণা নিয়ে আঁকড়ে বসে আছেন।

৩ আমাদের অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা :

বহির্বিশ্বে গ্রন্থাগার ও তথ্য জগতে এরকম বিশাল পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের অবস্থান বিচার করলে এক হতাশা ব্যঞ্জক চিত্রই ফুটে ওঠে। বিগত কয়েক দশকে বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হলেও বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যার বিশ্বে তৃতীয় হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশে ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া আমাদের দেশ। গবেষকদের গবেষণার মান উন্নত না হওয়ার অন্য কারণ তাদের তথ্য ব্যবহার করার ক্ষমতা অনেক কম এবং তথ্য ব্যবস্থার দুর্বলতা। লক্ষ করে দেখা গেছে শুধু তথ্য ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে গবেষকের কাজের মান নিচু, গবেষণার সময় লাগে অনেক বেশি এবং তাঁদের নানা ধরণের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সত্ত্বেও তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে গবেষণার ফসল বিদেশের পত্রিকাতে প্রকাশের জন্য পাঠান তার একটা ভাল অংশ বাতিল হয়ে যায় তথ্যগত দুর্বলতার কারণে। একটা অংশ ফেরৎ আসে এই কারণে যে এর বিষয়বস্তু ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়ে গেছে। এর ফলে বহু পরিশ্রম বিফলে যাচ্ছে। এই সমস্ত গবেষকদের সততা ও পরিশ্রম প্রশংসার দাবী রাখে। এরা উন্নতমানের গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত বলেই এদের পরিশ্রম বহুলাংশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং গবেষণার উন্নতির জন্য প্রয়োজন হলো উন্নতমানের গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

আজকের দিনের গবেষকরা দুই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন। প্রথম সমস্যা হলো আপাত তথ্যের অভাব যার ফলে পুরো গবেষণাটাই অন্ধকারে ঢিল ছোড়া, সামাজিক গুরুত্বহীন বিষয়ে গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচন, অন্যান্য নেতিবাচক দিকে চলে যাওয়া, দ্বিতীয় সমস্যা হলো অতিরিক্ত তথ্যের সমস্যা—যাকে বলা যেতে পারে Information overload যা তার পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তবে তথ্যের কোন অভাব নেই। আসল সমস্যা হলো গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার দুর্বলতা যার ফলে বই, পত্র-পত্রিকা পাওয়া যায় না, গ্রন্থাগারে থাকলেও সেগুলি পাওয়া যায় না নানা কারণে—এমন কি কোথায় আছে তার হদিশ দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বর্তমানে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে যে প্রধান বিষয়সমূহ তা হলো বিদেশী প্রকাশনার উপর অতি নির্ভরতা, বই, পত্রাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অসচ্ছলতা, গ্রন্থাগার ও তথ্যনীতির অভাব, গ্রন্থাগারগুলির প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং গ্রন্থাগারগুলির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও সহযোগিতার অভাব—ইত্যাদি।

৩১ বিদেশী প্রকাশনার উপর অতি নির্ভরতা :

আমাদের দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনুশীলন ও গবেষণা সর্বাংশে পাশ্চাত্য তথা পরিষেবার উপর নির্ভরশীল। আবার মানবতত্ত্ব, শিল্প, সঙ্গীত, সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়ের গবেষণা দেশজ তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির প্রত্যেকে নিজস্ব Abstracting ও Indexing পরিষেবা রয়েছে। এ গুলি তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণার মূল ভিত্তি। এইসব দেশগুলি নিজেদের পরিষেবার মান বজায় রেখে অন্য দেশের পরিষেবা গ্রহণ করে আর আমাদের 'ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বা ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এ্যাবস্ট্রাকটে স্বল্প সংখ্যক প্রকাশনাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। INSDOC, NASSDOC জাতীয় DESIDOC, SENDOC প্রভৃতি সংস্থা গবেষণার ক্ষেত্রে ছাপ রাখতে পারছে না গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে। এই দুর্বলতার প্রধান কারণ হলো জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতির অভাব।

৩২ জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতির অভাব :

আমাদের দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার, জাতীয় মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ইনসডক, ডেসিডক, ন্যাসডক, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন, এ আই সি টি ই, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা বিভাগ, পরমাণু শক্তি কমিশন প্রভৃতি তথ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে তথ্য পরিষেবা দিচ্ছেন বা পরিষেবার জন্য বিনিয়োগ করছেন—কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে—একটা সুসংবদ্ধ নীতি না থাকার ফলে নানা সমস্যার উদ্রেক হচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোন জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্যনীতি গ্রহণ না করার ফলে সমগ্র দেশে একটা সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা গড়ে তোলা যায় নি।

বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা ক্ষেত্রগুলিরও একই অবস্থা। কোন নীতি নেই, লক্ষ্য নেই। যে কোন ভাবে গ্রন্থাগারের দরজাটা খোলা থাকলেই হলো। অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের স্থান সবার নীচে। এ রকম একটা পরিস্থিতি চলতে থাকলে গবেষণার ও পঠন পাঠনের অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

৩৩ তথ্যবস্তুর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি :

বিগত কয়েক বছরে বই, পত্র-পত্রিকার অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে গেছে টাকার অবমূল্যায়নের পর। যে হারে বই, পত্র-পত্রিকার দাম বেড়েছে সে হারে গ্রন্থাগারের জন্য অর্থবরাদ্দ বাড়ছে না। ফলে গ্রন্থাগারে বই, পত্র-পত্রিকা আসছে না বা কম আসছে। NISSAT-এর একটা হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৮৩ সালে ভারতে ২২০০০ বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকা আসতো, ১৯৯৩ সালে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯০০০। বর্তমান অবস্থা হচ্ছে সারা কলকাতায় বিগত বছরে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্ট কিনতে পারেনি অর্থাভাবে। অথচ রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণা চলে বহু গবেষণাগারেই। এই পরিস্থিতিতে গবেষকদের অবস্থা বা গবেষণার হাল কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

৩৪ আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা :

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রন্থাগারগুলির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা বা সহযোগিতার অভাব থাকায় প্রয়োজনীয় তথ্য থাকলেও গবেষকরা তা পান না। গ্রন্থাগারগুলি আর্থিক দুর্বলতার কারণে নিজস্ব গবেষকদের সমস্যা মেটাতে সক্ষম নন। অথচ আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার

ব্যবস্থা থাকলে বহু অর্থের সাশ্রয় হতো এবং সুপরিকল্পিতভাবে সুষম গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হত কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয় নি এবং সে বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না।

৩৫ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগারের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী :

রাজ্যে বর্তমান সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ সংখ্যার দিক থেকে দেখতে ভাল কিন্তু সে সংগ্রহ আধুনিকও নয় সুষমও নয়। এগুলি গড়ে উঠেছে খাপছাড়া ভাবে এর কারণ হলো কোনদিনই সুষম গ্রন্থ সংগ্রহ গড়ে তোলার প্রয়াস ছিল না।

১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে। পরবর্তীকালে কোঠারি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে প্রাঞ্জল বর্ণনা রেখেছেন। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের বক্তব্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে গ্রন্থাগারের ভূমিকা হলো দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মতো। গ্রন্থাগারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের ৬–১০% ব্যয় করা প্রয়োজন। বর্তমানে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রন্থাগারের জন্য ২–৩% ব্যয় করে। সব চাইতে বড় বিষয় হলো এ সম্পর্কে প্রশাসক মণ্ডলী চিন্তা করতে প্রস্তুত নন। ইদানীংকালে এক আধজন উপাচার্য ছাড়া পরিচালক-মণ্ডলীর অধিকাংশই গ্রন্থাগার বিমুখ। এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায় পরিকল্পনার কালে বা সম্পদ বণ্টনের সময়। গ্রন্থাগারগুলির উপর প্রথম নজর আসে আর্থিক বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের সময়। পত্র-পত্রিকার জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যয়িত হয় অন্য খাতে।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ এবং লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এরকম বক্তব্য এ পর্যন্ত শোনা যায় নি। ফলে গ্রন্থাগারগুলির সমন্বিত, সম্প্রসারণ ও পরিচালনার জন্য কোন সুসংহত প্রয়াস দেখা যায় না। এর ফলেই বই, পত্র-পত্রিকার সংগ্রহের সুষম বিকাশ ঘটেনি, পরিচালন ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে, কর্মী নিয়োগে শিথিলতা বা শূন্য পদ পূরণে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা গেছে। ছাত্র গবেষক শিক্ষকদের প্রয়োজনভিত্তিক তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলি তার প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। কর্মী নিয়োগে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে হাজার হাজার বই সূচীকরণ করা হয় নি, স্থায়ীভাবে হাজার হাজার বই পত্র-পত্রিকা মেঝেতে রাখা হয়েছে পুরাতন নিয়মাবলী যা দুই তিন যুগ পূর্বে রচিত তাই সম্বল করে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিষেবা দিচ্ছে। আর ব্যর্থতার সমস্ত দায় এসে পড়ছে গ্রন্থাগারিকের উপর, গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর।

৪১ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনাগত কাঠামো :

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার কমিটি আছে নীতি নির্ধারণের জন্য। এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিটির কাঠামো এক এক রকম। কিন্তু গ্রন্থাগার কমিটিগুলির অধিবেশনের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এমতাবস্থায় গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার মূল দায়িত্ব বর্তায় প্রধান গ্রন্থাগারিকের উপর। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির নীতি নির্ধারকদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সমস্যার মধ্যে বেশীমাত্রায় যুক্ত থাকতে বাধ্য হন এবং গ্রন্থাগারের প্রতি উপেক্ষার মনোভাব রয়েছে, এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভাল মন্দের অনেকটাই নির্ভর করে গ্রন্থাগারিকের মানসিকতা, উদ্যম নিষ্ঠা ও কর্তব্য-পরায়ণতার উপর। আর সাফল্য আসে কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং সহকর্মীদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও সহযোগিতার উপর। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় গুলির গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা মূলতঃ স্টোর কিপারের। দীর্ঘ-মেয়াদী, স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা মাফিক সম্পদ আহরণের

ক্ষেত্রে তাঁর কোন ভূমিকা নেই। তার দায়িত্ব আছে, কিন্তু কর্তৃত্ব ও সম্পদ নেই। ফলে গ্রন্থাগারগুলির আভ্যন্তরীণ কাঠামো ক্রমশঃ শিথিলতর হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রন্থাগারিকের শূন্য পদ পূরণে শিথিলতা। এ রকম একটা নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থ তেও গ্রন্থাগারগুলি যে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে এটাই আশ্চর্যের বিষয়।

৪২ প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো :

রাজ্যের সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। অন্যান্য রাজ্যে বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, দিল্লী, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের গ্রন্থাগারে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে সত্তরের দশকেই। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনও বিষাদগ্রস্ত। গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের অন্যতম বাধা কর্মীদের এ সম্পর্কে অনীহা এবং কর্তৃপক্ষের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব।

৪৩ পাঠকের গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ :

একটা বড় গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে গেলে খানিকটা সেই গ্রন্থাগার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন নচেৎ গ্রন্থাগারে কোন সম্পদ আছে এবং কোথায় আছে সে সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয় না এবং বই পত্র গ্রন্থাগারে থাকলেও পাওয়া যায় না। সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে এটা সব দেশে বড় বড় গ্রন্থাগারেই ঘটছে। এই সমস্যা দূর করার জন্য পাঠক-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয় আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলিতে। কিন্তু আমাদের দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই পাঠকের গ্রন্থাগার ব্যবহার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল না, এখনও নেই। অথচ এই পরিষেবা একটি অতি আবশ্যিক কার্যক্রম। ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে শেখা, তথ্য সূত্র ব্যবহার করতে শেখার উপর গ্রন্থাগারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার না থাকা, মহাবিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে না শেখার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ছাত্ররা ক্যাটলগ দেখতে পারেন না, কার্ড ছিড়ে দেন। গবেষকরা তাদের বিষয়ের তথ্যসূত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং তথ্যসূত্র থেকে তথ্য আহরণ করা, ও প্রণালীবদ্ধ করা সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ থাকেন। এর ফলে গ্রন্থাগারে বই থাকলেও সেগুলি হাতে পান না বা তথ্যসূত্র সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন না। গ্রন্থাগারের ব্যর্থতার এটাও অন্যতম কারণ।

৪৪ গ্রন্থাগারগুলির অতি পুরাতন নিয়মাবলী :

গ্রন্থাগারগুলির কর্মকাণ্ডের মান অনুন্নত থাকার অন্যতম কারণ হলো যে এগুলির নিয়মাবলী অতি পুরানো এবং অধিকাংশই কার্যকারিতা হারিয়েছে। এর সঙ্গে মাঝে মাঝে খাপছাড়াভাবে পরবর্তীকালে কিছু নিয়ম যুক্ত হয়েছে। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প সদস্যই আছেন (ছাত্র বাদে) যারা নিয়ম মেনে বই ফেরৎ দেন। এদের ক্ষেত্রে কোন শাস্তির ব্যবস্থা না থাকার ফলে হাজার হাজার বই দীর্ঘদিন যাবৎ বাইরে পড়ে থাকছে। এই বই যে সব সময় তারা ফেরৎ দিতে পারছেন তাও নয়। এ ভাবে অতি মূল্যবান সম্পদ গ্রন্থাগারের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই রাজ্যেই IIT, ISI প্রভৃতি সংস্থায় সকল সদস্যের ক্ষেত্রেই জরিমানা ব্যবস্থা চালু হওয়ার কারণে সবাই সময় মত বই, পত্র-পত্রিকা ফেরৎ দিচ্ছেন। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বই নিয়ে দুই বছর আটকে রাখার দৃষ্টান্তের সংখ্যা কম নয়। এই জরিমানার পরিমাণ এত কম যে জেরক্স করা থেকে তা সস্তা—ফলে তাঁরা সোজাসুজিই এই পন্থা গ্রহণ করেন।

এগুলি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ও অব্যবস্থার খণ্ডিত চিত্র মাত্র। অবস্থা এমন জরে পৌঁছেছে সেগুলি পর্যালোচনা করার জন্য রাজ্য সরকারের উচিৎ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটা কমিশন গঠন করা। এ

ধরনের কমিশন ইংলণ্ডে হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনও করেছে। তাদের সুপারিশগুলি আজও গুরুত্ব বহন করে।

৫ সমস্যা সমাধানের কয়েকটি সূত্র :

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা বিশ্লেষণ করলে যে সব প্রশ্ন আসে তার অনেকগুলিই বিবৃত করা হয়েছে। সমাধানের পথ খুঁজতে গেলে কাঠামোগত ও প্রক্রিয়াগত দুই ক্ষেত্রেই সমান দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন রয়েছে। এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়গুলি। যে যে বিষয়ে আশু দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ—

৫১ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার নীতি নির্ধারণ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতি নির্ধারিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের অবস্থান ও অগ্রাধিকারের বিষয় স্পষ্ট হবে। সুতরাং এটাই প্রাথমিক বিষয়।

৫২ বই, পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রীর সুষম সংগ্রহ গড়ে তোলা। একাজ করতে গেলে একটা ব্যবস্থাপনা চাই। আর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার অন্যতম শর্ত হচ্ছে স্ট্যাটুট সংশোধন—কারণ স্ট্যাটুটে গ্রন্থাগারিককে তথ্য সামগ্রী কেনার অধিকার দিয়েছে কিন্তু তার তথ্যসূত্র নির্বাচনের অধিকার খুবই সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে তার ভূমিকা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৫৩ সংগ্রহ রক্ষণাবেক্ষণ করা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থ সংগ্রহ খুবই বিশাল এবং মূল্যবান। এই সংগ্রহের বড় একটা অংশ পুরাতন পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্য বই, পত্র-পত্রিকার পূর্ণ। সেগুলি স্থানাভাবে, অযত্নে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেগুলিকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৫৪ গ্রন্থাগার ব্যবহার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হলে গ্রন্থাগার ব্যবহার বাড়বে।

৫৫ কর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রন্থাগার পরিষেবার অন্যতম শর্ত। গ্রন্থাগারগুলিতে স্বাভাবিক কারণেই বহু বয়স্ক গ্রন্থাগার কর্মী রয়েছেন যাঁদের বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। এঁরা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কিন্তু আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিষয়ে জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে এঁদের প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অংশের কর্মীদের সঙ্গে এঁদের মিলিয়ে দেখলে অসুবিধা হবে। বর্তমানে শিল্প জগতে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গেলে এদের প্রশিক্ষণের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধু একবার প্রশিক্ষণের বিষয় নয়—গ্রন্থাগারে প্রতিনিয়তই নতুন প্রযুক্তি আসছে এজন্য তাদের সে সম্পর্কে অবহিত করার জন্য মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তাঁদের উপযুক্ত বেতনদানের বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে আনা প্রয়োজন।

৫৬ আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা একটি অতি আবশ্যিক পদক্ষেপ। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস ও তথ্য সামগ্রীর মূল্যবাড়িক মূল্য বৃদ্ধির ফলে গ্রন্থাগারে এক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে কাজ চালাচ্ছে—নিজেদের মধ্যে কোন সহযোগিতার ব্যবস্থা নেই। এমন কি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে অপর একটি বিভাগীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতার অভাব রয়েছে।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পাশ্চাত্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে বহুদিন যাবৎ। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ষাটের দশক থেকে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়। আমাদের রাজ্যে কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে এই দশকে। বর্তমানে উন্নতমানের কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, ক্যম্পাস নেটওয়ার্কিং প্রভৃতির ব্যবহার শুরুর মুখে। সুতরাং এই বিষয়টি পৃথকভাবে বিবেচনার দাবী রাখে।

৬১ গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের পূর্বশর্ত :

পুরাতন গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি একটি জটিল প্রক্রিয়া। কারণ গ্রন্থাগারে কয়েকটি কম্পিউটার কিনলেই উন্নতমানের তথ্য পরিষেবা দেওয়া যায় না। নতুন গ্রন্থাগারে এ সমস্যা নেই। পুরাতন গ্রন্থাগারে কায়িক কর্ম সংস্কৃতি থেকে একটা উন্নতমানের স্বয়ংক্রিয় তথ্য সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাওয়া যেখানে অনেকাংশে যন্ত্র মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটা গবেষণা কেন্দ্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আর গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে তার যে তথ্য সম্পদ রয়েছে বা তার যে প্রযুক্তির ব্যবহার চলছে নতুন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গেলেই পুরানো সম্পদকে নতুন ভাবে ব্যবহারযোগ্য করে নিতে হয় নচেৎ গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা হারিয়ে যায়। একটা পুরাতন গ্রন্থাগারে হাজার হাজার বই পত্র-পত্রিকা আছে, তাদের সূচী আছে, বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে। নতুন কম্পিউটার ভিত্তিক প্রক্রিয়া চালু করতে গেলেই পুরাতন তথ্যগুলিকে কম্পিউটারে ঢোকাতে হবে। এই কাজ সম্পন্ন না হলে গ্রন্থাগার পরিষেবা দিতে পারবে না। যেহেতু গ্রন্থাগারের প্রক্রিয়ার অধিকাংশই লোকচক্ষুর অন্তরালে হয়ে থাকে এজন্য কর্তৃপক্ষ বা ব্যবহারকারীর কাছে এর গুরুত্ব অনুভূত হয় না। যাই হোক যে যে বিষয়ের উপর এর সাফল্য নির্ভর সেগুলি হলো নিম্নরূপ—

৬২ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিকল্পনা :

গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা একটি পরিশ্রম সাধ্য কাজ। এজন্য সঠিক পরিকল্পনা না থাকলে অর্থ ব্যয় হবে কিন্তু ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না। পরিকল্পনাকালে গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগারিক ও কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের পারস্পরিক ঐকান্তিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এই কাজ অসমাপ্ত রেখে গেলে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যা হয়েছে ক্যালিবনেট প্রকল্প। পরিকল্পনা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অধিকাংশ সদস্যের প্রয়োজনানুগ হওয়া প্রয়োজন। কারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা সকলের জন্য।

৬৩ পরিকল্পনামাফিক গ্রন্থাগার পুনর্গঠন :

ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে গ্রন্থাগারগুলির কাঠামো, প্রক্রিয়া ও পরিষেবা নানাভাবে, নানা কারণে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। তথা প্রযুক্তি যেহেতু উন্নত পরিষেবা দেওয়ার উপায় মাত্র এজন্য সমগ্র গ্রন্থাগারের কাঠামো, প্রক্রিয়াগুলি তথ্য প্রযুক্তি মাফিক ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে।

৬৪ ডেটাবেস প্রস্তুত করা ও ক্রয় করা :

গ্রন্থাগারে ডেটাবেসগুলি—অর্থাৎ বই পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সমস্ত ধরণের তথ্যবাহী সম্পদের নথি বা রেকর্ড গ্রন্থাগারের নিজস্ব ব্যবহৃত মান অনুসারে করা যায় না, আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনে একাজ করতে হয়। শুধু ডেটাবেস তৈরী নয় পাশাপাশি বাইরের ডেটাবেসগুলি কেনার বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে আনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ডেটাবেস তৈরী করার পরিকল্পনাকালেই সফটওয়্যার নির্বাচনের বিষয় ও ব্যবহারের বিষয় স্থির করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় গ্রন্থাগারের বিষয়টি জটিল হওয়ার কারণে এবং বাজারের আয়তন বেশি না হওয়ার কারণে ভালো, সফটওয়্যার বাজারে নেই। মনে রাখা প্রয়োজন ক্যালিবনেট প্রকল্পের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো, সফটওয়্যারের ব্যর্থতা। CMC-র মতো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানও এই কাজে সফলতা অর্জন করেনি। অথচ প্রচলিত কয়েকটি সফটওয়্যার দিয়ে বেশ ভাল কাজ হচ্ছে।

৬৫ নেটওয়ার্কিং ও নেট ওয়ার্কে অংশ গ্রহণ :

গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের অন্যতম প্রধান কারণ হলো নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ করা এবং অন-লাইনের মাধ্যমে অপর গ্রন্থাগারের ডেটাবেস এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যাবে যাতে অন্য গ্রন্থাগারে কি বই আছে তাৎক্ষণিক জানা যায়। সেই সঙ্গে অপর গ্রন্থাগার যাতে নিজের গ্রন্থাগারের

ডেটাবেস-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে তার সংযোগ দেওয়া। এখন ভারতবর্ষে কয়েকটি মেট্রোপলিটান নেটওয়ার্ক হয়েছে, এবং বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের ডেটাবেসের সংযোগ দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে খড়্গপুরের IIT ছাড়া অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অগ্রসর হতে পারে নি। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের (INTERNET) সঙ্গে সংযোগ রক্ষার বিষয় জড়িয়ে আছে অবশ্য শুল্কের বিনিময়ে।

৬৬ তথ্য ব্যবস্থার পরিচালনা ও আর্থিক সংস্থান :

গ্রন্থাগারের মতো একটি পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা একবার কম্পিউটারের মাধ্যমে চলে গেলে আর কায়িক প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়া যাবে না। এজন্য তথ্য ব্যবস্থার পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রয়োজন রয়েছে। এই ব্যক্তির অবশ্যই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য পরিষেবার এবং কম্পিউটার ব্যবহার বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা। বর্তমানে রাজ্যে এই ধরনের ব্যক্তির সংখ্যা অল্প। সুতরাং এই ধরনের কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থারও অভাব রয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ বিষয়। একটা গ্রন্থাগারের কয়েকটি কম্পিউটার কেনা আজ হয়ত কোন সমস্যা নয় কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক পরিষেবা বা ডিজিটাইজড লাইব্রেরী গড়ে তোলা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ ও পরিশ্রমসাধ্য বিষয়। সুতরাং এজন্য আর্থিক বরাদ্দের বিষয় বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। তবে এই সঙ্গে আরেকটি বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে তা হলো তথ্য প্রযুক্তির খরচ তোলার বিষয়। গ্রন্থাগার পরিষেবা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিঃশুল্ক—কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকারীদের আংশিকভাবে হলেও খরচের দায় বহনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে।

৭ উপসংহার :

একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পিছনে তথ্য সন্ধানের গুরুত্ব অসীম। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিচালকবর্গ এই বিষয় সম্পর্কে উদাসীন। ফলে গ্রন্থাগার তথা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবহেলিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান যেখানে উন্নতমানের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে সেখানেও একই চিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বরাদ্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গ্রন্থাগার খাতে ২—৩% ব্যয় করা হয়। এই রকম অবস্থার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্লাসরুম কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ, নোট ও পরীক্ষা কেন্দ্রিক পঠন-পাঠন ব্যবস্থা প্রায় একমাত্র প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য ব্যবহার করার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, উদ্ভাবনী শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, ছাত্রদের মধ্যে অসাধুতা বাড়ছে এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটাই ভেঙ্গে পড়ছে। এরই প্রভাবে তারা অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। ক্লাসরুম শিক্ষণের পাশাপাশি গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক পঠন পাঠনের ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্যই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করা একান্ত প্রয়োজন।

রাজ্যে বর্তমানে শিল্পায়নের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তার সঙ্গে তথ্য পরিকাঠামো সৃষ্টি করাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং বিবেচনার দাবী রাখে। মানব সম্পদ উন্নয়ন, উন্নতমানের শিল্পের জন্য উন্নতমানের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি আবশ্যিক শর্ত। গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাকে যদি আধুনিক জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে হয় তবে একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ভিত্তিক সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রাথমিক কর্তব্য। এই কর্মসূচী রূপায়ণে আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না, আড়ম্বর করি কাজ করি না' যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না 'যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না···' সুতরাং রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির বা রাজ্যের উন্নতির স্বার্থেই গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন চিন্তার প্রয়োজন হয়েছে। সময় হয়েছে নতুন খবর আনার।

অতীত ও বর্তমানের আলোয় গোন্দলপাড়া সম্মেলন শহর গ্রন্থাগার

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত, গ্রন্থাগারিক

পরাধীন ভারতবর্ষে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক—সর্ব বিষয়ে পরিবর্তনের যে প্রবাহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল হুগলী জেলা সেই পরিবর্তনে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এই জেলায় সাধারণ (formal) শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সার্বজনীন (informal) শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়।

গোন্দল পাড়া হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগরের একটি বর্ধিষ্ণু পল্লী। এই অঞ্চলের সংস্কৃতি বহুকালের উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে এই পল্লী স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই পল্লীটি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা শুরুর বহু আগেই প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার একটি পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। ইতিহাস থেকে জানা যায় এই অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ৬টি টোল ছিল। দেশ দেশান্তর থেকে জ্ঞানোপার্জনের জন্য বহু শিক্ষার্থী এখানে আসতেন।

পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটি ছিল বিপ্লবীদের বিশেষ পীঠস্থান। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই অঞ্চলের অবদান কিছু অংশে কম নয়। দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে ১৮৮০ সালে দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবী কয়েকজন যুবকের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে "গোন্দল পাড়া পাঠসমাজ।"

পরে ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বান্ধব সম্মিলনী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাবকত্বে। এঁরা দুজন ছিলেন যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক। এই প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার, ব্যায়াম ও নানাবিধ খেলার ব্যবস্থা ছিল। এই পাঠাগারে নিয়মিত 'সন্ধ্যা' 'স্বরাজ', ও 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা আসতো। এই সম্মেলনের মাধ্যমে পল্লী মধ্যে স্বদেশীভাব প্রচার হতে থাকে। সেই উদ্দেশ্যে চন্দননগর, তেলিনী পাড়া, ভদ্রেশ্বর ও বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থানে নানা সভা, মিছিল, রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন হয়। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নি যুগের বহু বিপ্লবী ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে ফরাসী চন্দননগরের এই অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিলেন। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বসন্ত ব্যানার্জী, সুশীলকুমার চক্রবর্তী, সতীন চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন ব্যানার্জী চারুচন্দ্র রায়, উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ডাঃ নগেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, তিনকড়ি মুখার্জী ও ভূধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন এই সম্মেলনীর মধ্যমণি। উপেন্দ্রনাথের সহপাঠী বিপ্লবী নেতা উত্তরপাড়া নিবাসী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সম্মিলনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। একনিষ্ঠ বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষের যোগাযোগ ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরাধীন ভারতবর্ষে এ পল্লীটিকে সন্ত্রাসবাদীদের অত্যন্ত বিপজ্জনক ঘাঁটি বলে মনে করা হোত। ইংরেজ পুলিস অফিসারের ভাষায় "Gondalpara is the worst place which is the seat of the anarchists" মানিকতলা বাগানে বোমা বানানোর ঘটনা ইংরেজ শাসকদের গোচরে আসার পর সম্মিলনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত আসে। অনেকজন সভ্য অন্তরীন

গুণ্ডায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

পরে কয়েকজন যুবকের প্রচেষ্টায় ১৯২০ সালে বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দামান থেকে মুক্তি পেয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর সম্বর্ধনার মহাষ্টমীর দিন কালিপ্রসন্ন বসু মহাশয়ের গৃহে গোন্দলপাড়া সম্মেলনের জন্ম হয়। এর পরে মরান রোডে একটি ভাঙ্গা ঘরে পাঠাগারটি স্থানান্তরিত করা হয়। বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, উষানাথ চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ চট্টোপাধ্যায় হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি উন্নত হতে থাকে। প্রথমাবস্থায় নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের গোপন অর্থ সাহায্যে ও সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় একটি নৈশ বিদ্যালয় এখানে খোলা হয়।

এ ছাড়া এডভোকেট যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অর্থ সাহায্যে ও উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেশ্বর শ্রীমানীর উদ্যোগে যোগেশবাবুর মাতার নামানুসারে এই অঞ্চলে কাশেশ্বরী পাঠশালা নামে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৩ সালে শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে গোন্দল পাড়া মরান রোডে অম্বিকা চরণ স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করেন। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ যজ্ঞেশ্বর শ্রীমানী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত এক ট্রাস্টী বোর্ডের হাতে এর পরিচালনা ভার অর্পিত হয়। এই স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়াত হরিহর শেঠ, জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নারায়ণ চন্দ্র দে রূপলাল নন্দী, যোগেন্দ্রনাথ শেঠ, দীনবন্ধু দাস ও আশুতোষ দাসের সাহায্য এবং স্মৃতি মন্দির উদ্বোধনের সময় তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় অন্তরীনে আবদ্ধ থাকলেও অমি ল্য সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৬ সালে ডাক্তার কালিদাস নাগ এই ভবন উদ্বোধন করেন এবং এই ভবনে "গোন্দল পাড়া সম্মেলন" একটি ঘরে তার পুস্তক চালনার অধিকার পায়। এখানে নিয়মিত পুস্তক পত্র পত্রিকা আদান প্রদান, বক্তৃতা, আলোচনা, সমাজসেবা, বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। ব্যায়াম শিক্ষা, হা ডু ডু খেলা, লাঠি খেলা প্রভৃতি নিয়মিত হোত। হাতে লেখা পত্রিকা 'অরুণ' 'পাষণ্ড পণ্ডিত' ও 'কিশোর' 'স্রোতের কূল' প্রভৃতি এই পুস্তকাগার থেকে প্রকাশিত হোত। সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ অনেক বই এই সম্মেলনে রাখা হয়েছিল। যুবকেরা প্রবন্ধ লিখতেন, দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃতি করতেন। উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। আজীবন রাজনীতি ও সাহিত্য অনুরাগী হওয়ায় নানা প্রসিদ্ধ দেশী বিদেশী বহু দুষ্প্রাপ্য সংবাদ পত্রাদি সংগ্রহ করার সুযোগ হয়েছিল। এই সংগ্রহটি একটি অমূল্য সম্পদ বলে তদানীন্তন Servants of Indian Society-র অন্যতম সদস্য গোখলে মহাশয় অভিহিত করেন। পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অমূল্য সংগ্রহের সঙ্গে আরো পুস্তক সম্ভার অম্বিকা-চরণ স্মৃতি মন্দিরে দান করেছিলেন।

অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল এই সম্মেলন গৃহে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মতিলাল রায় প্রমুখ।

কিন্তু যোগেশবাবুর মৃত্যুর পর এই সম্মেলনের বুকে নেমে আসে অন্ধকার। তাঁর পুত্র সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গোন্দল পাড়া সম্মেলনকে বর্তমান ভবনে পরিচালনা করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে এর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা করেন এবং এই মামলায় জয়ী হয়ে দখল নেওয়ার সময় পাঠাগারটি ধ্বংস হয়ে যায়। বহু অমূল্য পুস্তক সম্ভার নষ্টিপত্র নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সঞ্চিত গ্রন্থরাজির ধ্বংসের মধ্যে

দিয়েই বর্তমান পাঠাগারের প্রথম অধ্যায়ের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারটি অতি সামান্য পুরানো সংগ্রহকে সম্বল করে স্থান পায় ঐ এলাকার ৺ভূপালচন্দ্র সেনের পুত্রগণের বাসস্থানের একটি ঘরে। ৺ভূপালচন্দ্র সেনের পুত্রদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় গ্রন্থাগারটির পুরোন ঐতিহ্য সম্পদ নষ্ট হলেও অস্তিত্বটুকু বজায় থাকে।

এখানে কিছু দিন চলার পর গ্রন্থাগারের তৃতীয় পর্যায় বা বর্তমান রূপটি পাই বার প্রকাশ ১৯৮০ সালে।

এলাকার গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত অর্থে জমি ক্রয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণ পল্লীর মধ্যস্থলে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত রাস্তার উপকণ্ঠে। বহু বিপ্লবীর স্মৃতি বিজড়িত গ্রন্থাগারটি আবার চলতে শুরু করে নতুন উদ্যমে, নতুন জীবন নিয়ে।

১৯৮০ সালে এই গ্রন্থাগার ভবনের শিলান্যাস করেন তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায়। ১৯৮২ সালে প্রয়াত ভূপালচন্দ্র সেনের বাড়ী থেকে গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হয় এই নব নির্মিত ভবনে ৭ই ফেব্রুয়ারীর এক শুভ লগ্নে। যে বিপুল পুস্তক সম্ভার ছিল একদা এই গ্রন্থাগারের গর্ব তখন তার প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। তবুও মানুষের ভালবাসায় এই এলাকায় সংস্কৃতি মনস্ক মানুষের অভাব পূরণের জন্য গ্রন্থাগারের অস্তিত্বটুকু যে সংরক্ষণ করা গেল সেটাই আমাদের গর্ব।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থাগারটি শহর গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়েছে।

ক্রমশঃ বর্তমান গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি গ্রন্থাগারের গ্রন্থভাণ্ডারটিকে পাঠকের প্রয়োজনের যথাযোগ্য করে তুলতে এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারের সমস্ত নিয়মকানুন প্রচলন করে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থাগার গড়ে তোলার প্রয়াসে সর্বদাই সচেষ্ট আছেন। গ্রন্থাগারটিতে বর্তমানে পাঠকদের পরিষেবার জন্য একটি পুস্তক লেন দেন বিভাগ, নিঃশুল্ক শিশু বিভাগ ও পত্র-পত্রিকা পাঠের দপ্তর খোলা থাকে প্রতিদিন।

সম্প্রতি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে একটি পাঠ্য পুস্তক বিভাগ ও পাঠ্য পুস্তক সহায়ক বিভাগ শুরু করার। যেখানে আগ্রহী পাঠক পাঠকরা বসে পুস্তক পাঠ করতে সক্ষম হবেন।

যদিও এই সমস্ত বিভাগগুলিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য যে পরিমাণ সুযোগ থাকা দরকার তা নেই তবুও এই গ্রন্থাগার এগিয়ে চলতে চায় যেটুকু সম্বল আছে তাই নিয়েই। কারণ ভবিষ্যৎ পাঠক তৈরীর জন্য শিশু বিভাগ ও পাঠ্য পুস্তক বিভাগ সাধারণ গ্রন্থাগারে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। গ্রন্থাগারে প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে পাঠক সংখ্যা। বৃদ্ধি পাচ্ছে পুস্তক সম্ভার। বর্তমান পুস্তক সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বহু পত্র-পত্রিকা। আশা হৃত গৌরবের পুনরোদ্ধার নিশ্চয়ই সম্ভব হবে একদিন।

তাই গোঘলপাড়া সম্মেলন শহর গ্রন্থাগার নিয়মিত প্রয়োজনা করে চলেছে বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার ইত্যাদি।

আগামী বছর গ্রন্থাগারটি ৭৫ বৎসরে পদার্পণ করবে।

এই সুদীর্ঘ জীবনের বুকে যদি ঐ অসহায় অবস্থা না আসতো তা হলে এই গ্রন্থাগারের সম্ভার দিতে পারতো অনেক পাঠককে আরো অনেক আশার আলো। তাই ভবিষ্যতে এ গ্রন্থাগারগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাই হবে আজকের পাঠকদের পবিত্র শপথ।

কথা প্রসঙ্গে

(জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে)

আর একজন চলে গেলেন। তাঁকে আর একজন বলা হয়তো সঙ্গত হল না। কারণ তিনি অন্য কারো মত নন। তিনি ছিলেন গ্রন্থাগার জগতের এক দিক্‌পাল। অল্প কিছুকাল আগেই এই কলমে তাঁর সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখে। সে চিঠি গ্রন্থাগার পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। তখন ভাবা যায় নি এত শীঘ্রই তিনি চলে যাবেন। জন্মমৃত্যুর ব্যাপারে অবশ্য আমাদের হাত নেই। আর কার জন্ম কোন কুলে হবে এবং কখন মৃত্যু হবে কেউ বলতে পারে না।

প্রমীলচন্দ্র দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। অবসর জীবনের নিভৃত কোনে বহুকাল নিঃসঙ্গ ভাবে কাটাতে কাটাতে ভেবে ছিলেন, গ্রন্থাগার জগত আজ হয়তো তাঁকে ভুলেই গেছে। কিন্তু এমন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে কি গ্রন্থাগার জগত এত শীঘ্রই ভুলে যেতে পারে? তিনি যে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বর্ণাঢ্য জীবন পেছনে ফেলে রেখে গেলেন তা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা এ রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। তাঁর জীবনের পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় কেটেছে গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্যে। সুতরাং তাঁর জীবন তো সেই ইতিহাসেরই অংশ বিশেষ।

এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন এক অপূর্ব সৃষ্টি। তার চেয়েও আশ্চর্য মানুষের আছে একটি মন। সেই মন নিয়েই আমরা ভাবতে বসি জীবনের সার্থকতা ও অসার্থকতা কি? এক জন মানুষ জীবনে কি পেয়েছিল আর কি পায়নি তার বিচার করি। ভেবে দেখলে দেখা যাবে, জীবনে আমাদের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে থাকে অনেক ফাঁক এবং ফাঁকি। আমরা যা হতে চাই তা হয়তো হতে পারি না। যা হতে চাই না, তাই হয়তো হয়ে যাই।

সভ্য সমাজে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বড় একটা স্বাধীনতা নেই। নিজের জীবনকে নিজের মত করে গড়ে নেবার সাধ্য তার নেই। বাল্যকাল থেকেই তাকে অন্যের তত্ত্বাবধানে উঠে পড়ে লাগতে হয় ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে। লেখাপড়া শেখা থেকে আরম্ভ করে ভবিষ্যতে জীবিকার্জন এবং সংসার ধর্ম পালনের জন্য প্রস্তুত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অন্যান্য করণীয় কর্ম করতেই হয়। যদিও প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য থাকে সে লক্ষ্য পূরণ না হলেও তার জন্য চেষ্টা করে যেতে হয়। এটাই জীবন। কেউ কেউ বলেন জীবন সংগ্রাম।

জীবনে পূর্ণতা বোধ হয় কখনোই আসে না। ক্ষেপার পরশপাথর খোঁজার মত আমরা সবাই সারাজীবন পরশপাথর খুঁজে চলেছি অথচ জানিনা কোন সময় অলক্ষ্যে আমাদের হাতের মধ্য দিয়ে সেই পরশপাথর গলে চলে গেছে।

সাল তারিখের হিসাব ও কিছু তথ্য দিয়ে জীবনের সফলতার একটা হিসাব ঝাড়া করলেও দেখা যায়, এর বাহা। অন্তরের ইতিহাস আমরা পাই না। আসল মানুষটিকে তার মধ্যে কোথাও পাই না। জীবনে চলার পথে অনেককে আলোক করে চলতে হয়। অনেক আদর্শবাদী হয়ে যান আদর্শ ভ্রষ্ট। নির্লোভ ও সৎ মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় সাফল্য ও ধনদৌলত লাভে। সাফল্যের জন্য কাকে কি মূল্য দিতে হয়েছে আমরা দেখতে পাই না। যাকে আপাত দৃষ্টিতে আমরা সুখী ও পরিতৃপ্ত মানুষ বলে মনে করি দেখা যায়, আসলে সে বড় দুঃখী।

সাধারণত মহৎ লোকেদের অনুসরণ করে থাকে সাধারণ লোক। তিনি ধার্মিক নেতা হতে পারেন, সর্বভোলা আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী হতে পারেন হয়তো বা দেশপ্রেমী বা

কর্মধারা হতে পারেন। গীতা বলেছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ দেবেতরোজনাঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠজন যাহা করেন সাধারণ লোকে সেই কর্ম করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠজন যাহা প্রমাণ করিয়া দেন, সাধারণ জনও তাহা মানিয়া চলেন।

সুতরাং শ্রেষ্ঠজন হওয়ার দায়িত্ব অনেক। তাঁকে হতে হয় শ্রেষ্ঠজনের উপযুক্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর নেতৃত্ব দেশের মানুষ নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর মত নেতৃবৃন্দ তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন সব গুণাবলীর সমাবেশ হয়েছিল যে সাধারণ লোক তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রমীলচন্দ্র ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আহ্বানে অনেক মানুষ ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে সেরকম কোন গুণের সমাবেশ হয়েছিল যে জন্য মানুষ তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। এখানেই প্রমীলচন্দ্র ও অন্যান্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সফলতা। তাঁদের সম্বন্ধে বিচার করার সময় আমাদের সেই কথা মনে রেখে খুঁজে বার করতে হবে কী সে গুণাবলী যা দেখে তখন ঐ মানুষেরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

একথা মনে রাখতে হবে, তখনকার দিনের ও এখনকার দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য আছে। তখন গ্রন্থাগার আন্দোলনে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই চাকুরী সূত্রে এই আন্দোলনে যুক্ত হননি। ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বৃহত্তর স্বার্থেই তাঁরা তখন গ্রন্থাগার আন্দোলনে এসেছিলেন। অবশ্য প্রমীলচন্দ্রের সময়েই এই আন্দোলনে বৃদ্ধি ধারীর সংখ্যা অপেশাদারদের থেকে অনেকগুণে বেড়ে গিয়েছিল। প্রমীলচন্দ্র নিজে অবশ্য চাকুরীর মধ্য দিয়েই গ্রন্থাগার বৃত্তিতে এসেছেন। চাকুরীতে প্রবেশ করার আগেই তিনি বৃত্তিটিতে আগ্রহী হয়ে গ্রন্থাগার পরিষদে এসেছিলেন এবং অনতি বিলম্বেই গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ সমাপ্ত করে চাকুরীতে ঢোকেন। কিন্তু চাকুরীই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। এই বৃত্তির মধ্য দিয়ে সেবার সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সেই একই মনোভাব থেকে তিনি গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্ম করেছিলেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় এবং সুশীলকুমার ঘোষ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনকড়ি দত্ত সরাসরি জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও এর সমর্থক যে ছিলেন এটা অনুমান করা যায়। এই আন্দোলনে পরবর্তীকালে আসা প্রমীলচন্দ্রও এককালে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ঠিক কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কতখানি প্রভাব ছিল তা জানা না গেলেও ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনে যে প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং এরই ফলে বাঙলায় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনে সুশীলকুমার ঘোষ উদ্যোগী হন একথা সত্য। বাঙলায় বিপ্লববাদ ও গ্রন্থাগারের মধ্যেও যে একটা সংপর্ক ছিল একথাও নিশ্চয় করে বলা যায়। তবে নির্ভরযোগ্য পূর্ণ বিবরণ এক্ষেত্রেও পাওয়া যায় নি। গ্রন্থাগার আন্দোলনে যেসব মানুষ সেকালে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন অনেকেই বিপ্লবী ও স্বদেশী আন্দোলন, এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। এই সব মানুষ ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত, জমিদার, অভিজাত এবং ডাক্তার, উকিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশার লোক। দেশের অধিকাংশ লোক অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন না হওয়ায় তাঁরা এই আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। তখন এটা ছিল শিক্ষিত ভদ্রলোক ও উকিলদের আন্দোলন।

দেশে শিক্ষার বিস্তৃতিও স্বাক্ষরের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হলেও এখনও নিরক্ষরের সংখ্যা

কম নয় বলে গ্রন্থাগারকে আজও আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়নি। নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্ন এখনো সফল হয়নি। তাই বর্তমানের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের সেই প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।

১৯৯৬-এর ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনস এ্যাণ্ড ইনষ্টিটিউশনস (ইফ্‌লা) সম্মেলন

১৯৯৬ সালের ইফ্‌লা সম্মেলন চীনের রাজধানী বেজিং-এ ২৬শে আগষ্ট ৯৬ থেকে অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের ৯১টি দেশের মোট ২০৮৪ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহন করেন। মূল আলোচ্য ২৬৭টি লিখিত প্রবন্ধ ছাড়াও ১০টি প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ, ৪৩টি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ, ২৭টি জার্মান ভাষায় অনুবাদ, ২৬টি স্পানিস ভাষায় অনুবাদ ও ২১টি রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা প্রবন্ধ সম্মেলনে উপস্থাপিত হয়। ২৮৪টি সংস্থা সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলনের মূল বক্তব্য "পরিবর্তনের মোকাবেলাঃ গ্রন্থাগার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন" এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ্গ সমাজে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে "জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা আমাদের গ্রন্থাগার সমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করে। আমাদের সরকার ও সমাজ সামগ্রীকভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যাতে চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হয় তার প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।" সম্মেলন শুরুর পরে একদিন প্রভাতী সংবাদপত্রে অন্যতম প্রধান সংবাদ হিসাবে দেখা গেল ২০১০ সালের ভেতর চীনের সমস্ত সহরে গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে।"

উক্ত সম্মেলন উপলক্ষে সিলভার প্লাটার ও কানাডার জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রয়াসে "ইনফ্রানেট আনপ্লাগড" নামে একটি CDROM ডিস্ক প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক ফ্রেই জিয়াওটং তাঁর কি নোট ভাষণে বলেন "নূতন বিশ্বে গ্রন্থাগারিকরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্বের সম্মুখীন হবেন সেই সম্পর্কে "একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশ্ব বহুত্বের ভেতর ঐক্যের প্রাণের মধ্যেই থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এর চাবিকাঠি হলো বিরোধ অন্তরিত করার প্রয়াস যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য দূরীকরণে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বের গ্রন্থাগারিকদের সামনেই থাকছে সেই সুউচ্চ সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো তৈরী করার দায়িত্ব। এমন এক বিশ্বসমাজ গড়ে তুলতে হবে যেখানে মানুষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারবে।" ইফ্‌লা দৃঢ়ভাবে মনে করে গ্রন্থাগারিকদের এই লক্ষে পৌঁছাতে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে।

ইফ্‌লার সভাপতি রবার্ট ওয়েডওয়ার্থ চীন দেশের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সমিতিকে ও চীন দেশের সরকারকে তার আন্তরিক ধন্যবাদ জানান সফল ভাবে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানে সর্বাত্মক প্রয়াসের জন্য আর প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে যদিও চীন ১৯২৭ সালে ইফ্‌লার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে একটি দেশ, তবু চীনে এই প্রথমবার ইফ্‌লার

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এক কথায় যদি কেউ বেইজিং এ অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন সম্পর্কে মতামত দিতে চান তবে তাকে অভূতপূর্ব শব্দটিই বেছে নিতে হবে।

উক্ত সম্মেলন উপলক্ষে চীনদেশের ডাক বিভাগ ২৫শে আগষ্ট ১টি ফার্স্ট ডে কভার প্রকাশ করেন।

সংবাদ মাধ্যমগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ইফ্‌লা সম্মেলনের সংবাদ প্রচার করে। দি পিপল্‌স ডেলী কাগজ এক বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নূতন দীগন্ত আলিঙ্গন কর" এই শিরোনাম দিয়ে।

সেনইয়াং সহরের (লিয়াওনিং প্রদেশ) ডংমিং নামক একজন ৮ দিন যাবত সাইকেল চালিয়ে বেইজিং সহরে উপস্থিত হন ইফ্‌লা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য। পথে যে সমস্ত যায়গায় থেমেছেন, সেই সমস্ত জায়গাতেই তিনি গ্রন্থাগারিকদের দিয়ে তার সঙ্গের ইফ্‌লার ব্যানারটিতে সই করিয়ে নিয়েছেন। ইফ্‌লার সেক্রেটারী- জেনারেল লিও ভুগট তাঁকে বই কেনার জন্য অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

ইফ্‌লা তিনদিনের একটি সম্মেলন পূর্ববর্তী আলোচনাচক্রের আয়োজন করে টিয়েনজিনে। এই আলোচনা অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল বৈদ্যুতিক মাধ্যমের কপিরাইট। উক্ত আলোচনাচক্রের ফলশ্রুতি হিসাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়ঃ ইফ্‌লার দীর্ঘকালের অধ্যের অবাধ অধিগম্যতার দাবীর কথা মনে রেখে কপিরাইটের ক্ষেত্রেও বিশ্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা যাতে সমহারে ক্রমবর্ধমান বৈদ্যুতিক মাধ্যমের ব্যবহার করার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আগামী সালে (১৯৯৭) ইফ্‌লা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ডেনমার্কে।

সূত্রঃ ইফ্‌লা প্রেস রিলিজ, অক্টোবর, ১৯৯৬।

ভ্রম সংশোধন

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ১৪০৩ আশ্বিন সংখ্যায় হিন্দু স্কুলের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রমা চক্রবর্তীর জীবনাবসানের সংবাদ যে মুদ্রিত হয়েছে তাতে কয়েকটি তথ্য মুদ্রণ প্রমাদবশতঃ ভুল ছাপা হয়েছে। প্রকৃত সংবাদটি এইরূপ হবে, শ্রীমতী চক্রবর্তী ২৭ জুলাই, ১৯৯৬ সকাল ৫-১৫ মিনিটে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমরা তাঁর জীবনাবসানে শোকাহত।

ENGLISH ABSTRACTS

Of articles, editorials etc. Published in Granthagar

Vol. 46, No. 1—2 1996
Vol. 46. No. April—May 1996

Abstracts by : Dr. Ratna Banerjee

Children's section in Public Library—Editorial (PP. 1—3)

The Bengal Library Association has introduced an annual prize for the ideal Children's Library. This year no application has reached the Association as yet in response to the announcement. One of the important reasons is the scarcity of children's section in public libraries.

The percentage of the child and teenaged users of the library according to the survey report of West Bengal Library Directorate is O. 13% of the total population. According to the West Bengal Public Library Act children need not pay the charge for library use. The library worker should take up programmes to motivate the children to come to the library and thus to develop the future growth of libraries.

Information Today and Tomorrow. (PP. 4—8)

Information Today and Tomorrow, the Second International Seminar and the 4th National Seminar of CD Rom users was held during 21st to 24th December, 1995 at Calcutta Information Centre under the sponsorship of NISSAT and initiative of Bengal Library Association (BLA). The topics of discussion were, Information technology / Access Scenario, Information Market Scenario in India, Factual database, Private—Government Interaction, Access mechanism, Export import of information : media / news information, copyright issues, legal and judicial information, economic and financial information, and hospitality and tourism information. Information personnel from various government, quasi government, business organizations and autonomous bodies of India and abroad took part in the Seminar. It was inaugurated by the Minister-in-charge of Commerce and Industry of the government of West Bengal and welcome address was delivered by Dr. S. M. Gangopadhyay, the President of B. L. A. The valedictory session was presided over by prof. Probir RayChowdhury, the Vice President of BLA. An exhibition was also organised in which CMC Ltd., NISSAT, INSPOC and other organizations participated.

20th IASLIC Conference (PP. 10–11)

The 20th All India IASLIC Conference which was held during 26th–29th December, 1995 was hosted by the Department of Library Science, Lucknow University. The theme of the Conference was Information Technology Products of 1990s and Library and Information Centres. Six topics of the Special Interest Groups were–computer application, social science, humanities, informatics, library and information science education and industrial information. The recommendations of the Conference were as follaws—

1. Libraries and information centres of the country should give more stress on information technology in the organization and dissemination of information.

2. The inservice training programmes of library workers should include information technology.

3. IASLIC should try to form an expert committee which will decide the standard of computer based information flow.

4. To change the structure of information and to increase the improved demand for information, national information policy is to be formulated.

5. Information Resource Centre of the country should take necessary steps in this regard.

6. Based on available technology, CD-ROM databases are to be developed to provide information in the country.

Raigunge Subdivisional Library : a survey (PP. 12—15)

In 1974, a district library was established in Raigunge by the government of West Bengal. This library did not survive long due to its structural defects. In 1981 the library started its work in a rented house. In 9th January, 1984 the foundation stone of the library was laid by Smt Chhaya Bera, the then Library Minister. It received financial grants from various bodies like government of West Bengal, District Magistrate, Raigunge Corporation, District Social Education Directorate and District Development Planning Committee. In January, 1990 the new library building was inaugurated. The total number of members in the library at present is 1710. Membership fee per month is Rs. 12·00. The total number of books is 1943. The library also keeps newspapers and magazines. The library maintains both card and printed catalogue. This library also has a children's section which has 631 books and 2 magazines.

Vol. 46, No. 2 May-June 1996

Editorial. (PP. 1—2)

Most of the libraries in West Bengal are situated in buildings not built for libraries. Many public libraries were started by common men in residential buildings. Some public libraries under state and central governments are also not in buildings designed for libraries. The library building plan should be jointly made by the technical personnel and the

library workers who know the space requirements for various activities, otherwise proper functioning of libraries will be hampered. We should jointly discuss the matter with the state government and give guide lines for the design of library buildings which will come up in near future by the government.

Non use and non users of Public Libraries. Problems and Possibilities by Madhab Chandra Chatterjee (PP. 4—14)

Identifies four types of non-users in a public library—voluntary non-users, deprived users, absolute non-users and marginal users. There are other non-users of public library—like friends and other companions of users, library inspectors, past users and illiterate non-users and indirect users. Sometimes non-users are not aware of the importance of the use of the library or they lack the skill required to use the library. Complicated rules and regulations of the library, location of the library, illiteracy, libraries being closed on week-ends may keep users away. Also physically incapable persons cannot go to the libraries and sometimes people are unaware of the existence of the public library in their locality. The local people should be made aware of the role and importance of public libraries, arrangement should be made for users 'education' continuing education programme and post literacy programme. Public libraries should formulate a clear policy to provide services according to the local community needs.

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

No. F. 45-2.95(CU) 7th October, 1996

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Constitution of Second National Review committee for University and College Libraries in Higher Education—1996

The University Grants Commission has a scheme to provide financial assistance to the Universities and colleges for strengthening of their libraries during the 8th Plan Period. In addition to the normal Plan development for libraries, the Commission has also provided special grant to nine Central Universities and few selected state universites. In order to monitor the progress made by the institutions for strengthening the libraries during 8th Plan, the Commission has appointed Second National Review Committee for University and College Libraries in Higher Education—1996 consisting of the following experts :—

1.	Prof. M. K. R. Naidu, Consultant (Library) M. S. University of Baroda Station Road, Vadodara	Chairman
2.	Dr. Pramod Kumar, Director INFLIBNET, Opp. Gujarat University Guest House, Navrangpura, Ahmedabad-9	Member
3.	Dr. P. N. Kaula C-239, Indira Nagar, Lucknow-226016	Member
4.	Dr. Bhushan Lal, Librarian Indian Instt. of Technology Kanpur-16	Member
5.	Dr. (Mrs.) Maya Avasia, Librarian Tata Institute of Fundamental Research Dr. Homi Bhabha Road Colaba, Bombay-5	Member
6.	Shri Ashok Jambhekar, Librarian Indian Institute of Management Ahmedabad	Member
7.	Dr. Panday S. K. Sharma Librarian, UGC	Member Secretary

The terms of reference for the committee are as under :—

1. To assess the progress made and difficulties experienced in implementation during the VIIIth Plan Period. Interalia it may also focus on :

(i) position of vacancies in the libraries and difficulties arising therefrom and revision of UGC staff formula for University and College Libraries.

(ii) quality of services provided by the library and the number of hours per day and number of days the library is kept open year-wise.

(iii) quality and relevance of books, journals and other documents purchased/obtained by the library.

(iv) number of documents available, users and space available within the library in relation to size of the university and college.

(v) feedback on the relevance of the curricula in the Department of Library Science and keeping in view the implementation of C.D C. reports by the Library Science Departments and other short-term programmes for professionals and semi-professionals.

(vi) progress made in the process of computerization of libraries.

(vii) the extent of difficulties faced by the libraries due to rupee dollar conversion fluctuation.

2. To consider the perspective for the IXth Five Year Plan.

3. To suggest resource mobilisation and rationalisation of library expenses.

4. To recommend policy, programmes for the IX Five Year Plan and estimates the financial implications of the implementation of the policies proposed by the committee.

5. To develop norms and performance indicators for libraries.

The Members of the committee will be entitled to TA,DA as per UGC norms for meetings of the committee and for any travel they may undertake in connection with the work of the committee.

The committee will submit its report by 31st December, 1996 to the University Grants Commission.

Annual Subscription : Rs. 48·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 4·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674 47

GRANTHAGAR

Volume 46 : No. 10 January-February 1997

CONTENTS

	PAGE
Editorial	1
Ramakrishna Saha Problems of Implementation of Information technology in the University Libraries	
Arundhati Sengupta Gondalpara Sammelan Town Library in the Light of Past and Present	14
By the By	17
1996 Conference of the International Federation for Library Associations and Institutions (IFLA)	19
English Abstracts	
Circular of the University Grants Commission	21

Printed & Published by Soumendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014 Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 2B/2A, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005.
Editor : Arun Ray, Associate Editor : Nirmalya Ray .

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ১২ সম্পাদক : অরুণ রায়, সহযোগী সম্পাদক : নির্মাল্য রায়চৌধুরী, ১৪০৩

সূচী

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১—২
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	
ধূসর সাহিত্য	৩—৭
জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে	৮—৯
প্রদীপকুমার সরকার	
৪২তম সর্বভারতীয় আই-এল-এ সম্মেলন	৯—১১
পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা	১১—১৩
চিঠিপত্র	১৩—১৪
গ্রন্থাগার দিবস জেলা সংবাদ	১৭—১৮
English Abstracts	১৯—২১
W. B. Government Circular on Additional Recurring Grant for the Public Libraries	২১—২২

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ১২, সম্পাদক : অরুণ রায় / সহযোগী সম্পাদক : নির্মাল্য রায়। চৈত্র, ১৪০৩

সম্পাদকীয়

রাজ্যে প্রায় ২৫০ শতাধিক কলেজ আছে। এর ভেতর বেশকিছু সরকার সরাসরি পরিচালনা করেন, কিছু পরিচালনা করেন মিশনারী বা অনুরূপ সংগঠন সমূহ আর বেশীর ভাগই সরকারী অনুদানে চলে নির্বাচিত কমিটির তত্ত্বাবধানে। তবে সব কলেজেরই অর্থনৈতিক দায়ভার রাজ্য সরকার বহন করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউ. জি. সি গ্রান্ট দিয়ে থাকে, এই গ্রান্ট নিয়মিতও নয় প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্টও নয়।

বেশ কিছুকাল যাবত কলেজের গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের দাবী সমূহ নিয়ে আন্দোলন করছেন। পরিষদও এই সমস্ত আন্দোলনকে সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে। কিন্তু দাবীগুলির সুরাহা হচ্ছে না।

দাবীগুলির দিকে যদি আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাকাই তবে এগুলিকে অযৌক্তিক বলা যাবেনা বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মূল দাবী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা নির্ধারণ। কলেজ গ্রন্থাগারিকরা দীর্ঘকাল দাবী করে আসছেন যে তাঁদের শিক্ষকদের সমতুল মর্যাদা দেওয়া হোক কিন্তু তাঁদের শিক্ষক বানাবার কোন প্রয়োজন নেই, গ্রন্থাগারিক হিসাবেই তাঁরা তাঁদের পরিচিতি রাখতে চান। এমন কি পাঠকদের স্বার্থে তাঁরা শিক্ষকদের মত অফ ডে বা ছিক্করা নিয়ে থাকেন (কোন নিয়মে তাঁরা এই সুযোগ পেয়ে থাকেন সেটা অবশ্য আমাদের জানা নেই) সেটা দাবী করছেন না; গরমের ছুটিও তাঁরা শিক্ষকদের মত চান না, তাঁরা শুধুই যথাযোগ্য মর্যাদা পেতে চান। সেদের অনেক রাজ্যেই কলেজ গ্রন্থাগারিকদের উপযুক্ত পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ পেঁ:য়ে আছে কেন? Where the shoe Pinches?

নূতন বেতনক্রমে আসতে গ্রন্থাগারিকদের দীর্ঘ সময় লেগেছে। যার ফলশ্রুতিতে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বহুল পরিমানে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়েছে। তাঁদের বকেয়া বেতনের ইতিহাস তো এক বিরক্তিকর অধ্যায় যা এখনও শেষ হয়নি; জানি না কবে শেষ হবে। আবার অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যোগী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হবে নূতন বেতনক্রম নিয়ে, তারও সর, ননী, ক্ষীর খাওয়ার পরে কলেজ গ্রন্থাগারিকরা যে কবে অবশিষ্ট ঘোলটুকু পাবেন তা তাঁরা জানেন না। সেটা পেতে গিয়ে তাঁদের কতজন যে চাকুরী থেকে অবসর

নেবেন, কতজন যে অর্থাভাবে ভুগবেন তার হিসাব কে নেবে।

ফলস্বরূপ দেখতে পাই যে কলেজ গ্রন্থাগারিকরা এখনও অবধি অবসরকালীন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাঁদের দীর্ঘদিনের কর্মজীবনের পর সাধারণভাবে যেটা প্রাপ্য সেটা পাচ্ছেন না। বামফ্রন্ট সরকারের নীতিতে এ ধরণের দীর্ঘ সুবিধা সত্যই অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতি তো কর্মীদের অকারণ অবহেলা করা অনুমোদন করেনা। তবুও লাল ফিতার "বাঁধন ছিঁড়বি তোরা কি এমন শক্তিমান—এমনি" ভাব।

কলেজ গ্রন্থাগারিকরা নিশ্চিত জানবেন তাঁদের এই অনাদায়ী দাবী আদায়ের জন্য পরিষদ সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এবং পরিষদের চেষ্টার অবধিও নেই। এখন প্রয়োজন ঘোথভাবে চাপ সৃষ্টি করা।

ধূসর সাহিত্য

গৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষায় কয়েক দশক যাবৎ ব্যবহার বহুল Grey Literature শব্দটির বাংলায় আক্ষরিক প্রতিশব্দ ধূসর সাহিত্য। শব্দটির সংক্ষেপে সংজ্ঞা নিরূপণ করা আরও মুশকিলের। বিভিন্ন জনের দেওয়া সংজ্ঞার ভিত্তিতে বলা চলে যে :

১। যেসব বইপত্রের প্রকাশনা প্রচলিত রীতি অনুসারী নয় অর্থাৎ non-formal ;

২। বিশেষ কোনও লক্ষ্যগোষ্ঠীর জন্য সীমিত সংখ্যক যে সব বইপত্র উৎপন্ন হয় ;

৩। যেসব বইপত্রের খোঁজখবর ও নাগাল পাওয়া দুষ্কর ;

৪। সর্বোপরি সাধারণ বাণিজ্যিক পথে যেগুলি সচরাচর কিনতে পাওয়া যায় না, সেইসব বইপত্র ধূসর সাহিত্য নামে অভিহিত।

বলা হয়ে থাকে যে ওইসব বইপত্র অসুবিধাপ্রাপ্য ; পাদপ্রদীপের আলোয় সেগুলি আসে না। দুষ্প্রাপ্যতা সেগুলির প্রধান লক্ষণ। উৎপাদনের পরিমাণ অল্প। ধূসর সাহিত্যের উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। যেমন :

১। সরকারি প্রকাশনা। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও মন্ত্রক থেকে প্রকাশিত নানা ধরণের বইপত্র যেগুলির নির্দিষ্ট লক্ষ্যগোষ্ঠীর বাইরেও অল্প বিস্তর চাহিদা থাকে। সেগুলি নামমিক হতে পারে অথবা ধারাবাহিকও হতে পারে। শিক্ষা, অর্থ, আইন সমবায়, কৃষি শিল্প, বাণিজ্য সংক্রান্ত, যোগাযোগ পরিবহন পরিসংখ্যান উন্নয়ন, বাজেট ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রকাশনা ছাড়াও থাকে সরকারের নানান কমিশন ও কমিটির রিপোর্ট।

২। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েক বিষয়ের সেমিনার ওয়ার্কশপ আলোচনাচক্র ইত্যাদি অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত আলোচ্য প্রবন্ধ, গবেষণা নিবন্ধ, কার্যবিবরণ ইত্যাদির টুকরো খবর পাওয়া যায় যেগুলির মূল পাঠ্যবস্তু দুর্লভ।

৩। সরকারি ও বেসরকারি নানা দপ্তর ও সংস্থার ব্যবসা—বাণিজ্য, উন্নয়ন, প্রকল্প, লগ্নি, আইন, তদন্ত, প্রশাসন নীতিনির্ধারণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বহুবিধ রিপোর্ট ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি গোপনীয়তার আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ গোপনীয়। নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে সেগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৪। কলকারখানা ও নানান শিল্প ও উৎপাদন কেন্দ্র গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development) সূত্রে অনেক রিপোর্ট সীমিত পরিমাণে প্রকাশিত ও বিতরিত হয়।

৫। জাতীয় ও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যার গবেষণাগারে নানা ধরণের গবেষণাপত্র ঘরোয়া পত্রপত্রিকা (house journal, newsletter) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৬। সমাজতত্ত্ব, পরিসংখ্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি পরিবেশ, প্রশাসন, আইন, বিচার ইত্যাদি বিষয়ের বহু বিদ্যার সংস্থার নানা ধরনের প্রকাশনার কথা জানা যায় যেগুলি সচরাচর সহজলভ্য নয়।

৭। শিল্প, সংগীত, চারুকলা স্থাপত্য, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা ছোটবড় নানা ধরণের বইপত্র প্রকাশ করে, যেগুলি সাধারণত আগ্রহী ব্যবহারকারীদের কাছে দুর্লভ।

ধূসর সাহিত্যের সংজ্ঞা ও কিছু উদাহরণ দেবার পর

প্রত্যয়টির সূত্রপাতের প্রসঙ্গে সামান্য কয়েকটি কথা বলে রাখা ভাল।

ধূসর সাহিত্যের প্রকাশনা দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে। তবে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর গবেষণা, উন্নয়ন ও মননশীল ক্রিয়াকর্মের ক্রমবর্ধনের ফলে প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশেষ বিস্তার দেখা দেয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী এস আর রঙ্গনাথন এইসব অনালোকিত প্রকাশনাকে অস্থায়ী সামগ্রী (fugitive) আখ্যা দেন। বিগত সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ মার্চ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ কালপর্বে ইউনেস্কো, ইউনাইটেড নেশনস ডিপার্টমেন্ট অফ ইকনমিক অ্যান্ড সোসাল অ্যাফেয়ার্স, আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ILO) সমেত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ডেভলাপমেন্ট সায়েন্স ইনফরমেশন সিস্টেম (DEVSIS)-এর পর্যবেক্ষকমণ্ডলী ধূসর সাহিত্য প্রত্যয়টির (Concept) সূচনা করেন। উক্ত ফোরামের সমীক্ষায় দেখা যায় যে প্রকাশনা জগতের প্রথা সম্মত (formal) উৎপাদনে পত্রপত্রিকার প্রকাশিত নিবন্ধের পরিমাণ ছিল মোট উৎপাদনের ২২ শতাংশ এবং গ্রন্থের পরিমাণ ১৮ শতাংশ। বাকি ৬০ শতাংশ হল ধূসর সাহিত্য। তাও বলা হয় যে সমগ্র এই হিসাবটি সমুদ্রের ভাসমান হিমশৈলের মতো যার বেশীটাই থাকে জলের মধ্যে অদৃশ্য।

সভা সম্মেলনে উপস্থাপিত আলোচ্য প্রবন্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্যে লগ্নির পূর্বে সংকলিত সমীক্ষাপত্র, বিদ্যাসংস্থার প্রদত্ত গবেষণাপত্র, গবেষণার ভিত্তিতে প্রস্তুত প্রস্তুবর্তী-কালীন রিপোর্ট এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বহুবিধ সংস্থার নানারকমের প্রকাশনার কথা জানা যায় যেগুলি নির্দিষ্ট কম সংখ্যায় তৈরি হয় এবং কিনতে পাওয়া যায় না। কারণ বিশেষ প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে সেগুলি তৈরি করা হয়; অধিক সংখ্যক চাহিদা মেটানোর নিরিখে নয়।

কালক্রমে ধূসর সাহিত্যের বিষয়টি ধীরে ধীরে গুরুত্ব লাভ করেছে এবং তথ্য পরিষেবার স্থান পেয়েছে। বেশির ভাগ ব্যবহারকারীর কাছে ধূসর সাহিত্যের নাগাল না পাবার কারণ তিনটি:

১ দুর্লভতা; ২ পাঠক ও গবেষক তথ্য ব্যবহার কারীদের প্রয়োজনে দুর্লভ পাঠ্যবস্তুগুলির তথ্য সংগ্রহ এবং গ্রন্থপঞ্জিভুক্তিকরণের ব্যবস্থা না থাকা এবং ৩ গ্রন্থ-পঞ্জিতে পাওয়া গেলেও সেগুলির নাগাল পাওয়া দুষ্কর, যদি কেন্দ্রীয় অথবা অন্য কোনও গ্রন্থাগারে সেগুলি সংরক্ষিত না হয়।

সাধারণভাবে উন্নয়ন বিষয়টি এখন ভুবনীকরণের (globalization) মধ্যে এসে পড়েছে। তথ্য পরিষেবার যুক্ত কর্মীরা সেজন্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্থাৎ সমবায় ব্যবস্থার কথা ভাবছেন। পূর্বোক্ত DEVSIS আগ্রহী ব্যবহারকারীদের কাছে ধূসর সাহিত্য সম্ভার সহজলভ্য করার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে।

ধূসর সাহিত্য সহজলভ্য করার প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে যে:

১ ওই উপকরণ প্রস্তুতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনুভব করেন কিনা যে তাঁদের সীমিত পরিমাণে প্রস্তুত ধূসর সাহিত্য তথা প্রলেখ (document) অপরের কাজেও লাগতে পারে;

২ অপরের প্রয়োজন মেটানো প্রস্তুতকারীদের পক্ষে কতদূর সম্ভব যদি প্রলেখ সমূহ গোপনীয় না হয়;

৩ যদি সম্ভব হয় তাহলে তিনি বা তাঁরা কীভাবে জানবেন যে তাঁদের তৈরি প্রলেখের আগ্রহী ব্যবহারকারী কে বা কারা? দেখা যায় যে ব্যবহারকারীর আগ্রহ ও প্রয়োজন না জেনে আন্দাজে মূল্যবান প্রলেখ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তির কাছে ডাকযোগে পাঠানো হয়; যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপাত্রে অনাদৃত ভাবে নষ্ট হয়।

৪ কোন্ মাধ্যমে প্রস্তুতকারী ও সম্ভাব্য ব্যবহার কারীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা যায়? কয়েক দশক আগে *Unesco Bulletin for Libraries* নামে একটি পত্রিকার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রয়োজনের চরিত্র নির্ণয়

কত্র বইপত্র ও অন্যান্য পাঠ্যবস্তু পাঠানোর সুন্দর ব্যবস্থা ছিল।

তথ্য পরিষেবার নিরিখে ধূসর সাহিত্য সম্ভার ব্যবহারকারীদের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে হলে নির্ণয় করা দরকার যে,

১ পরিষেবা ব্যবস্থার প্রয়োজন কতটা এবং বিভিন্ন বিষয়ের ধূসর সাহিত্যের চাহিদার পরিমাণই বা কত ?

২ ধূসর সাহিত্য উৎপাদনের উৎস অর্থাৎ কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান সেগুলি প্রকাশ করে এবং সরবরাহের মোট আনুমানিক পরিমাণ কত ?

ধূসর সাহিত্য উৎপাদনের প্রকৃতি ও পরিমাণ সমীক্ষার মাধ্যমেই নির্ণীত হওয়া সঙ্গত। পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ ধূসর সাহিত্য সম্পর্ক ব্যবহারকারীদের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে হলে কোনও এক কেন্দ্রীয় সংস্থার উদ্যম ও উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন। অনেকেই সমবায়ী সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু উপাত্ত (data) সংগ্রহ, তালিকাভুক্তিকরণ ও প্রয়োজনে সরবরাহ সর্বাংশে উপযোগী সংগঠন-এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের উপর নির্ভর করে। বেসরকারী সংস্থার উদ্যম সাধারণত স্থায়ী ও কার্যকর হয় না। সেজন্যে কার্যে রূপায়ণ, আর্থিক সঙ্গতি এবং সাংগঠনিক সুবিধাযুক্ত কোনও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকাই একমাত্র কার্যকর ব্যবস্থা। স্তরিক থেকে রাজ্যস্তরে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পক্ষে ধূসর সাহিত্য সম্ভার সংগ্রহ এবং উৎসাহী ব্যবহারকারীদের কাছে সহজলভ্য করে তোলা সহজ ও সম্ভব। ধূসর সাহিত্যের প্রলেখ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গ্রন্থপঞ্জীর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ (Bibliographical Control) এবং সর্বোপরি ব্যবহারকারীদের কাছে সহজলভ্য করার কাজে এক একটি রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিহার্য।

শোক সংবাদ

গত ১৮ই ডিসেম্বর '৯৬ তাং মালদা জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার কর্মী কালিপদ সাহা ও ২৯. ১. ৯৭ তাং বামনগোলা গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ধীরেন্দ্রনাথ বর্মণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

কথা প্রসঙ্গে

[জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে]

সকালে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় নীরবে গীতাপাঠ করছিলাম। কখন যে একসময়ে বন্ধুবর এসে পিঠে হাত রেখেছেন খেয়াল করিনি। আমার সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি বললেন, 'তুমি গীতাপাঠ করছ? এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা! কিংবা ভূতের মুখে রামনাম।'

আমার এই বন্ধু আমাকে এতকাল একটি কালাপাহাড় বলেই জেনে এসেছেন। কেননা, আমার এরূপ কর্ম দেখে তাঁর তো বিস্মিত হবারই কথা।

তবে খুব ছোটবেলা থেকেই গীতাপাঠের অভ্যাস আমার হয়েছিল। সম্ভবত গুরুজনদের দেখেই। তখন কিন্তু আমার ঝোঁক ছিল গীতার শ্লোকগুলি আবৃত্তি করার দিকেই। এর শ্লোকগুলির শব্দাবলী আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে এক অভূতপূর্ব আনন্দানুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেলেও তখন এর অর্থবোধ আমার কাছে হত না। বাংলা অর্থ দেখে দেখে শ্লোকগুলির মানে করবার চেষ্টাও তখন করতাম না। কলেজে পড়ার সময় গীতার একটি অধ্যায় আমাদের পাঠ্য ছিল। পরীক্ষার কারণে তখন ঐ অধ্যায়ের শ্লোকগুলির মানে বোঝার প্রয়োজন হয়েছিল।

কর্মজীবনে গীতাপাঠ করতাম কখনো-সখনো। কিন্তু ভাল করে পড়বার অবকাশ হত না। অবসর গ্রহণের পর এখন সময় আছে বলে ভালো করে এর শ্লোকগুলি পড়তে পারি। ওপর-ওপর পড়া নয়, রীতিমত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অর্থ জেনে পড়া। তবে আমার গীতাপাঠ ধর্মকর্মের অঙ্গ হিসেবে নয়, ভালো লাগে বলে পড়া। পুণ্যসঞ্চয় হবে বা মোক্ষলাভ হবে এ ভেবেও আমি গীতাপাঠ করিনা। জীবনভোর ধর্মকর্মের কোন অনুষ্ঠান না করলেও বেশ কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ আমি মাঝে মাঝে পড়ি। এটা আমার বহুদিনের অভ্যাস। এগুলির মধ্যে আছে 'গীতা', 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' 'ঋগ্বেদ', ও কয়েকটি উপনিষদ্, 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'ধর্মমঙ্গল' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত'। বইগুলি অবশ্য আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। বইগুলির মালিক ছিলেন আমার পিতৃদেব এবং তারও আগে আমার স্বর্গীয় পিতামহ। হিন্দুর ঘরে জন্মেছিলাম বলে জন্মসূত্রে হিন্দুর ধর্ম পেয়েছি কিন্তু তার খুব একটা উপযোগ আমার জীবনে হয়নি। তবে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধর্মগ্রন্থগুলির উপযোগ হয়েছিল।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি কখনো-সখনো পড়লেও আমি সবচেয়ে বেশী পড়ি গীতা। সময় পেলেই গীতা খুলে বসি। হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এই গীতা। গীতা স্পর্শ করে আদালতে হিন্দু সাক্ষীকে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করতে হয় যে; সে যা বলবে সত্য বলবে, কদাচ মিথ্যা বলবে না। সাক্ষী মুসলমান বা খৃষ্টান হলে অনুরূপ-ভাবে 'কোরাণ' বা 'বাইবেল' স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করেন। বেউ কেউ হয়তো আপত্তি করে বলতে পারেন, এখন সেক্যুলার স্টেটে এসব হবে কেন? কিন্তু কি হওয়া উচিত সেটা তো ভবিষ্যতের ব্যাপার। এখন পর্যন্ত এটাই চলে আসছে।

গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পড়া এক কথা, আর তা নিয়ে লেখা অন্য কথা। বিজ্ঞজনেরা বলেন, 'শতং বদ মা লিখ।' বিজ্ঞজনদের উপদেশ অমান্য করেই এ সম্বন্ধে কিছু লিখতে চলেছি। অজ্ঞজনের এ ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। তবে যা লিখব তা সবই বিজ্ঞজনদেরই রচনা-পাঠের ফল; আমার নিজস্ব সংযোজন এতে কমই আছে।

আমরা জানি গীতা অষ্টাদশাধ্যায়ী এবং এতে সাতকোটি

শ্লোক আছে। গীতার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আছে অধ্যাত্মবাদ ও দর্শন, অথবা বলা যায় আধ্যাত্মিক দর্শন। এর সঙ্গে আত্মা, পরমাত্মা, পরজন্ম, কর্মফল, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ও আছে।

গীতা সম্বন্ধে সুন্দর উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, 'উপনিষদ গুলি হল গাভী আর গোপাল নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই সকল গাভীর দুগ্ধ দোহন করছেন; পার্থ অর্থাৎ অর্জুন হলেন গো-বৎস, যিনি এই দোহন কার্যের উৎস; বিবেকী পুরুষগণ এই দুগ্ধের ভোক্তা এবং গীতা গ্রন্থটি অমৃতময় দুগ্ধ অথবা উপনিষদ নির্যাস।'

সাধারণভাবে গীতার বক্তব্য বিষয় হল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে বিষাদগ্রস্ত অর্জুন যুদ্ধে অসম্মত। অর্জুনের প্রিয় সখা ও রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য যে সুদীর্ঘ উপদেশ দেন—অর্জুনের প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রসঙ্গে—এই নিয়েই গীতা। যুদ্ধক্ষেত্রে রথ থামিয়ে এই সুদীর্ঘ উপদেশ দেওয়া সম্ভব কিনা, সে প্রশ্নে গিয়ে লাভ নেই। অর্জুনকে পুরুষ সিংহ করে তুলবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকগুলিতে যেসব কথা বলেছেন তার সবটাই আমরা মেনে নিতে না পারলেও এর কবিত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। গীতার এই শ্লোকগুলিতে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য কুল, জাতি, বংশ, গোত্র বজায় রাখার উপদেশ দেওয়া হয়েছে—তা না হলে হিন্দুধর্ম লোপ পাবে। একথাও বলা হয়েছে যে ধর্মকর্মে নারী এবং শূদ্রের কোন অধিকার নেই।

আমরা জানি কেবলমাত্র লৌকিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেই নয়, পারমার্থিক জ্ঞানের রাজ্যেও আদি ও মধ্যযুগে এদেশে নিম্নবর্ণের লোকেদের এবং নারীর প্রবেশাধিকার ছিল না। সমাজে যজন-যাজন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য থাকার জন্যই বোধ হয় ব্রাহ্মণ বর্ণ শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হতেন। সে যুগের এই সমাজচিত্র গীতায় অবশ্যই পাওয়া যায়।

গীতার অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও হিন্দুর জীবনে গীতার গুরুত্ব কম নয়। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি। গীতা উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুর ধর্মকর্ম, ভাব ও ভাবনায় রয়েছে বেদ ও উপনিষদ্। সেই বেদ-উপনিষদের সার সংকলন করে গীতা রচিত। ঋক্-সাম-যজু-অথর্ব বৈদিক সংহিতার এই চারটি শাখায় যেমন প্রাচীন ভারতের আর্য-ভাবীদের ধর্ম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের ও সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যাসম্ভারের পরিচয় পাওয়া যায় উপনিষদগুলিতে। প্রধান প্রধান উপনিষদ-গুলিতে নানা দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে—পরব্রহ্ম, পরমেশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ-স্বরূপ প্রভৃতির বিষয়ের আলোচনা এতে দেখা যায়।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্য সংহিতা, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্ এই চার পর্যায়ে বিভক্ত। ঋক্ সংহিতায় কাব্য গুণ প্রচুর, আর উপনিষদগুলি সমৃদ্ধ হয়ে আছে নানা ধরণের গল্পের সংকলন হিসেবে। নচিকেতা-যম উপাখ্যান, সত্যকাম জবালা—ঋষি গৌতম উপাখ্যান, মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য উপাখ্যান প্রভৃতি কত উপাখ্যানই না এতে রয়েছে। উপনিষদের কাহিনী নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য তো বটেই, ভারতীয় নানা সাহিত্যেও নানা কাহিনী, নাটক, কবিতা প্রভৃতি লেখা হয়েছে।

প্রায় দুশোর মত উপনিষদের নাম পাওয়া গেলেও ঈশ, কঠ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌশিতকী, শ্বেতাশ্বর, বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্য প্রভৃতি বারো-তেরোটি সর্বপ্রাচীন এবং প্রধান উপনিষদ্ বলে মনে করা হয়। উপনিষদগুলি বিভিন্ন ঋষিদের রচিত। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদ রচনা করেন ঋষি সত্যকাম। উল্লিখিত প্রাচীন উপনিষদগুলি ছাড়া আর সবই পরবর্তীকালে রচিত। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ দুটি আকারে বৃহৎ; ঈশোবাস্যোপনিষদ্ শুক্ল যজুর্বেদের চল্লিশতম অধ্যায় এবং কঠ-কেন আদি আটটি উপনিষদ্ আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অংশ।

এই বিংশ শতাব্দীতে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে গীতার অনেক উপদেশই মানা যায় না। মানবতাবাদীর দৃষ্টিকোণ

থেকেও এ সকল অযৌক্তিক মনে হবে। গীতায় অনেক বাদের অবতারণা করা হয়েছে: অবতারবাদ, ভক্তিবাদ, জন্মজন্মান্তরবাদ ইত্যাদি। অবতারণা করা হয়েছে নানা যোগেরও, যেমন, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম-সন্ন্যাসযোগ, অভ্যাসযোগ, জ্ঞান বিজ্ঞানযোগ, অক্ষরব্রহ্ম-যোগ, রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ, বিভূতি যোগ, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, ভক্তিযোগ; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ, পুরু-ষোত্তমযোগ, দৈবাসুরসম্পদ বিভাগযোগ, শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ-যোগ, ও মোক্ষযোগ। প্রকৃতপক্ষে গীতার প্রতিটি অধ্যায়ই এক একটি যোগের নামে হয়েছে। যেমন, প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে এই বলে, 'ইতি অর্জুন বিষাদ যোগে নামক প্রথম অধ্যায়।' দেখা যায়, গীতায় অনেক পরস্পর বিরোধী উক্তিও রয়েছে।

গীতাকে অনেকে যেমন ধর্মগ্রন্থ হিসেবে দেখেন তেমনি অনেকে একে সংস্কৃত সাহিত্য হিসেবেও দেখেন। কেউ কেউ দেখেন কাব্য হিসেবে। কেউ একে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। যাই হোক, গীতা যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শংকরাচার্য থেকে আজ পর্যন্ত অনেকেই এর ভাষ্য রচনা করেছেন—ব্যাখ্যা করেছেন। বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী, সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ কত মনীষীই না এর ব্যাখ্যা করেছেন। গীতা বেদেরও সর্বোত্তম ভাষ্য, তাই একে বলা হয়েছে পঞ্চম বেদ। ব্রহ্ম বিদ্যাই গীতার প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। যদিও অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ, সাংখ্যতত্ত্ব ও অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি ও এতে দেখা যায়। এসব কথা যদিও বেদ বা উপনিষদে নেই।

গীতায় উপনিষদের প্রভাব দেখা যায়, এ দুয়ের দর্শনে অনেক মিল পাওয়া যায়। এমন কি গীতা ও উপনিষদ-গুলির অনেক শ্লোকে অনেক মিল দেখা যায়—অনেক স্থলে তো বক্তব্য হুবহু এক বলে মনে হয়।

নীচে গীতা ও উপনিষদ থেকে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া হল:

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং···' ইত্যাদি শ্লোক।

গীতা ২।২০

গীতায় আছে, যার অর্থ হল, 'এই আত্মা কখনো জন্মে না বা মরে না। 'বার বার' জন্মিয়া সে বৃদ্ধি পায় না। ইহার ক্ষয়-ক্ষতি কিছুই নাই ও ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও চির পুরাতন। ইঁহার দেহ হত হইলে আত্মা হত হন না।'

আর উপনিষদে আছে,

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন···' ইত্যাদি শ্লোক।

কঠ ১।২।১৮

অর্থাৎ, 'এই আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না। আত্মা জন্মরহিত অপক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধিশূন্য। শরীর নষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।'

আবার গীতায় আছে,

'আশ্চর্য বৎ পশ্যতি কশ্চিদেন···' ইত্যাদি শ্লোক।

গীতা ২।২৯

অর্থাৎ 'এই আত্মাকে কেউ আশ্চর্য বলিয়া মনে করেন; কেউ আত্মাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন। আবার কেউ আশ্চর্য বলিয়া শুনেন না। কিন্তু ইঁহার বিষয় শুনিয়াও কেউ ইহাকে জানিতে পারেন না।'

আর উপনিষদে আছে,

'শ্রবণায় পি বহুভির্যো ন ...' ইত্যাদি শ্লোকটি।

কঠ ১।২।৭

অর্থাৎ, 'সেই যে পরমাত্মা তাঁহার প্রসঙ্গকেও অনেকে শুনিতে পান না। অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে বোধগম্য করিতে পারেন না। ইঁহার বক্তা দুর্লভ, আর ইহা শুনিয়াও অনেকের মধ্যে কোন বিপ্রল ব্যক্তি ইঁহাকে প্রাপ্ত হন।"

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে,
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে,
এনেছ তোমার দুয়ারে।'

এ রকম উদাহরণ আরও অনেক আছে। শুধু গীতা ও উপনিষদের আরও দুটি শ্লোক উদ্ধার করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি :

'য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈন মন্যতে হতম।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

গীতা ২।১৯

'হন্তা চেন্মন্যতে হন্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ বিজানিতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

কঠ ১।২।১৯

উপরের শ্লোক দুটিতে এত মিল রয়েছে যে আর অর্থ দেবার প্রয়োজন দেখিনা।

উপনিষদের বাণীতে আছে ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাখ্যা : গীতাতেও ব্রহ্মতত্ত্বের সহায়ক কতগুলি শ্লোক রয়েছে।

একবার অসুস্থ হয়ে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। হাসপাতালে পড়বার জন্য আমি বাড়ি থেকে কিছু বই নিয়ে আসতে বলেছিলাম এবং বলে দিয়েছিলাম যে এর মধ্যে অবশ্যই যেন গীতা থাকে। তারপর আমি যখন ঘুমুচ্ছিলাম তখন কেউ বইগুলি আমার পায়ের কাছে রেখে যায়।

হাসপাতালের নার্স এসে এটা দেখে খুব রেগে যান। আমাকে তাঁর ভৎর্সনা করে তিনি গীতাখানা নিয়ে নিজে তিনবার মাথায় ঠেকান এবং আমার মাথায়ও তিনবার ঠেকিয়ে বালিশের নীচে রেখে দেন। অন্য বইগুলিকে তিনি টেবিলের ওপর রেখে বলেন, 'শুধু গীতা কেন, কোন বই-ই পায়ের নীচে রাখা উচিত নয়।' কেননা, বই হচ্ছে পবিত্র জিনিস।'

তিনি হয়তো ঠিকই বলেছিলেন। বই যে পবিত্র জিনিস ছোটবেলা থেকেই এমন একটা সংস্কার আমাদের মনে রয়েছে। এটা খুবই ভাল সংস্কার। অন্ত এই বইকে তো হেলন্তা করতে দেখি অহরহ সর্বত্র আমাদের চোখের সামনে বাড়িতে, বিদ্যালয়ে বা লাইব্রেরীতে। যখন-তখন বইয়ের অযত্ন করা হয়। পুস্তক হচ্ছে জ্ঞানের আকর; আর তাই বইয়ের যত্ন করা একদিন আমাদের ধর্মকর্মের অন্তর্গত ছিল। সেই বইকে আমরা যেন অযত্ন না করি। জীবনের প্রারম্ভ থেকেই বইকে যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি।

অতি পবিত্র জিনিস বইকে যত্ন করতে আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই।

৩।১।১৯৯৭

৪২তম সর্বভারতীয় আই-এল-এ সম্মেলন

প্রদীপকুমার সরকার

গত ২১-২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬ কেরল রাজ্যের কালিকট শহরের ২৪ কি.মি. দূরে কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (আই এল এ-র) ৪২তম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মালাপ্পুরম জেলার ত্বেসাইপালামু পার্বত্য গ্রামাঞ্চলের মনোরম পরিবেশে অবস্থিত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও গ্রন্থাগার কর্মী ঐ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

শনিবার ২১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সকালে আই-এল এ-র কাউন্সিল সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী সেমিনার

কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে পরিষদের কাউন্সিল সদস্যদের উপস্থিতিতে পরিষদের আগামী বছরের কর্মসূচীর আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপরাহ্নে কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান সূচনা করেন কেরালার গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী টি. কে. রামকৃষ্ণন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মাঙ্গলিক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জাব্দুল রহমান তাঁর স্বাগত ভাষণে বিশ্ব-বিদ্যালয় ও সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমকে গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারের কথা উল্লেখ করেন। সভায় আই এল এ-র সাধারণ সম্পাদক ডঃ আর পি কুমার তাঁর সম্পাদকীয় ভাষণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে আই এল এ-র ভূমিকা ও কার্যকারিতা প্রসঙ্গে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতির ভাষণে আই এল এ-র সভাপতি প্রফেসর পি এন কাউলা সারা ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত, তিনি পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও রাজ্যসরকারের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এরপর সভায় আই এল এ-কাউলা বর্ষশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারিক ও এস এম জি-আই এল এ আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার হিসাবে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় যথাক্রমে লক্ষ্ণৌ এর ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ ম্যানেজমেণ্টের গ্রন্থাগারিক রোশনলাল রায়না ও দেরাদুনের ওক্ গ্রোভ বিদ্যালয়ের পক্ষে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক আশাকুমারী সিনহার হাতে। সভায় সম্মেলনের স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করেন কেরালার শিক্ষা ও পূর্তমন্ত্রী পি জে জোসেফ্। কেরালার সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ ডি পি উন্নিথন তাঁর ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগারের গুরুত্বের কথা ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথা সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা ডঃ ডি এস ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে আয়োজক সম্পাদক তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ এম বাবাকুট্টী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন রবিবার ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী সেমিনার কক্ষের একাংশে পুস্তক ও কম্পিউটার প্রদর্শনী শুরু হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা ডঃ ডি এস ব্যানার্জী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন ও প্রদর্শনীর স্টলগুলি পরিদর্শন করেন। এরপর সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় "জাতীয় উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা" (Role of Libraries in National Development)-এর উপর লিখিত নির্বাচিত প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা পর্ব শুরু হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরেও উক্ত আলোচনা পর্ব চলে এবং প্রশ্নোত্তরের মধ্যে নানা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

অপরাহ্নের শেষ অনুষ্ঠানে আই এল এ-র বার্ষিক সাধারণ সভা ও বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দের বিবরণী পেশ করা হয়। শতাধিক ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানগত ও রাজ্যপরিষদগত সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর পি এন কাউলা। ডঃ আর পি কুমার তাঁর সম্পাদকীয় বিবরণ পেশ করেন। বার্ষিক আয়ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ ডঃ ও পি গুপ্তা। আলোচ্যসূচীর প্রশ্নোত্তরের পর বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। আই এল এ-র আগামী সম্মেলন চণ্ডীগড়ে হওয়ার কথা সম্পাদক ডঃ কুমার সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

সম্মেলনের তৃতীয় দিন সোমবার ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সকালের মূল আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি ছাড়া অপরাহ্ন পর্যন্ত চলে। নির্বাচিত প্রবন্ধের লেখকদের মধ্যে উপস্থিত লেখকদের নিকট প্রতিনিধিদের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সমগ্র আলোচনা প্রাণবন্ত হয়েছিল।

এরপর কালিকট টাউন হলের সভাগৃহে 'কেরালার পাবলিক লাইব্রেরী'র উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভায় প্রথমে ডঃ বাবাকুট্টী উপস্থিত প্রতি-নিধিদের স্বাগত জানান। উদ্বোধনী ভাষণে কেরালা বিধানসভার চিফ্ হুইপ্ টি কে হাম্‌জা রাজ্যের সাধারণ

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে সকলকে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানের মূল ভাষণে আই এল এ-র সভাপতি প্রফেসর পি এন কাউলা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে কেরালা রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা বলেন। এ ছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন কেরালা স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিলের সভাপতি কাদামানিট্টা রামকৃষ্ণণ, সম্পাদক আই ভি দাশ ও সদস্য পি শংকরণ। সভাশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কালিকট জেলা গ্রন্থাগার কাউন্সিলের সম্পাদক ভি কে বালন মাষ্টার।

সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

মঙ্গলবার ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সকালে সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আই এল এ-র সম্পাদক ডঃ আর পি কুমার স্বাগত ভাষণে তাঁর বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের বিগত দিনের আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনার ফলাফল নিয়ে সিদ্ধান্তগুলি সকলের কাছে পেশ করেন ডঃ এ আমুধভাল্লি। কালিকট শহরের মেয়র প্রফেসর এ কে প্রেমাজন তাঁর ভাষণে সমাজে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকার কথা বলেন। এ ছাড়া সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্মেলনের স্মারক পত্রিকার আহ্বায়ক এম পরমেশ্বরম্ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর উৎসাহী প্রতিনিধিদের শহরের কিছু নির্বাচিত দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির
২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা—শিলিগুড়ি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী-সমিতির দুইদিনব্যাপী ২৮তম রাজ্য সম্মেলন শিলিগুড়ি তথাকেন্দ্রের দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলন শুরুর আগে গ্রন্থাগার কর্মী, শহরের সাধারণ মানুষ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক ছাত্র প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সম্মেলন প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। সেখানে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি বীরেন চন্দ। এরপর বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ-বেদীতে মাল্যদানের পর সভার কাজ শুরু হয়। সভার শুরুতে সাধারণ সম্পাদক তরুণ রায় স্বাগত ভাষণ দেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির শিলিগুড়ি মহকুমা কমিটি। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল মহাশয়। তিনি তাঁর ভাষণপর্বে বলেন যে বামফ্রন্ট সরকারের বিগত ১৯ বছরের প্রয়াসে রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটা পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। রাজ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়েছে, পরিষেবারও বিস্তৃতি ঘটেছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সজীব ও সক্রিয় রাখতে, গ্রন্থাগার কর্মীগণকে জনগণের কাছে যাবার, তাদের সাথে নিজেদের যুক্ত করার পরামর্শ দেন এবং গ্রন্থাগারগুলিকে জনমুখী করে গড়ে তোলার প্রয়াসে ব্রতী হবার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন চালু থাকলেও জাতীয় স্তরে কোনো গ্রন্থাগার আইন চালু হয়নি। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার খাতে ২১ কোটি টাকা বায় বরাদ্দের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন থেকে কতগুলি শর্ত সাপেক্ষে

গ্রন্থাগারগুলিকে কিছু অনুদান দেওয়া হয় ঠিকই কিন্তু এ বিষয়ে সমাক জ্ঞান এবং যথোপযুক্ত প্রচার না থাকায় বহু গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র পাঠাতে পারেন না ফলে ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে প্রেরিত কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে আমরা বঞ্চিত হই। নবম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট অর্থবরাদ্দের বিষয় আমাদের রাজ্য সরকারের দৃষ্টিতে আনতে হবে। রাজ্য ও জেলাস্তরে গ্রন্থাগারগুলিতে কমপিউটার ব্যবস্থা চালু করার ভাবনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সমহারে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন চালু হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক নির্দেশও জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার আধিকারিকগণের নিকট পাঠানো হয়েছে। রোপা '৯০ এর বকেয়া টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা দেওয়া হবে এবং মার্চের পর সেই টাকা তুলতে পারার কথাও তিনি বলেন। শূন্যপদ পূরণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন চলতি আর্থিক বছরের শেষে কিছু শূন্যপদ পূরণের চেষ্টা করা হবে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রবীর রায়চৌধুরী। তিনি তাঁর ভাষণের শুরুতেই উল্লেখ করেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির যৌথ আন্দোলনের ফলে আজ আমরা এখানে এসে দাঁড়াতে পেরেছি। সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার জনগণের মধ্যে শিক্ষাকে নিয়ে যাবার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জেলা বইমেলা তারই একটি সার্থক প্রয়াস। তিনি বলেন নতুন প্রজন্মের বই পড়ার আগ্রহ কমেছে। তবে তা শুধু দূরদর্শনের জন্যই নয়—এই ঘাটতির জন্য বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিও অনেকাংশেই দায়ী। তাই বর্তমানে সময় এসেছে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যতটা সম্ভব উন্নত করে তুলতে এবং সাক্ষরতা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মেলবন্ধন গড়ে তোলার। নতুন গ্রন্থাগার আন্দোলন হবে বই পড়ার আন্দোলন। গ্রন্থাগার হয়ে উঠবে একটা নিরপেক্ষ গণমাধ্যম। বই মনের মধ্যে একটা রেখা অঙ্কন করতে পারে—বহুমুখী তার বিস্তৃতি। তাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলার পথে, তার চেতনার মান বৃদ্ধিতে, জ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চায় আমাদের গ্রন্থাগার পরিষেবাকে উপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীত করে তুলতে হবে নচেৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে—নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। বক্তব্যের শেষপর্বে তিনি আগত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর প্রবীণ নেতা আনন্দ পাঠক সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে বর্তমানে দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—দেশের অখণ্ডতা আজ বিপন্ন। এই সংকটকালে তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান।

বাণিজ্য কলেজের অধ্যক্ষ হরেন ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন যে বিভিন্ন জীবিকার এবং পেশার যাঁরা গ্রন্থাগারে রেখে সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগার মুখী করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব কৃষ্ণপদ মজুমদার সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বলেন যে আমাদের পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিকল্পনা নিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন তথা পরিষেবার বিস্তৃতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের মানুষকে সচেতন করার কাজে, সাক্ষর করার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানমুখী করে গড়ে তুলতে, সুস্থ সংস্কৃতিবোধে সজাগ করতে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে পরিষেবার মান উন্নয়ন করে গ্রন্থাগারকে জনমুখী করে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অনিল সাহা অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন, তিনি উল্লেখ করেন অনিবার্য কারণে পাহাড়ে কর্মীদের সম্মেলনে আনা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত তিনি আরও বলেন গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠক আসার সংখ্যা অনেক কমে গেছে, এ বিষয়ে তিনি

গ্রন্থাগার কর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রথম অধিবেশনের শেষপর্বে সংগঠনের সভাপতি বীরেন চন্দ বলেন যে আমরা দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে এসেছি দীর্ঘ সংগ্রাম এবং উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে। আজ আমাদের সংগঠন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ২৮তম সম্মেলন করতে চলেছে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে তুলসী ভট্টরাই তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি দেশের দুর্ব্যবস্থান এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সজাগ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন বইঃ হাতিয়ার করে মানুষকে গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করতে হবে গ্রন্থাগার কর্মীদের। তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এরপর প্রয়াত কর্মী বন্ধু ও প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মরণে একমিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বীরেন চন্দ, রামপদ পাল, ব্রজদুলাল গোস্বামী, মদন মল্লিক, করুণা ভট্টাচার্য ও লক্ষ্মীনারায়ণ রায়কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী এবং সুনীল মণ্ডল, অলোক দাস, নীতিশ বসু, নিতাই দেব, দেবদাস ভট্টাচার্য ও গোপাল সরকারকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। মৃদুল মিত্র, সতীশ মহাপাত্র, দেবব্রত পাল, আবদুল ওদুদ ও কাজী ইমাম-উল্লাকে নিয়ে ক্রেডেনসিয়াল কমিটি গঠিত হয়।

এরপর সমিতির সাধারণ সম্পাদক তরুণ রায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন এবং কোষাধ্যক্ষ অর্চনা শ্রীমানী বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

এরপরে মোট ২৮ জন প্রতিনিধি দুইদিন সম্মেলনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সাধারণ সম্পাদক তরুণ রায় সভার শেষপর্বে জবাবী ভাষণ দেন। তিনি বলেন আমাদের সমিতির একটা নিজস্ব ঐতিহ্য আছে এবং এই ঐতিহ্য অনুসারে আমরা চলি। আজও তা বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

১৯শে জানুয়ারী '৭৭ ১ম সভায় অলক দত্ত সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ সংগঠনের কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। সভাপতি—শ্রীবীরেন চন্দ। সহ সভাপতি—শ্রীব্রজদুলাল গোস্বামী, শ্রীমদনমোহন মল্লিক, শ্রীদেবদাস ভট্টাচার্য। সম্পাদক—তরুণ রায়। যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীমতি শ্যামলী ব্যানার্জী। সহসম্পাদক—শ্রীঅশোক দাস, শ্রীসুনীল মণ্ডল, শ্রীকল্যাণ ঘোষ। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীমতি অর্চনা শ্রীমানি। পত্রিকা সম্পাদক—শ্রীমতি অনুশ্রী রায়।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

শ্রদ্ধেয় 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক মহাশয়েষু,

গ্রন্থাগারের আশ্বিন (১৪০৩) সংখ্যার উপর কিছু লিখব লিখব ভাবছিলাম অনেকদিন থেকেই। তাতে 'পাঠকের মৃত্যু' নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছেন। এ মৃত্যু পাঠকের দৈহিক মৃত্যু না হলেও পাঠকের যাঁরা সেবা করেছেন এমন চার ব্যক্তির দৈহিক মৃত্যুর খবর রয়েছে—তিনটি কাল বর্ডারে, একটি গ্রন্থাগার সংবাদের মধ্যে। সহকর্মী হিসাবে এঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম।

এর পরই পেলাম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়ের মহাপ্রয়াণের সংবাদ। শোক প্রকাশের ভাষা নাই। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা মাপার ক্ষমতা নাই আমার। দীর্ঘ কর্মজীবনের ব্যাপ্তি তাঁকে অমর করে

রাখবে-এ কথা সত্য। কিন্তু যা মহাসত্য তা হল সে শীর্ণ ঋজু দেহী মহৎ প্রাণ আর এ মাটিতে দেখা যাবে না। তিনি নিজগুনে চিরশান্তি লাভ করেছেন —এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

এখন 'পাঠকের মৃত্যুর' উপর দু'চার কথা বলার প্রয়াস পাচ্ছি। প্রথমেই বলি আপনার প্রবন্ধের নাম করণটি নূতন, বিষয়বস্তুতে নূতনের অংশ সামান্য। তাহলেও এটা দোষের নয়। ভাল কথা, ঠিক কথা তো জোর দিয়ে বার বার বলতেই হয়। তাই ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য।

সহরে যে সব বড় সাধারণ গ্রন্থাগার বা বিশেষ গ্রন্থাগার থাকে সেখানে গ্রন্থাগারের পাঠক বেশ সচেতন। তিনি তাঁর নিজ প্রয়োজন জানেন। প্রয়োজনের কথা জানাতে পারেন। তাগিদ দিতে পারেন। গ্রন্থাগারের আর্থিক সঙ্গতি থাকে—কাজেই পাঠক ফলও পান।

কিন্তু শত শত গ্রাম অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির হাজার হাজার পাঠক ভিন্ন চরিত্রের। তাঁদের চাহিদা অনেক সময়ই প্রচ্ছন্ন। তাই এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে অনেক বেশী সংবেদনশীল হতে হয়। পুস্তক নির্বাচনে অতি সীমিত আর্থিক সঙ্গতির কথা মনে রেখেও জীবন্ত পাঠকের সুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন চাহিদার কথা জানতে হয়। আপনার লেখার মধ্যেও আমাদের মনের কথা রয়েছে।

এরপর দেখা যাক বাস্তব পরিস্থিতি তব কথার কতটা অনুসারী। জেলায় জেলায় এখন বার্ষিক বইমেলা হয়। গ্রামের গ্রন্থাগারগুলির কাছে নির্দেশ আসে ঐ মেলায় সরকারী বরাদ্দ টাকায় বই কেনার জন্য। গ্রন্থাগারিক জেলা সহরে যান। যে যে প্রকাশক মেলায় অংশ নিয়েছেন তাঁদের সে দিনে মজুত পুস্তক ভাণ্ডার থেকেই গ্রন্থাগারিক মশাইকে তালিকা তৈরী করতে হয়। এখন বাঁকুড়ায় বইমেলা হচ্ছে। স্থানীয় গ্রন্থাগারিকরা ওখানে গেলে নির্দেশ হল—মেলায় পঞ্চাশটি স্টল রয়েছে ওদের মধ্যে অন্তত ত্রিশটি থেকে বই কিনতেই হবে। আমাদের গ্রন্থাগারিক পঁচিশটি থেকে কিনে বিরাগ ভাজন হলেন। পরে আবার নিজ তহবিল থেকে আরও পাঁচটি থেকে কিনে সংগঠকদের ঠাণ্ডা করেন।

পুস্তক সংগ্রহের এই প্রক্রিয়ায় পাঠকের চাহিদা আদৌ মর্যাদা পায় না। গ্রামের অনেক গ্রন্থাগারেই গ্রন্থাগারিকের কাছে পাঠকের পছন্দের বইটির কথা জানাবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থায় বিড়ম্বনা বাড়ে বই কমে না দেখে পাঠকের সেবার এই দিকটি গ্রন্থাগারিক তুলে দিয়েছেন। এখন যদি কেউ তর্ক তুলেন কেন ? নিজেদের তহবিল থেকে সংগ্রহ করলেই হয়'। তাহলে অবশ্য অন্য কথা।

গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহে বিধি নিষেধ আরোপ করে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় না—এ পুরাণ কথাটা নূতন ব্যবস্থাপকরা ভুললেন কেন ? বিগত দিনে পরিষদের কর্তা স্থানীয়দের এ বিষয়ে অনেক তর্ক তুলতে দেখেছি। আজ তাঁরা নীরব না আমার কানের দোষ ? যতদূর মনে পড়ে ভারত সভা হলে কোন এক সভায় সভা শেষে নাঁহাররঞ্জন রায় মশায়ের সঙ্গে এবিষয়ে প্রবীরবাবু তর্ক তুলেছিলেন।

প্রবন্ধের পরের অংশ গ্রন্থাগার কর্মীর মানবিক চেতনায় গ্রন্থাগার নির্ভার নিয়মকানুনগুলি ডুবিয়ে নিতে বলেছেন। পাঠককে কাছে পাওয়ার জন্য সুষ্ঠু ক্যাটালগ তৈরী ও তার ব্যবহার শিক্ষা, বই ও পত্র পত্রিকার প্রদর্শন এবং মুক্ত মঞ্চ বিষয়ে আপনার অভিমত বেশ ভালই। তবে আমরা মনে করি না যে সেবক গ্রন্থাগারিক সমস্থিত গ্রন্থাগার থেকে পাঠককে সরিয়ে নিতে পারবে রেডিও, টি·ভি। ঠিকমত ব্যবহার সাপেক্ষে এরা গ্রন্থাগার সেবার পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

সমাজের সব স্তরের মানুষদের নিয়ে চলতে হবে, ভাল কথা। সদ্য সাক্ষররা কাগজে কলমে অনেক, প্রকৃতপক্ষে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কাজেই তাদিকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এমন কিছু মাথা ব্যাথার ব্যাপার নয়।

নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার তো আমাদের সকলেরই আদর্শ। কিন্তু এ আদর্শে পৌঁছান যাবে অথচ টাকা-পয়সার অভাব থাকবে না—এমন সুদিনের অপেক্ষায় থাকছি।

নূতন, পুরাতন পরিষদের সব কর্মীদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়ে শেষ করছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র পাল

পোষ্ট—বালুশী, জেলা—বাঁকুড়া

গ্রন্থাগার দিবস জেলা সংবাদ

মাখালতোড় অগ্নি সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গত ২০শে ডিসেম্বর '৯৬ গ্রন্থাগার দিবসটি সাম্রাদিন ব্যাপী মহা-সমারোহে উদ্‌যাপিত হল।

বেলা ১০ ঘটিকায় গ্রন্থাগারের পতাকা উত্তোলন করে কাটোয়া ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র কোঁয়ার মহাশয়। তিনি তার ভাষণে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমাজকে সচেতন করে তোলার জন্য এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলিকে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি এলাকার মানুষকে বিভিন্ন ধরণের তথ্য দিয়ে তাদের সাহায্য করতে পারে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাটোয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সরোজ সান্যাল মহাশয়। তিনি তার ভাষণে সমাজে গ্রন্থাগারের কি কি ভূমিকা আছে এবং গ্রন্থ আমাদের কাছে কত প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থাগার দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এ ছাড়া এলাকার বুদ্ধিজীবি ও গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে বক্তব্য রাখেন।

সর্বশেষ প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক প্রদীপকুমার রায় ও গ্রন্থাগারিক দীনবন্ধু দাস।

২রা নভেম্বর ১৯৯৬ তারিখে সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, হুগলীর সভাপতিত্বে, নিমাই মাল, পঃ বঃ গ্রন্থাগার মন্ত্রী, নিখিলেন্দু হাজরা, মহকুমা শাসক, আরামবাগ, বিষ্ণুপদ বেরা, প্রাক্তন বিধায়ক এবং বঙ্গবাসী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মনীন্দ্রনাথ জানা, প্রাক্তন বিধায়ক এবং প্রশোক কুমার রায়, প্রতিনিধি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী ও বিশিষ্ট অতিথিগণের উপস্থিতিতে আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে ৫০টি প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রীরামপুর বঙ্কিম স্মৃতি পাঠাগারের "সুবর্ণ জয়ন্তী" অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হ'ল।

গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রীমাল পাঠাগারের আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে জনসাধারণের মাঝে বক্তব্য রাখেন। মহকুমা শাসক মহাশয় পাঠাগারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করে গ্রন্থাগার সম্পর্কে এক সুন্দর ভাষণ দেন। প্রাক্তন বিধায়কবয়ও পাঠাগার সম্পর্কে ভাষণ দেন।

এই অনুষ্ঠানের মধ্যে গ্রামের ছোটছোট শিশুরা পাঠাগারে স্বতন্ত্র শিশু বিভাগ খোলার জন্য গ্রন্থাগার মন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে।

চাকপোতা (আমতা-১) 'সংস্কৃতি' গত ২রা জানুয়ারী ১৯৯৭ এক সু-পরিকল্পিত ও পরিচ্ছন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে 'গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য 'বই মিছিল' এলাকা পরিক্রমা করে। এই শোভাযাত্রায় করেকশত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক সমাজসেবী, সংস্কৃতি সংগঠক গ্রন্থাগার সদস্য ও গ্রন্থাগার কর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। প্রত্যেকেরই হাতে ছিল বই এবং এই সম্ভার প্লাকার্ড'। এই শোভাযাত্রা সংস্কৃতি-অঙ্গনে এসে মিলিত হলে সেখানে এক আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিবেদক—সমীর মান্না

"গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন উপলক্ষে সম্প্রতি ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬, দমদমের কমলাপুর সংঘ গৃহে গ্রন্থাগার এক বর্ণাঢ্য 'বই মিছিল'-এর আয়োজন করে। দমদম পুরসভার উপপুরপ্রধান অসিত দাশশর্মা দক্ষিণ দমদম

পুরসভার কাউন্সিলার অরুণ ঘোষ, গ্রন্থাগারের সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ অনিরুদ্ধ চৌধুরী, সভাপতি দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারের কর্মীগণ ও সদস্য, এলাকার নব স্বাক্ষর, দমদম প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির সংগঠক দুলাল রায় ও প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষিকা ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।"

প্রতিবেদক—পরেশচন্দ্র সাহা

গত ১৯শে জানুয়ারী '১৭ উত্তর দমদমের প্রতাপগড়ে সম্বন্ধ পাঠাগারের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানে এলাকার নবস্বাক্ষর ফটিক নস্কর ও বাসুদেব বৈদ্যকে পাঠাগারের সদস্যপদ প্রদান করা হয়। সদস্যপদ প্রদান করেন পাঠাগার সভাপতি নৃপেন নন্দী ও সহ সভাপতি অসিত ঘোষ। অনুষ্ঠানে পাঠাগার সম্পাদক মনীষ ঘোষ এই কর্মসূচীকে সাক্ষরোত্তর কর্মসূচী প্রসার আন্দোলনের সহায়ক বলে বক্তব্য রাখেন। এই উপলক্ষে একটি পুস্তক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদক—রেবা চক্রবর্তী

শ্রীগুরু গ্রন্থাগার (শহর গ্রন্থাগার) এর উদ্যোগে গত ২০শে ডিসেম্বর '১৬ শুক্রবার ও ২১শে ডিসেম্বর '১৬ শনিবার "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে দুদিন ব্যাপী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিন ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন গ্রন্থাশ্রমের গ্রন্থাগারিক নির্ভীক ঘোষ ও সহকর্মী গ্রন্থাগারিক অমিত মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়াও গ্রন্থাশ্রমের বিগত দিনের সংগঠকদের সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং মত বিনিময়ের মাধ্যমে অতীত ও বর্তমানের গ্রন্থাশ্রমের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা হয় ও ১৯৪৪ সন পর্যন্ত গ্রন্থাশ্রমের সভাপতি ও সম্পাদকদের নামের স্থায়ী ফলক উন্মোচিত করা হয়।

২১শে ডিসেম্বর '১৬ শনিবার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২০ তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিষয় ঃ—রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী ও সমকালীন ভারতবর্ষ। আলোচনা করেন ডঃ সুধী প্রধান, ডঃ নিতাই কর্মকার ও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়।

সভাশেষে সকলকে গ্রন্থাশ্রমের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান গ্রন্থাশ্রমের সভাপতি শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক সূর্য্যাংশু লাহিড়ী। প্রতিবেদক—নির্ভীক ঘোষ

২০শে ডিসেম্বর "গ্রন্থাগার দিবস"কে উপলক্ষ করে ২২শে ডিসেম্বর (রবিবার) জেলার কেন্দ্রীয়ভাবে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা ও বই মিছিলের আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ বিজ্ঞান মঞ্চ, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি বর্ধমান জেলা শাখা যৌথভাবে এই কর্মসূচীর আয়োজক। কার্জন গেট, (বিজয়তোরণ) বর্তমান নাম ব্যাণ্ডেল পার্ক থেকে রাজবাটী পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করা হয়। গ্রন্থাগারে আসুন, বই পড়ুন, বই পড়ান, নব-স্বাক্ষরদের গ্রন্থাগারে আনুন, বই দান করুন, গ্রন্থাগারের সদস্য হউন ইত্যাদি স্লোগানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পদযাত্রা থেকে আহ্বান জানান হয়। প্রায় দুই শতাধিক সাধারণ মানুষ এই পদযাত্রার সামিল হয়েছিলেন। উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন—বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি সুরেন্দ্র মন্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তির অরিন্দম কোঙার, পঃ বঃ বিজ্ঞান মঞ্চের বর্ধমান জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক সুনীল সাহা, স্বাক্ষরতা প্রসার সমিতি, বর্ধমান জেলা শাখার সভাপতি দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মন্ডল, হরনাথ ঘোষ, শিবানন্দ পাল, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জনার্দন রায়, শুক্লা ঘোষরায়, হরিসাহু ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ দাস, শুকদেব মুখার্জী, জাকিরুল ইসলাম প্রমুখ।

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯১৬ গ্রন্থাগার দিবসে গঙ্গার বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী (সরকার পোষিত গ্রামীন গ্রন্থাগার) গঙ্গার, মেমারী, বর্ধমান, গৃহ সংস্কার ও নূতন শৌচাগার নির্মাণের শুভ সূচনা করা হয়। পঃবঃ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের আর্থিক অনুদান, গঙ্গার গ্রাম পঞ্চায়েত—১), জেলাপরিষদ—১, পঞ্চায়েত সমিতি, সমষ্টি

উন্নয়ন আধিকারীক, মেমারী—১, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বর্ধমান জেলা শাখা ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বর্ধমান জেলা শাখার সার্বিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে উক্ত কাজের বাজবায়ন হতে চলেছে। সরকারী অনুদানের পরিমাণ ৭৮,৬১৫ টাকা (আটাত্তর হাজার ছয় শত পনের টাকা মাত্র)। স্থানীয় ভাবে নির্মাণ প্রব্যাদি ও কিছু অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে গ্রন্থাগারের রিডিং রুমে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। উক্ত সভায় শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগারিক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেমারী—১ পঞ্চায়েত সমিতির নমিনী সদস্য তারক দত্ত, পরিচালন সমিতির সদস্য সুশান্ত পাল। দৃশ্যিলন অনুষ্ঠানটির সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন গ্রন্থাগারের নিরলস কর্মী নন্দ কিশোর পাল। প্রতিবেদক—সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

২০শে ডিসেম্বর '৯৬ 'গ্রন্থাগার দিবস' অনুষ্ঠান। আয়োজক : কৃত্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালা। সহযোগিতায় : ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, ফুলিয়াশাখা। সভাপতি—রামমোহন ভট্টাচার্য্য, প্রধান শিক্ষক কৃত্তিবাস স্মৃতিবিদ্যালয়। প্রধান অতিথি : কাজল বিকাশ ভদ্র প্রবন্ধক, ভারতীয় স্টেটব্যাঙ্ক, ফুলিয়া শাখা। বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ : রাধারমণ সরকার, সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক, নদীয়া জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তর। জিতেন্দ্রনাথ সরকার, শিক্ষক, কৃত্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয় এবং পাঠকসভা। (সদস্যভুক্তির তারিখ ১১.০২.১৯৬৮) কৃত্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালা ক্যাটিকচন্দ্র ঘোষ প্রধান সচিব, কৃত্তিবাস স্মৃতিরক্ষা উৎসব সমিতি। সুজিৎ ঘোষ, সম্পাদক, কৃত্তিবাস ইয়ং এ্যাথলেটিক ক্লাব। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাপস চক্রবর্তী', শ্রীমতি সোমা ঘোষ, সঙ্গতে উত্তম বসাক।

গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কৃত্তিবাস স্মৃতি ভবন তথা সংগ্রহশালার বর্তমান পরিষেবা, সাধারণের গ্রন্থাগারের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বিষয়ে আলোচনা করেন গ্রন্থাগারিক কেশবলাল চক্রবর্তী।

গ্রন্থাগার পরিষেবার উপরে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন জিতেন্দ্রনাথ সরকার, রাধারমণ সরকার, রামমোহন ভট্টাচার্য।

উক্ত অনুষ্ঠানে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, ফুলিয়া শাখা, কৃত্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালাকে এক হাজার টাকা আর্থিক মূল্যের ২৮ (আটাশ) খানা পুস্তক দান করেন। প্রতিবেদক—কেশবলাল চক্রবর্তী

গত ২০শে ডিসেম্বর '৯৬ বরুণ শক্তি সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে 'গ্রন্থাগার দিবস' সাড়ম্বরে পালিত হয়। গ্রন্থাগারের সদস্য, পাঠক-পাঠিকা, গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগী এবং গ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ, গ্রন্থাগার দিবস পালনে সাড়া দিয়ে বই মিছিলে অংশ নেয়। বই পড়ুন ও বই পড়ান। গ্রন্থাগারের সদস্য হন, আপনার ছেলেকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলুন, মাসে অন্ততঃ একখানি বই পড়ুন ইত্যাদি স্লোগান ও ফেস্টুন সহযোগে বইমিছিল সাফল্যলাভ করে।

এছাড়া বই মিছিলের শেষে ছাত্র-ছাত্রী, পাঠক-পাঠিকা ও সদস্যদের অংশ গ্রহণে এক মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সম্পাদক ও অবসর-প্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষক আনন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নব প্রজন্মের কাছে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরেন। বীরভূমের জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সন্তোষ কর্মকার মহাশয় তাঁর বক্তব্যে নবসাক্ষরদের গ্রন্থাগারে নিয়ে আসার জন্য অন্য সদস্যদের নিকট অনুরোধ জানান। রামপুরহাট দক্ষিণচক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক নরেন্দ্রমোহন গুপ্ত মহাশয় তাঁর বক্তব্যে শিক্ষকদের নিকট ছাত্রদের গ্রন্থাগার মুখী করে তোলার আহ্বান জানান। গ্রন্থাগারিক তরুণ মুখার্জী 'গ্রন্থাগার দিবসের' তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গ্রামের তথা এলাকার যুব সম্প্রদায়কে গ্রন্থাগারমুখী হতে আহ্বান করেন ও নব-সাক্ষরদের গ্রন্থাগারে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানান। প্রতিবেদক—তরুণকুমার মুখার্জী

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে কালনা মহকুমার (বর্ধমান) গ্রন্থাগারগুলিতে ২০ ডিসেম্বর হইতে ১০ দিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়।

তেলেনীপাড়া বন্ধু মহল পাঠাগার, সিঙ্গারকান সাধারণ পাঠাগার, বাণীবৃন্দ যুব সংঘ পাঠাগার, ঝাকুড়িয়া দেশবন্ধু পাঠাগার, কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার প্রভৃতি গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংগ্রহ, আলোচনা সভার মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। চুপী আঞ্চলিক কুঠির ও অক্ষয় গ্রন্থাগারে পদযাত্রা, গ্রন্থ সংগ্রহও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুভাষ পাঠাগারে তিনদিন ব্যাপী সারা বাংলা একাঙ্কে নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অমিতাভ চক্রবর্তী

বিগত ৫।১১।৯৬ তারিখে পিপলন রামকৃষ্ণ সংঘ ও পাঠাগারের উদ্যোগে এবং শহীদ শিবশঙ্কর সেবাসমিতির সহায়তায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। (নিজস্ব প্রাঙ্গণে) ৬ জন মহিলা সহ ৬০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান সম্পর্কে যে ভীতি, তা কাটিয়ে এই স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির মেলায় পরিণত হয় এবং এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। প্রভাস কোনার

গত ২০ ডিসেম্বর গ্রন্থাগার-দিবসে কৃষ্ণনগরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার-প্রেমীরা মিলিত হন। এই উপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগরে পাবলিক লাইব্রেরীর সহযোগিতায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির উদ্যোগে একটি বই মিছিল কৃষ্ণনগর শহর পরিক্রমা করে। বই মিছিলে শহরের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সভ্য-সভ্যারা, বিশেষ করে শিশু ও কিশোররা অংশ গ্রহণ করে। অশোক সিংহ মহাপাত্র

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী শহর গ্রন্থাগারের পরিচালনায় ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ 'গ্রন্থাগার দিবস' বই মিছিল ও আলোচনা চক্রের মাধ্যমে অতি উৎসাহে গ্রন্থাকারে পালন করা হয়।

স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকাগণ, সাক্ষরতা প্রসারণ সমিতির সদস্যগণ, বিভিন্ন ক্লাব সদস্য ও নব্যসাক্ষরদের নিয়ে 'একটি বইমিছিল অনুষ্ঠিত করা হয়।

বই মিছিলের পূর্বে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে মেটেলী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুধীর চক্রবর্তী, জিলা পরিষদ সদস্য সুধাংশু মন্ডল, লাইব্রেরীর সভাপতি, শ্রীবিশ্বনাথ মন্ডল, সম্পাদক, অরুণোদয় সেনগুপ্ত, গ্রন্থাগারিক রাখাল মালাকার মহাশয়গণ ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও জন শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন সুধাংশু মন্ডল, শ্যামল কান্তি দাস, ধ্রুবকেশ দত্ত ও অভিজিৎ বসু। পরিশেষে মিস্টিমুখ করাতে সকলের মধ্যে লড্ডেন্স বিতরণ করা হয়। প্রতিবেদক : রাখাল মালাকার

ENGLISH ABSTRACTS

by : Dr. Ratna Banerjee

Of articles, editorials, etc. Published in Granthagar

Vol. 46, Nos 5—6 ; 1996

Vol. 46, No. 5, August—September 1996

Editorial : Librarian's Day PP. 1—2

Since 1990, the 12th of August, the birth day of S. R. Ranganathan, the pioneer of library movement in India, is being celebrated as Librarians' Day in different parts of the country. In West Bengal, a full day seminar is organised jointly by IASLIC and BLA in auditoriums of various institutions on holidays either before or after the 12th of August. This year the 11th of August has been selected in West Bengal and Delhi. Since 1956 West Bengal is also observing the 20th of December, the foundation day of Bengal Library Association as Library Day. The significance of these two days are different. The Library Day is the day of analysis, of the history of library movement and present situation and the day for planning the future course of action. On the Librarians' Day the library workers express their feelings and thoughts regarding library services. It is the librarians' day for self analysis, self criticism and analysis of various activities. On that day, eminent librarians deliver lectures on important topics of library science. It is the day of professional fraternity, library workers' get together on that day for exchanging professional experiences. This day should be celebrated in different districts also.

Library System of Bangladesh : A situational Report by Mr. A. F. M. Badiur Rahaman PP. 3—8

The National Library of Bangladesh works as a depository library and is responsible for compilation of national bibliography. Bangladesh has one central public library, three divisional public libraries, fifty eight district public libraries and four branch libraries. There are over 1000 libraries of different universities, institutes, colleges etc. In most of the University libraries there are modern facilities of microfilms, microfische, slide projector, microcomputer, fax etc. Government university libraries are compiling national union catalogue of scientific periodicals. Many have access to NAIS, DEVINSA, HELLIS, MEDLINE, POPLINE etc. There are school libraries, Madrasa libraries and more than 665 special libraries also. To provide scientific and technical information in a developing country like Bangladesh the development of a proper library network is essential.

Readers of Bengali Books and consumer items by Kajal Kumar Ghosh PP. 9—10

The book is gradually losing its social importance. Instead of giving a book as a gift, people are giving other items of daily use. Social pressure, daily struggle for existence have kept people away from books. Instead of reading people relax by watching television. We should think of how we can properly organise the book club movement to develop the reading habit of common people.

Four Decades of Birbhum District Library by Popy Datta PP. 11—16

Birbhum District Library was officially inaugurated on 15th August, 1938 with 2500 books and some magazines. It used to provide lending and mobile services. In the first three decades the growth of the library was hampered. Since 1979 a gradual growth is seen in every field in collection development, in the number of users and in rendering proper service.

Computer System in Kalyani University Library by Dr. Kunal Sinha P. 17

In 1992, the Computer Centre got 20 lakhs from UGC. From this budget, money was sanctioned to the central library to get one PC/AT 386 and gradually E-Mail was introduced in the Kalyani University Central Library. With the help of the E-RNET contacts can be made with any library and research centres through E-Mail. In 1995 UGC sanctioned money to get 7 more computers and from 9th January 1996, Acquisition. Cataloguing, Reference, circulation and Periodicals Sections of the Central Library of Kalyani University were automated. Every section is now connected with each other through LAN. They are also getting INTERNET facilities. Now preparations are going to connect different departments of Kalyani University with the central Library Network.

Vol. 46, No. 6 September—October 1996

Editorial PP. 1—3

The number of users in different public libraries is gradually decreasing. Librarians should make a survey of users' demand and should take up various steps to satisfy users. To develop reading habits of users librarians should organise book exhibitions and publish lists of books recently acquired. If necessary libraries can also keep television sets to attract members and should also organise cultural programmes to motivate people to come to the library.

Five New Laws of Librarianship : a discussion by Dr. Afifa Rahaman PP. 4—6

Michael Gorman has stated five new laws of librarianship which he claims are a reinterpretation of Ranganathan's truths in the context of the library today and its likely future. These laws are—library serves humanity ; Respect all forms by which knowledge is communicated ; Use technology intelligently to enhance service ; Protect free access to knowledge and Honour the past and create the future. The author says that these statements are a summary of modern librarian-

ship and not a new interpretation of Ranganathan's Five Laws.

Procurement of Serials : Processing Steps by Madan Bandyopadhyay and Sumana Nath PP. 7—17

Discusses various steps—like Selection, Ordering, Checking and Recording needed in the procurement of serials. Specimens of letters for placing orders, sending reminders, for remittance in foreign currency and for refund of amount for non-supply of periodicals are also attached.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Mass Education Extension Deptt.
Bikash Bhawan, Salt Lake, Calcutta-91

No. 308-Edn(MRE)
5L—11/91 Pt. I

Calcutta, the 27th Feb. 1997

From : Shri Prashant, IAS.
Joint Secretary to the Government of West Bengal.

To : The Director of Library Services, West Bengal.

Sub : Sanction of additional recurring grant to Government Sponsored libraries.

Ref : His Letter No. 740/L.S. dated 05-11-96

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to sanction an additional recurring grant of Rs. 1,06,72,000/- (Rupees one crore six lakhs seventy two thousand) only, from the current financial year, towards purchase of books, periodicals and newspapers for the following sponsored libraries at the rates indicated there against.

	Total Amount (Rs.)
1. 2172 Rural / Primary Unit / Area Libraries (C) Rs. 4300/- to each library (Rs. 4300 X 2172)	93,39,600/-
2. 232 Town / Sub-divisional Libraries (C) Rs. 4700/- to each library (Rs. 4700 X 232)	10,90,400/-
3. 22 District. Libraries (C) Rs. 11,000/- to each library (Rs. 11,000/- 22)	2,42,000/-
Grand Total	1,06,72,000/-

The charge is debitable to the head, "2202-General Education 80-General-800-Other Expenditure-State Plan (Annual Plan & 8th. Plan)-Development and Expansion of Library Services-31-Other Grant-in-aid" in the current year's budget.

The Director of Library Services, West Bengal is hereby authorised to release fund according to the approved limit of expenditure so sanctioned.

This order issues with the concurrence of the Finance Deptt. vide their u. o. No. Group-N 1188 dated 21-02-97 and u. o. No. Group-B 34 dated 24-02-97

All concerned are being informed.

Sd/-
Joint Secretary

ভ্রম-সংশোধন

'গ্রন্থাগার' পৌষ ১৪০৩ সংখ্যায় 'প্রমীলচন্দ্র বসু স্মরণে' লেখাটিতে ৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের শেষ দিকে 'ঐ সময়ে চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির কার্যকরী সমিতি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন—এই বাক্যের শেষে যোগ হবে' শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু। ঐ শব্দ ক'টি বাক্যের শেষ থেকে বাদ পড়লে বাক্যটির অর্থ এ রকম দাঁড়িয়েছে যে ঐ দুটি কমিটির সভাপতি প্রমীল চন্দ্রই ছিলেন। কিন্তু মাত্র ১৭/১৮ বছর বয়সে তাঁর পক্ষে ঐ দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি হওয়া কোনমতেই সম্ভব ছিল না। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

প্রতিটি গ্রন্থাগারে অপরিহার্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশিত পুস্তক

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪) ৩৫·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) (১৯১৫-১৯৩০) ২০০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ (২য় সংস্করণ)—সদ্য প্রকাশিত ৬৫·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা ২৫·০০
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ ২৫·০০
- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫·০০
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodology ১২৫·০০

সদ্য প্রকাশিত হলো

প্রখ্যাত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী

ডাঃ আদিত্য ওহদেদারের

গ্রন্থ বর্গীকরণ

(২য় সংস্করণ)

অফ্‌সেটে ছাপা

সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত

মূল্য ঃ পঞ্চাশটি টাকা মাত্র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কিম ৫২

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

Annual Subscription : Rs. 48·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 4·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 46 : No. 12 March-April 1997

CONTENTS

	PAGE
Editorial	1—2
Sourendra Mohon Gangopadhyaya Grey Literature	3—5
From a retired Librarian	6—9
Pradipkumar Sarkar 42nd All India I. L. A Conference	9—11
28th Annual Meeting of the Bengal Public Library Employees Association	11—13
Letters to the Editor	13—14
Library Day / District News	15—18
English Abstracts	19—21
W. B. Government Circular on Additional Recurring Grant for the Public Libraries	21—22

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014 Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005.
Editor : Arun Ray, Associate Editor : Nirmalya Ray